শিক্ষাসত্র

৩২এ, খেলাতবাবু লেন, কলিকাতা-২

প্রকাশক
এস, চক্রবর্তী
৪০, খেলাতবাবু লেন
কলিকাতা-২

প্রথম সংস্করণ
মহালয়া-১৩৬৪

শিল্পী—মণীন্দ্র মিত্র

মুদ্রাকর
কার্ত্তিকচন্দ্র পাল
যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১নং রাজেন্দ্র দেব রোড
কলিকাতা—৭

মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা
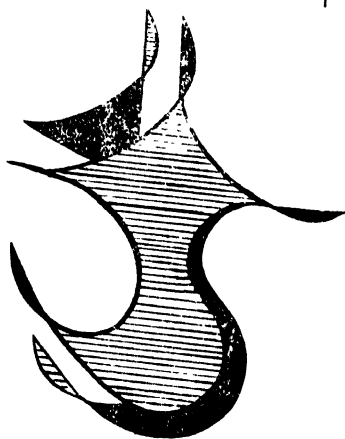
কবি একদা গেয়েছিলেন,

যৌবনে দাও রাজটিকা...

আজকের গণধর্মী যুগে মহিমার রাজধর্মী খেতাব অচল, বাতিল—তাই পাঠান্তরে বলা যায়ঃ

যৌবনে দাও জয়টিকা...

কবি নিরঙ্কুশ, বলেই তিনি খালাস। ভাষ্যের দায় তাঁর নয়।

কিন্তু পাঠকজন বলে উঠলেন—এ যৌবন মানে কি, কি তার তাৎপর্য? এ কি জরার্ত যযাতির সেই যৌবন—যা ভোগে ভোগে অপ্রশমিত, জরাকে দেহে আর মনে কায়েম করে রাখে? না, এ সেই ক্ষণস্থায়ী যৌবন—যার জন্য কবির হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস·

ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়
গয়েরে যোবন, ফিরি আওত নহি।

এখানেই টীকাকার মল্লিনাথের উদয়। সেকালের মল্লিনাথ ছিলেন রসিক-চূড়ামণি; তার উপরে বিখ্যাত বৈয়াকরণ; স্বকালের মল্লিনাথ একাধারে কবি, পণ্ডিত, রসিকচূড়ামণি—আবার আইনজ্ঞ। ইনি সাহিত্যের বীরবল স্বনামরক্ষিত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়। তাঁর হাতে ভাষ্য যুগের উপযোগী রূপ নিয়ে দেখা দিলে। তিনি বললেন, না, এ যৌবনের সঙ্গে যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের সম্বন্ধ নেই,

মলয়ানীল-সেবিত যৌবনও এ নয়; এ নহে ফাল্গুন মদ-বিহ্বল যৌবন। তবে এ যৌবন কি? পণ্ডিত-প্রবর ভাষ্য করতে বসলেন:

এ যৌবন মনের। পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকাই বার্ধক্য, জড়তা। মানসিক যৌবনের জন্য প্রথম দরকার—প্রাণশক্তি যে দৈবীশক্তি—এ বিশ্বাস।...ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না, কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চির-বিরাজমান। নতুন প্রাণ, নতুন মনের নিত্য সেখানে জন্মলাভ।...সমস্ত সমাজের এই জীবন-প্রবাহকে যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারেন, তাঁর মনের যৌবন তো অক্ষয়! তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারেন! তাই এ যৌবনের কপালে জয়তিলক এঁকে দিতে আপত্তি নেই। কেননা, এ যৌবন অন্তরের শক্তি, আত্মার শক্তি। এ যৌবন জ্যোতিষ্মান। *

এ-যুগের মল্লিনাথের ভাষ্যে যৌবনের হদিস পাওয়া গেল, পাওয়া গেল তার কর্তব্যের হদিস। কি করে যৌবন? তার যুগের মূল্যমান খুঁজে বেড়ায়, ছুটে যায় পথে বিপথে, বাধা-বিপত্তির মুখোমুখী হয়; তবু নুয়ে পড়ে না। আত্মা তার সংগ্রামী। সে সংগ্রাম করে চলে। চোখে তার ফাউস্টের মহাস্বপ্ন!

প্রতিদিন নতুন নতুন যার বিজয়—
সে-ই-তো আনে মুক্তি,
সে-ই-তো স্থায়ীত্বের আসনে বসে।
...দেখতে পাই আমাকে
মুক্ত মাটিতে, মুক্ত মানুষের মাঝে।

এ যৌবন বিপ্লবী। আর এই বিপ্লবী যৌবনের প্রতীক ইসাডোরা ডানকান।

তাঁর জন্ম উনিশ শতকের শেষভাগে হলেও, তার আবির্ভাব আমরা দেখতে পাই বিশ শতকের দুনিয়ার মঞ্চে। তখন ভাঙন ধরেছে সমাজ প্রাকারে। সামন্ত-মহিমাও অস্তগত হয়নি, আবার ধনবাদী যুগের দীপ্ত সভ্যতার সম্ভাবনা তাঁর নিজেরই কুক্ষিগত বিরোধের সংঘাতে অবলুপ্ত। তারও অবক্ষয়ের নাভিশ্বাস দেখা দিচ্ছে। এই ভাঙনের দিনে নতুনের স্বপ্ন নিয়ে এলেন ইসাডোরা। মেসায়া নন, সামান্যা নর্তকী। কিন্তু যৌবনের জ্যোতিতে তিনি অসামান্যা। তিনি বিজয়িনী রূপে গৃহসীমান্ত থেকে বিশ্বজয় করতে বেরিয়ে এলেন। বিপ্লবী যৌবনকে প্রতিষ্ঠা

* বীরবলের হালখাতা—যৌবনে দাও রাজটিকা।

করতে চাইলেন। এই প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হ'ল তাঁর আত্মা থেকে উদ্গত নৃত্যছন্দ। আত্মার বিকাশ হ'ল সেই ছন্দে। প্রথমে আদিম প্যাগান আনন্দই তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগালে; তিনি হলেন প্যাগান। পরে প্রাচীন গ্রীসের আত্মা এসে মিশলো তার সঙ্গে। তিনি হেলেনীয় ভাবধারাকে আত্মার বিকাশের পথ রূপে আঁকড়ে ধরলেন। গ্রীসের ঊষর উপত্যকা কোপানসে কলালক্ষ্মীর মন্দিরের পত্তন হ'ল। কিন্তু বিপ্লবী যৌবনকে কোপানসের ঊষর আত্মা বেঁধে রাখতে পারলে না। তিনি বুঝলেন, হেলেনীয় ভাবধারা আজকের যুগে অচল, আজকের যুগের মূল্যবোধ ভিন্ন। কলালক্ষ্মীর মন্দির আজ উদ্দামতা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলে হবে না—তাকে গণচেতনার বিকাশ হিসেবে রূপ দিতে হবে। কিন্তু প্যাগানবাদে তো আর সুদিন নেই, নেই হেলেনবাদেও। এমন সময় প্লেটো তাঁর কাছে স্বপ্ন নিয়ে এলেন নতুনের, মার্কস সে-স্বপ্নকে বিজ্ঞানের বকযন্ত্রে শোধন করে এনে চোখের সুমুখে তুলে ধরলেন। এমন সমাজের কথা বললেন, যেখানে প্রতিজনের আত্মার স্বাধীন বিকাশ সমগ্রের বিকাশেরই সর্ত। লেনিন সেই বিজ্ঞানকে দিলেন ফলিত রূপ। বললেন, শিল্প হবে জনগণের স্বাধিকার। তার শিকড় চারিয়ে যাবে জনগণের আত্মার গভীরে। তাঁদের অনুভূতি, ভাবনা, কামনা তার সঙ্গে যুক্ত হবে; তাঁদের উন্নত করবে। তাঁদের শিল্পী-সত্তাকে জাগিয়ে তুলবে, বিকাশ করবে। তাই ককেশাসের শিয়রে একদিন যে লাল তারা উঠল, তাকেই ধ্রুবতারা বলে বরণ করে নিলেন ইসাডোরা। নয়া দুনিয়ার নিমন্ত্রণ যেদিন এল, সেদিন পুরানো পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে আর দ্বিধা রইল না। তাঁর 'আমার জীবন' এই কথাটি দিয়েই শেষ করলেন:

পুরানো পৃথিবী বিদায়! নতুন পৃথিবীকে এবার আমার সম্ভাষণ জানাবো!

পুরানো পৃথিবী ত্যাগ করে এলেন, হলেন তভয়ারিস, কমরেড, সাথী; এসে দেখলেন 'দুধ মধুর দেশ' সে নয়। তার চারিদিকে শত্রুর বেড়াজাল, পথে পথে খাদ্যের কিউ, আছে চরম দারিদ্র্য। তবু তারই মধ্যে জেগে আছে বিপ্লবের লাল তারা, সেই তারার স্বপ্ন মানুষের চোখে। তাইতো আগামী দিনের পরিকল্পনা চলেছে। সাম্যবাদের তরঙ্গ আর বিদ্যুৎ প্রবাহ মিশে এক নতুন সম্ভাবনা আনছে। তাই তো যেখানে তেলের বাতি জ্বলেনি এতদিন, সেখানে জ্বলে উঠছে বিজলীর আলো—বিপ্লবের আলো।

ইসাডোরা সেই আগামীর আলোর বন্যা শুধু চোখ চেয়ে দেখলেন না, তিনিও সেই আলোতে নিজের আত্মা জ্বালিয়ে নিলেন। ইস্কুল বসল, আত্মার ছন্দ এতদিন

যে-মুক্তির ছন্দে দুলে উঠতে চেয়েছিল, সেই ছন্দ রূপ পেল। কলালক্ষ্মীর মন্দিরের মিনার আগামীর স্পর্শে অভ্রভেদী হয়ে উঠল। এমন সময় ঘর বাঁধার শখ হ'ল তাঁর। তিনি এক অশান্ত উদ্দাম কবিকে ভালবাসলেন, বিয়ে করলেন। হয় তো, ইসাডোরার পরিণত যৌবন সুখশান্তি পেত, কিন্তু তা তো পেলে না। কবি আত্মহত্যা করলেন। ব্যক্তিগত দুঃখের মেঘে ঢেকে গেল তাঁর কলালক্ষ্মীর মিনার, তিনি আগামীর পৃথিবী ছেড়ে চলে এলেন। সেদিন সারা রাশিয়া রক্ত-গোলাপ নিজের চোখের জলে ভিজিয়ে উপহার দিয়ে কেঁদে উঠেছিল। বিপ্লবী যৌবনের বিচ্যুতি ঘটল; নিজের আদর্শ বিচ্যুত হয়ে তিনি ফিরে এলেন। ইসাডোরার বিপ্লবী জীবনের এইখানেই ইতি। আত্মহত্যা আগেই ঘটেছিল, নীস-এর মোটর দুর্ঘটনা তো উপলক্ষ মাত্র।

ইসাডোরা আদর্শ-চ্যুত হয়েছিলেন বটে, তবু আমাদের কাছে তিনি বিপ্লবী যৌবনের প্রতীক হয়েই আছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর। 'আমার জীবন' তখন লেখা হয়ে গেছে, কিন্তু তখনো তা মুদ্রাযন্ত্রের জঠরে প্রবেশ লাভ করেনি। ১৯২৮ সালের মে মাসে বইখানি প্রকাশিত হয়। য়ুরোপের যৌবন তখন মোহ-বিচ্যুতির পালা শেষ করে চোখ মেলে চেয়েছে। এমনি দিনে দেখা দিলে এই 'আমার জীবন'। যৌবন নিজেকে খুঁজে পেলে সেই জীবনে—তার দৃষ্টি লাল তারার দিকে পড়ল! ইসাডোরা হলেন, য়ুরোপের বিপ্লবী নায়িকা। তাঁর ভুলচুক যৌবনেরই ত্রুটী-বিচ্যুতি বলে ধরে নেওয়া হ'ল।

য়ুরোপের এই যৌবনবন্যা জাহাজে বোঝাই হয়ে চালান হয়ে আসতে দেরি হ'ল না তদানীন্তন এই ব্রিটিশ উপনিবেশে। ইদানীং যাঁরা উত্তর-চল্লিশ—গ্রীষ্ম প্রধান দেশের উত্তাপে প্রৌঢ়, ইসাডোরার মতে যাঁরা হেমন্তের পরিণত যৌবনবন্ত—তাঁরা সেদিন ইসাডোরার 'আমার জীবন'কে নিজেদের জীবনস্বপ্ন বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্নে উদ্দামতাই স্থান পেয়েছিল, বিপ্লবী রূপটুকু পায়নি। তাই সেদিনকার সাহিত্যে তরুণ কবি সুকুমার সরকার যৌবনকে তান্ত্রিকতার রসে জারিয়ে রূপ দিয়েছিলেন—'কামনার কাপালিক' হতে চেয়েছিলেন। আর এক তরুণ কবি বুদ্ধদেব 'বন্দীর বন্দনা'য় সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন:

> রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত
> স্বেচ্ছাচার স্রোতে,
> উপেক্ষিয়া চলে যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের,

নিষ্ঠুর আঘাত; দাসত্বের স্নেহের সন্তান
সংস্কারের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার কঠোর ভৎর্সনা।

সেদিন উদ্দাম কামনাকেই বিপ্লব বলে বরণ করে নিয়েছিল যৌবন, বলেছিল আমরা বিপ্লবী। বিপ্লব নিয়েছিল অবদমিত রীরংসার রূপ; তবু তারই জন্য সদম্ভ গলাবাজির অন্ত ছিল না। কিন্তু সেটা যে আসল নয়, মেকি—সেটা যে ফ্যাশান—সেকথা বুঝতে পারেনি যৌবন পথিকের দল। তবু বুঝি ব্রিটিশের বন্দী শিবিরে শিবিরে বিদ্রোহী যৌবনে লেগেছিল বিপ্লবের দোলা। তাঁরা ইসাডোরার 'আমার জীবনের' তাৎপর্য বুঝি বুঝতে পেরেছিলেন—বুঝি মনে মনে বলেছিলেন, ইসাডোরা তোমার পথই আমাদের পথ, তোমার ঐ যৌবনকে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠা করব। 'বুঝি', এই জন্যেই বলা হল যে, বিদ্রোহী যৌবনের সে-প্রতিশ্রুতি তো ফলপ্রসূ হয়নি—সে স্বপ্ন তো খণ্ডিত—আকাশ কুসুমের অলীকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

সে দিবস তো গত। সেদিনকার উচ্ছল উদ্দাম যৌবন ট্রপিকের হেমন্তে পরিণতি পায়নি, বরং ঝরাপাতায় পর্যবসিত হয়েছে। ভূষণ্ডীকাকের মতো অতীতের স্মৃতিতে মশগুল হয়ে আছে। আজকের বিপ্লবী যৌবনকে সে চেনেনা, জানেনা—কোন মূল্যমান আজ সে আবিষ্কার করতে চায় তাও তাদের অজানা। অথচ আজ তো লাল তারার আলো ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে; 'শত পুষ্প, শত মতের' ধ্বনি উঠছে! কিন্তু এ-দেশের যৌবনের চোখে তো নেই স্বপ্ন, নেই উদ্দামতা—নেই মানসিক শক্তি। তাই আজকের দিনে ইসাডোরার বিপ্লবী আত্মাকে জাগিয়ে তোলা বোধহয় অব্যাপার নয়। আবার হয়তো তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলার দিন এসেছে:

যে-স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন লেনিন, আমি সেই স্বপ্নে প্রবেশ করছি, আমার কাজ, আমার জীবন সেই মহান প্রতিশ্রুতিরই যেন এক অঙ্গ হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, বইখানি ইসাডোরার আত্মকাহিনী 'আমার জীবন' অবলম্বনে লেখা। এর সঙ্গে এলেন টেরী, কোসিমা প্রভৃতির জীবনীর কিছু মিশেল আছে। তাছাড়া জঁা ককতোর স্মৃতিকথা থেকেও কিছু ধার করা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়টি বিখ্যাত ইম্প্রেসারিয়ো এস্ হুরোকে-এর ডায়েরী থেকে নেওয়া! যদিও উত্তম পুরুষের জবানিতে এই কাহিনী রচিত, তবুও 'আমার জীবন' নামটা এখানে খাটে বলে মনে হয় নি। তাই 'বিপ্লবী নায়িকা' নামকরণ করলাম। একখানা

হারানো কবিতার বই-এর নামটাই এসে গেল। সেখানির কবি বর্তমানে যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নামকরণ নিয়ে মতান্তর ঘটেছে। কেউ বলেন ইসাডোরা বিপ্লব-তনয়া, বিপ্লব-দুহিতা। কিন্তু আমার মতে, তিনি নিজেই মূর্তিমতী বিপ্লব। আজকের নারী-প্রগতি আন্দোলনের তিনি জননী। তাঁর বিপ্লবী আত্মার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

অশোক গুহ

এক

নিজের কথা লিখতে বসেছি।

বড় ভয়।

ভয় কেন?

কেন, আমার কথায় কি নেই উপন্যাসের বৈচিত্র্য, নেই কি সিনেমার মাদকতা? যদি লিখতে পারতাম, যদি শক্তি থাকতো, তাহলে সে যে হোত বিজ্ঞাপনের ভাষায়—এক চমকপ্রদ কাহিনী। কিন্তু লেখাই তো শক্ত।

বহুদিন, বহু সংগ্রামের পর শিখেছি দেহের ভঙ্গী, আবার লিখতে যদি শিখতে হয়, তার জন্যে কেটে যাবে বহু বছর। হয়তো তখন একটি কথা সুন্দর করে লিখতে শিখব। সহজ করে লিখতে শিখব। কতদিন ভেবেছি, মানুষ সিংহ, বাঘ শিকারে যেতে পারে গহন বনে, সেখানে বহু দুঃসাহসিক অভিযানের সে নায়ক হতে পারে, কিন্তু সে-কথা লিখতে বসলে সে হয়তো তাকে তুলে ধরতে পারবে না কাগজের উপর, হয়তো ব্যর্থ হবে। অথচ যে মানুষ বারান্দা ছেড়ে নড়ে না, সে হয়তো আরাম কেদারায় শুয়ে-শুয়ে সেকথা কথা লিখে ফেলবে। শুধু লেখাই নয়, পাঠকের মনে সে সেই গহন বনের বুকে বাঘ সিংহ শিকারের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। পাঠক তারই সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করবে, আশা-আশংকার দোলায় দুলবে, পশুর তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে ঢুকবে, আর শুনবে ময়াল সাপের হিস্‌হিসানি। তাহলে কি সব কিছুই লেখকের মনভূমির দান; বনভূমির দান কি সেখানে বড় নয়? না, তা নয়। তবে লিখতে জানা চাই।

কিন্তু নিজের কথা কি লেখা যায়? তার কি জানি, কতটুকু জানি? আমাদের প্রিয়জনেরা আমাদের এক ঝলক দেখেন, নিজেরাও তাই দেখি। আমাদের প্রেমিকদেরও সেই একই দশা। আর আছে শত্রুরা। নানা চোখের নানা রকম দেখা। আমার এ-অভিজ্ঞতা আছে।

ভোরের কাফির সঙ্গে যখন খবরের কাগজে দেখি, কেউ আমাকে দেবীর মতো সুন্দরী বলছেন, কেউ বা আমাকে এক অপূর্ব প্রতিভা বলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

আমি পড়ে সত্যিই খুশি হই। আবার দোসরা কাগজ খুলে দেখি, ঠিক উল্‌টো। নিন্দায় পঞ্চমুখ সে কাগজ। লিখেছে, আমার ছিটেফোঁটাও প্রতিভা নেই, দেহ আমার বেঢপ।

সমালোচনা তাই আর পড়িনে। বড় আস্থাও নেই।

বার্লিনের এক কাগজের সমালোচক আমাকে বেসুরো-বেতালা বলে ঠুকে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ পড়ে আমি তাঁকে দেখা করতে লিখি। তাঁর ভুলটা বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তিনি এলেন, চায়ের টেবিলে দুজনে মুখোমুখী বসলাম। তারপর সুর আর নাচের তাল নিয়ে জুড়ে দিলাম দীর্ঘ আলোচনা। কিন্তু সমালোচক-চূড়ামণি গল্‌লেন বলে মনে হ'ল না। তিনি তখনো গম্ভীর, কাঠখোট্টা। ব্যাপার কি! আরো দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি তিনি একটা ডেফাফোন বার করছেন। বদ্ধ কালারা ঐ যন্ত্র দিয়ে শোনে। আমি অবাক। তিনি জানালেন, তিনি বদ্ধকালা, যন্ত্র দিয়েও তিনি তেমন শুনতে পান না। যদিও আসরে প্রথম সারেই তাঁর আসন। হায়, হায়, এঁরই সমালোচনা পড়ে আমার রাতে ঘুম হয় নি!

কথায় বলে, তোমার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই, সেইটেই তুমি ভাল করে লিখতে পারবে। অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গেলেই স্মৃতি বেঁকে বসে। স্মৃতি তো স্বপ্নের চেয়েও ঠুন্‌কো। আমার কাছে তো অনেক স্বপ্ন, অনেক স্মৃতির চেয়ে জীবন্ত। জীবনটাই স্বপ্ন—আর সে-ই তো ভাল, তাই তো কিছু-কিছু স্মৃতি আমাদের মনে থাকে। রমন্যাসে দেখা যায়, মানুষ হঠাৎ বদলে যায়। কিন্তু বাস্তবে মানুষ ভীষণ দুঃখ-দুর্দশায়ও বদলায় না। একই রকম থাকে। বিপ্লবের পরে এই পলাতক রুশ অভিজাতদের দেখ! সবকিছু গেছে, তবু মোমার্তের রেঁস্তোরায়-রেস্তোরায় ওদেরই ভিড়। ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে, থিয়েটারের গাদায়-গাইয়ে মেয়েদের নিয়ে হৈ-হল্লা করছে। যুদ্ধের আগে মস্কোতে বসে ওরা ঠিক এমনি করত। একটুও বদলায় নি। যে-কে সেই!

মেয়ে কি পুরুষ যদি নিজেদের জীবনের সত্য তাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারে, সে তো হবে এক মহাকাব্য। রুসো এমনি আত্মার সত্য দিয়ে গেছেন মানুষকে। কবি হুইট্‌ম্যান দিয়েছেন আমেরিকাকে। তাঁর আত্মার সে সত্য এক সময়ে অশ্লীল বলে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এখন তো ও-কথা শুনলে হাসি পায়। কিন্তু মেয়েরা এমন করে জীবনের কথা লিখতে পারেন নি। বহু নামী মহিলা লিখেছেন বটে, কিন্তু সে তাঁদের বাইরের কাহিনী, তুচ্ছ খুঁটিনাটি, তুচ্ছ গল্প, অন্তরের

কাহিনী তো নয়। যখনি এসেছে পরম মুহূর্ত, তাঁরা চুপ করে গেছেন, আবার চরমস্থানেও সেই একই দশা।

আমার এই নৃত্য আমার আত্মাকে প্রকাশ করে তার দেহের ভঙ্গীতে আর ব্যঞ্জনায়। এ-ব্যঞ্জনা পেয়েছি আমার বহুদিনের সংগ্রামের ফলে। আমি তাই আমার আত্মার গোপনতম আবেগকেও ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। প্রথম থেকেই আমার জীবনই আমার নাচের বিষয়। ছেলেবেলায় নেচেছি। তখন বেড়ে ওঠার আনন্দই আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। তারপর কৈশোরে নেচেছি। সে নাচেও ছিল আনন্দ, কিন্তু তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল জীবনের নিষ্ঠুর গতির আভাস। সেই বর্বর, দুর্বার জীবনই আমার নিয়তি।

তারপরে এল যৌবন। আমি নাচ্‌লাম। তার সঙ্গে ছিল না সঙ্গীতের সঙ্গত। দর্শকদের মধ্য থেকে একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—

এ তো মৃত্যু আর কুমারীকন্যা! তারপর থেকে নাচের ঐ নামকরণ হ'ল। কিন্তু আমি তো তা চাইনি। আনন্দের আড়ালে যে দুঃখ আছে, তাকেই আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। এর নাম হওয়া উচিত ছিল, জীবন ও কুমারীকন্যা।

দর্শক যাকে নাম দিলে মৃত্যু—সেই জীবনের সংগ্রামই আমি নাচে ফুটিয়ে তুললাম, জীবন থেকে ঘন-আনন্দ নিয়ে বিলিয়ে দিলাম।

সিনেমা বা উপন্যাসের নায়ক তো সর্বগুণের আধার। সে মহান, সাহসী আবার ধৈর্যেরও প্রতীক। আবার পবিত্রতা, চরিত্রের মাধুর্যও তার একচেটে। আর কু-নায়ক যে সে তো যত কদর্যতার ডাস্টবিন্‌। কিন্তু বাস্তবে তো জানি, দোষেগুণে মিলেই মানুষ। মানুষের ভিতরে থাকে বিদ্রোহের বীজ, সে-বীজ সুবিধে পেলেই ফন্‌ফনিয়ে ডালপালা নিয়ে বেড়ে ওঠে। যারা সৎলোক, তাদের সততা অটুট আছে প্রলোভনের অভাবে। তারা মামুলি জীবন কাটায় বলে সেখানে দেখা দেয় না কোনো আকস্মিকতা। নয়তো এমনি ব্যস্ত যে, চারিদিকে তাকাবার ফুরসৎ পায় না।

আমি সে-দলের নই। আমি দোষেগুণে মানুষ।

আমাকে প্রায়ই লোকে জিজ্ঞেস করে, শিল্পের চেয়ে কি ভালবাসা বড়? আমি উত্তর দিই, আমি তো দুটিকে আলাদা করে দেখতে জানিনে। শিল্পীই তো আসল প্রেমিক, সুন্দরের রূপটি সে জানে। আর সুন্দরের রূপ দেখতে দেখতেই তো আত্মায় প্রেমের সম্ভব হয়।

ইতালীর কবি গ্যাব্রিয়েল দান্নাৎসিয়ো। এ কালের তিনি নায়ক। কিন্তু বেঁটেখাটো মানুষটি। অতি মামুলি তাঁর চেহারা। প্রথম যেদিন দেখা হ'ল,

তাই তো মনে হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে ঝলমল করে উঠল তাঁর মুখ, তাঁকে পরম সুন্দর রূপে পেলাম। এ ঝলমলানি ভালবাসার। ভালবাসা তাঁকে দেবতার রূপ দান করলে। এমন পরম সুন্দর বলেই তো তিনি একালের নায়ক, একালিনীদের পূজা পাচ্ছেন।

দান্নাৎসিয়ো যখন কাউকে ভালবাসেন, তিনি তাকে পৃথিবী থেকে স্বর্গে নিয়ে যান। তার মনে হয়, সে যেন দান্তের বিয়াত্রিচে, স্বর্গলোকেই তার বাস। তাই তো এক সময়ে পারীতে সুন্দরীরা সবাই বিয়াত্রিচে, হয়ে উঠেছিলেন। কবি তাঁদের প্রতিজনকে পরিয়ে দিয়েছিলেন কল্পলোকের ওড়না, ঢেকে দিয়েছিলেন সেই ঝলমল ওড়নায়। সে ওড়না তো আর কিছু নয়, কবিব দেওয়া রূপ। সেই রূপের গর্বে গরবিনীরা তখন বাস্তব ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কল্পলোকে—তাঁরা তখন বিয়াত্রিচেরই দোসর। কিছু হায় কবির খেয়াল! খেয়াল শেষ হতেই কল্পলোক মিলিয়ে গেল, সাপের খোলসের মতো রূপ খসে পড়ল। কোথায় সেই ঝলমল দীপ্তি? আবার সেই সামান্যা নারী। প্রেমিকারা বুঝলেন না কি হ'ল, কিন্তু নেমে এসেছেন বোঝা গেল। কবি যখন ছিলেন কাছে, তখন যে রূপ দলে-দলে বিকশিত হয়েছিল, আজ সে-রূপ যেন আর নেই। সে ভালবাসাও আর নেই। আর কখনো তাকে ফিরেও পাবেন না। প্রেমিকারা চোখের জল ফেলতে লাগলেন। আর মানুষ তাঁদের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলে, অসামান্য কবি কি করে এমন সামান্যা মেয়েদের ভালবেসেছিলেন?

দান্নাৎসিয়ো ছিলেন এমনি প্রেমিক। তিনি সামান্যাকে অসামান্যা করে তুলতে পারতেন।

শুধু একজন বাদে। এলিনোরা, অভিনেত্রী এলিনোরা যেন দান্তের মূর্তিমতী বিয়াত্রিচে। কবি তাঁকে ওড়নায় মুড়তে পারেন নি। নিজের রূপে তাঁকে রূপবতী করে তুলতে পারেন নি। কবি তাঁর পায়ের তলায় বসে জানিয়েছেন প্রেম। অন্য মেয়ে ছিল তাঁর প্রেমের উপাদান মাত্র, কিন্তু এলিনোরা তাঁর কবিতার উৎস, অনুপ্রেরণা।

কবি এ-কালের নায়ক; ছলাকলায় নিপুণ। কথায় তাঁর কি জাদু! মনে হয়, ইভকে যে স্বরে ডেকেছিল সয়তান সাপের ছদ্মবেশে, ঠিক তেমনি তাঁর স্বর। তিনি ডাকলে, মনে হয় সমস্ত দেহখানা কেঁপে কেঁপে ওঠে, কামনার ঢেউ উদ্বেল হয়ে ওঠে বুকে। মনে হয়, আমিই তো জগতের আলো, বিশ্বের প্রাণশক্তি!

একদিনের কথা মনে পড়ে।

কবির সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম।

হঠাৎ থেমে পড়লাম। ঘনিয়ে এল নীরবতা।

কবি হঠাৎ বলে উঠলেন, ইসাডোরা, শুধু তুমি সঙ্গে থাকলেই প্রকৃতিকে উপভোগ করা যায়। অন্য মেয়েরা তো প্রকৃতিকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তুমি—তুমি প্রকৃতিরই এক রূপ!

তার পরেও কি কোন মেয়ে পারে ঠিক থাকতে? কল্পলোক কি নেমে আসে না?

কবি আবার বলে উঠলেন, ঐ যে গাছপালা, ঐ যে আকাশ, তুমি তো তারই এক অংশ—তুমিই তো প্রকৃতির আত্মা।

এমনি কবির প্রতিভা। তিনি জাদুকাঠি ছুঁইয়ে দেন, আর সামান্যারা অসামান্যা হয়ে ওঠে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে যাকে মানুষ স্মৃতি বলে তাই নিয়ে কাটাই-ফাঁড়াই করছি। বাইরে ছেলেমেয়েদের কলকোলাহল ভেসে আসছে। নিজের দেহের উষ্ণতায় আমি তা অনুভব করছি, তাকিয়ে আছি নিজের দুখানি নগ্ন পায়ের দিকে। আমার নরম বুকের অনুভূতিও আছে। আর আছে ঐ বাহুর অনুভূতি। ওরা তো কখনো থামতে জানে না, শুধু ঢেউয়ের মতো দোলে আর দোলে। কিন্তু বুকে আমার ব্যথা, হাত দুখানিতে ক্লান্তি নেমে এসেছে। চোখে জল।

বারো বছর ধরে শুধু কেঁদেছি। বারো বছর আগে সেদিনও এমনি শুয়েছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠলাম চিৎকার শুনে। ল-এল, এসে খবর দিলে,

ছেলেমেয়েরা মারা গেছে।

এক অদ্ভুত নীরবতা ঘনিয়ে এল আমার মনে, শুধু গলায় জ্বালা—মনে হ'ল জ্বলন্ত কয়লার টুকরো বুঝি গিলে ফেলেছি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। তারপরে বললাম, না, না, তুমি ভুল শুনেছ!

আরো অনেকেই এল। কিন্তু আমি তখনো তেমনি আছি। এক ডাক্তার এলেন। বললেন,

না, না. ওদের আমি বাঁচাব!

তাঁর কথায় বিশ্বাস হ'ল। তাঁর সঙ্গেই যেতে চাইলাম। কিন্তু ওরা দিলে না। মন বলে উঠল, আশা নেই, আশা নেই!

ওরা ভাবলে, পাগল হয়েই যাব। কিন্তু মন যে তখন আনন্দে উন্মত্ত। কেন এমন হয় জানিনে। মৃত্যু নেই বলেই কি এমনি মনে হয়? মৃত্যু অলীক বলেই কি এমনি হয়?

ঐ তুটি মোমের পুতুল আমার ছেলেমেয়ে নয় বলেই কি এমনি মনে হয়?

ওরা আমার ছেলেমেয়ে নয়, তাদের ফেলে-দেওয়া জীর্ণ পোষাক। তাদের আত্মা তো চির অমর, সে-তো জ্যোতিষ্মান। মা শুধু তুবার কাঁদেন—জন্ম আর মৃত্যুর সময়। তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে হাত হিম-শীতল হয়ে গেছে, সেই হাত তুলে নিলাম হাতে। নিজে শুনতে পেলাম নিজের আর্তনাদ, জন্মের সময়ে এমনি আর্তনাদ শুনেছিলাম। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন একই আর্তনাদ জন্ম আর মৃত্যুর মুহূর্তে উৎসারিত হয়ে পড়ে? জন্ম তো পরম আনন্দের লগ্ন, আর মৃত্যু তো চরম বিষাদের।

জানি না, জানি না। শুধু জানি—জন্ম আর মৃত্যু এক, অভিন্ন।

এইবার এক মহা আর্তনাদ, এক চরম ব্যথা তুলে তুলে উঠছে। সে-ব্যথায় আছে তুঃখ, সুখ, আছে আনন্দ আর বেদনা। তার নাম কি?

কি নাম?

তার নাম সৃষ্টির ব্যথা।

এ-ব্যথা সব ব্যথা আর আনন্দের মা।

শেষ হ'ল আমার ভূমিকা। দাঁড়ি টেনে দিলাম। এবার কাহিনী।

দুই

সাগরের মেয়ে আমি। সাগর পারেই আমার বাড়ি।

যেদিন গর্ভের আঁধারে আমার উদ্ভব হয়েছিল, সেদিন বুঝি উত্তাল হয়ে উঠেছিল সাগর। আর সেই উত্তাল সাগরের বুক থেকে উঠে এসেছিলেন সুন্দরের দেবী আফ্রোদিতে। তিনি বুঝি আমার কপালে এঁকে দিয়েছিলেন তাঁর স্নেহচুম্বন।

শুনেছি, মা বলতেন, এ-সন্তান কেমন হবে কে জানে।

তাঁর তখন ঘোর অরুচি। শুধু সমুদ্রের মাছ আর বরফ-দেওয়া শাম্পেন খেতেন।

তারপরে আমি যখন মাটিতে পড়েই হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম, তখন তো মা বললেন, দেখ, দেখ, বলিনি! ও পাগল হবে। নইলে অমন হাত-পা ছোঁড়ে!

কিন্তু মেয়ে যখন বেড়ে উঠতে লাগল, মার মনে কি আনন্দ! বাজনা বাজলেই হ'ল, অমনি তালে তালে নাচতে শুরু করে দেয়।

সবাই বললে, মেয়ে এখুনি এমনি, বড় হলে কেমন নাচে দেখো!

কিন্তু এসব তো শোনা কথা। আমার স্মৃতি তখনো জাগেনি। আগুন লেগেছিল একবার। সেইটেই ঝাপসা মনে পড়ে।

সে কি হৈ-চৈ! চারিদিকে ধোঁয়া আর ধোঁয়া। আবার মাঝে মাঝে লক্-লক্ করে উঠছে আগুনের শিখা। মা আমাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পথে লোকজন। বোধ হয় কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। জানালার কাছে ছুটে এলেন। সেখানেও ধোঁয়া আর ধোঁয়া। নিচের মানুষদের দেখা যাচ্ছে। ষ্টীলের টুপী মাথায় একটি পুলিশকে দেখা গেল। মা আমাকে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তার কোলে।

তখন আমার দুই কি তিন বছর বয়েস। আমার তবু মনে আছে, পুলিশটির গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে ছিলাম। তখন আমি নির্ভয়, আশ্রয় পেয়েছি, আর কি চাই! এমন সান্ত্বনা বুঝি জীবনে পাইনি, পাইনি এমন নিরাপদ আশ্রয়।

মাও নেমে এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি কেঁদে উঠলেন, আমার ছেলেরা, —তারা যে পড়ে রইল!

তিনি এবার ভিড়ের ভিতর দিয়ে ছুটলেন। সবাই তাঁকে ধরে রাখল।

সে কি তাঁর কান্না, সে কি আকুলি-বিকুলি! হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চান, আর কান্নায় ভেঙে ভেঙে পড়েন।

ভাই দুটিকে পাওয়া গেল। তারা আগেই উদ্ধার পেয়েছে। মা যখন কাঁদছিলেন, তখন তারা এক রেঁস্তোরায় বসে গরম চকোলেটে চুমুক দিচ্ছিল।

বলেছি তো সাগরের পারে আমার জন্ম। আমি সাগরকন্যা। সাগর থেকে উঠলেন সুন্দরের দেবী, তিনি জন্মক্ষণে আমার কপালে এঁকে দিলেন চুমু। তাই সাগরের তীরেই আমার জীবনের মহালগ্নগুলি এসেছে বারে বারে। আমার যে নৃত্যভঙ্গী সেও সমুদ্রের দান। সাগরের ঢেউয়ের দোলা হয়ত আমার মনে দিয়েছিল দোলা, সেই দোলা ছড়িয়ে পড়েছিল দেহে—তাই সৃষ্টি হ'ল আমার এই নৃত্য। আমার লগ্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আফ্রোদিতে।

হয় তো জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার বিশ্বাস দেখে মানুষ হাসবে। কিন্তু এক সময়ে ঐ শাস্ত্র ছিল উন্নত। মিশরে, কালদীয়ায়, ভারতে এর চর্চা ছিল। সে চর্চায় ছিল জ্ঞানের গভীরতা। আমার তো মনে হয়, অন্তরের জীবনে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব কম নয়। বাপ-মায়েরা যদি গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে সন্তানের জন্ম দেন, সে জন্ম হবে পবিত্র, হবে সুন্দর।

যেখানে যে জন্মায়, সেখানকার পরিবেশ তার ভাল লাগে। সাগরকে আমি ভালবাসি, সে আমার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। কিন্তু পাহাড় দেখলে আমার পালাতে সাধ জাগে।

আমি সাগরেরই মেয়ে।

যাক—এবার স্মৃতির পাতা খুলে ফেলি। দেখি—কি লেখা আছে, আর কি নেই।

গরীব ঘর। বাপ নেই। মা গান-বাজনা শিখিয়ে সংসার চালান। সারাদিন তাঁকে বাইরে বাইরেই থাকতে হয়।

তাই আমি পেলাম স্বাধীনতা।

ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি। স্কুল তো নয় জেলখানা। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। সারাদিন ঘুরে বেড়াই সাগরের ধারে। দেখি আয়ারা নিয়ে চলেছে সুন্দর পোষাক-পরা ছেলেমেয়ের দল। তাদের দেখে আমার

হিংসে হয় না। করুণা হয়। ঐ ছেলেমেয়েরা অবাধ স্বাধীন জীবনের স্বাদ তো পায় না। আর আমি? মুক্ত, অবাধ আমার জীবন। এ-জীবনে নেই আয়া, নেই সুন্দর পোষাক। নেই বিলাসের ছিটেফোটা, কিন্তু আমার মনের রঙে আমি রাঙিয়ে দিয়েছি এ-জীবনকে। এখানে যা আছে, ওদের ঐ সতর্ক পাহারা দেওয়া জীবনে তা নেই। এমনি অগাধ, উন্মুক্ত জীবনই বুঝি আমাকে দিলে সৃষ্টির প্রেরণা। কেউ আমাকে বলে না, 'এটা করোনা, ওদিকে চেয়োনা'—তাই তো আমার মন বিকশিত হয়ে উঠতে চাইলে। তাই তো ওদের প্রতি আমার করুণা।

এরই মধ্যে বড়দিন এল। বড়দিন!

কার না ভাল লাগে এই বড়দিন। সেই যে দাড়িওয়ালা বুড়ো স্যাণ্টাক্লস, তিনি আসেন, ছেলেমেয়েদের দিয়ে যান উপহার। ছেলেমেয়েরা সকালে উঠে দেখে, বুড়ো বালিশের কাছে কত কি রেখে গেছেন।

আমার মন নেচে উঠল। কত কি পাব। কি চাই? চাই—একটা বাঁশী চাই, বাজনা চাই, খেলনা চাই রকমারি, আর চাই কেক, চকোলেট আর টফি!

মাকে বললাম, বুড়ো দাদু আমাদের এসব দেবেন না মা?

মা বললেন, কে বুড়ো-দাদু?

কেন স্যাণ্টাক্লস বুড়ো। সেই যে যিনি যাশুকে দিয়েছিলেন কত জিনিষ! তিনি তো বছর বছর এসে অমনি কত জিনিস রেখে যান বালিশের পাশে।

মা বললেন, মিছে কথা! সবাই ছেলেপুলের জন্য খেলনা আর মিষ্টি কিনে আনে, আর সেগুলি রেখে দেয় শিয়রের পাশে। ছেলেমেয়েদের কাছে মিছে করে বলে, ওগুলো বুড়োর দেওয়া।

শুনে আমায় স্যাণ্টাক্লস বুড়োর স্বপ্ন ভেঙে গেল। বুঝি বা একটু ক্ষুব্ধই হলাম।

মা বললেন, মিছে আশা না করাই তো ভাল।

তারপর চলে গেলেন।

ইস্কুলে কিন্তু আমাদের মাস্টারমশাই মিঠাই আর কেক বিলোতে-বিলোতে বললেন; দেখ, স্যাণ্টাক্লস বুড়ো কত কি দিয়ে গেছেন।

আমি অমনি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, মিছে কথা! স্যাণ্টাক্লস বলে কেউ নেই!

তিনি চটে গিয়ে বললেন, যারা স্যাণ্টাক্লসকে বিশ্বাস করে না, তাদের তিনি কিছুই দেন না।

হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, টেনে নিয়ে বললাম, তাহলে আমি চাইনে! মাস্টার মশাই আমাকে ডাকলেন।

কাছে এলাম। তারপরে বললাম, মিছে কথায় আমি বিশ্বাস করিনে। মা বলেন, তিনি গরীব, স্যাণ্টাক্লস সাজতে পারবেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েরাও কিছু পাবে না। শুধু বড় ঘরের ছেলেমেয়েরাই পাবে বুড়ো দাদুর খেলনা আর মিষ্টি।

মাস্টার মশাই আমাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি পা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে তিনি আমাকে এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

কেমন—আর বলবে ওকথা?

বলব, বলব, একশোবার বলব! চিৎকার করে উঠলাম। স্যাণ্টাক্লস বলে কেউ নেই!

মেঠাই পেলাম না কেক্ পেলাম না। সবাই আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে সে সব খেল। চোখে জল, তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছুটির পরে এলাম বাড়ি।

মাকে বললাম সব কথা। বললাম, মা-মণি, ঠিক বলি নি? স্যাণ্টাক্লস বুড়ো নেই?

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, বুড়ো নেই, ভগবানও নেই। শুধু আছে তোমার আত্মা—সেই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে তিনি আমাকে বললেন, বাছা, শুধু ঐ কথা মনে রাখবে, তাহলেই জীবনে লড়তে পারবে।

সেদিন থেকে জন্ম হ'ল বিদ্রোহিনী ইসাডোরার।

ইস্কুল ভাল লাগে না। বড় নিয়ম-বাঁধা। আবার নিয়মের গণ্ডী একটু পার হতে গেলেই আছে শাসন। এমন ইস্কুল তো ভাল লাগে না—এ শিক্ষার দামই বা কি! কখনো তোতা পাখীর মতো মুখস্থ বলতে পারলে বাহবা পাই। আবার না পারলে ভৎর্সনা, শাস্তি।

এই কি শিক্ষা না কি? তাই তাকিয়ে থাকি ঘড়ির কাঁটার দিকে। কখন বাজবে তিনটে, কখন এ জেলখানা থেকে ছাড়া পাব?

রাতে শুরু হয় আসল শিক্ষা।

মা ফেরেন রাত করে। তারপরে বসেন পিয়ানো নিয়ে। বাজান বেঠো-ফেনের চন্দ্রালোক-গীতি। চাঁদ না থাকলেও ঘর যেন জ্যোছনা ধারায় ভেসে যায়। সুর জ্যোছনা সৃষ্টি করে। কখনো সুমান, সুবার্ট, শপাঁও বাজান। পোলেনেইস শুনি। তুষারময় পোলাণ্ডের ছবি ভেসে ওঠে। সুর যেন তারই বন, মাটি, নদী, মাঠ থেকে মন্থন করে তোলা। তার মানুষের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া।

আবার কোনোদিন বা মা পড়তে বসেন মহাকবি সেইকস্‌পিয়ার। রোমিও-জুলিয়েৎএর জন্যে কাঁদি, ওথেলোর মতো মূর্ত হয়ে ওঠে ঈর্ষা, পাপবোধের অন্ধ অতলে ম্যাকবেথের পরিণাম গাথা রচিত হয়। আবার শেলীও এক-একদিন এসে তাঁর গীতি কাব্যের সোনার ভাণ্ডার খুলে দেন। তাঁর চাতকের সঙ্গে উড়ে যাই আকাশে, তার বিদ্রোহী আত্মার আহ্বান শুনি। কীটসও আসেন।

ডেকে ওঠে পাতার আড়ালে নাইটিঙ্গেল। যেন বিদেহী সুর দুলে দুলে ওঠে। সে সুরে আছে আঙুরের মধু, আছে উগ্র বিষের জ্বালা। কিন্তু সে জ্বালা শরীর জুড়িয়ে দেয়, ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করে দেয়। আমি শুনি, শিখি, মার মতো করে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করি।

সেবার ইস্কুলে উৎসব। কেউ বা নাচবে, কেউবা গাইবে, কেউ বা করবে আবৃত্তি। আমি আবৃত্তি করব ঠিক করলাম।

কয়েকটি আবৃত্তি আর গানের পর আমার পালা।

মঞ্চে উঠে এলাম। আবৃত্তি করলাম কবি উইলিয়াম লীটল-এর ক্লিয়োপাট্রার উদ্দেশ্যে য়্যাণ্টনী।

বুক হয়তো বা একটু কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু তার পরেই সব কিছু আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। দেখলাম মুমূর্ষু বীর য়্যাণ্টনীকে। নিজের তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শরীর। তবু মিশর রানীর জন্য তাঁর উদ্বেল কামনা। বলছেন—

মিশর! মিশর!
মিশরের রানী
আমি ত মরছি।
জীবনের রুধির স্রোত তো
ক্ষীণ হয়ে এল—
রানী—আমি মরছি।

দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ। তারপর তারা হর্ষধ্বনি করে উঠল। সেদিন আমি পেলাম আমার প্রথম দর্শকমণ্ডলী।

ক্লাসে মাঝে মাঝে মাষ্টার মশাই আমাদের জীবনের ঘটনা নিয়ে রচনা লিখতে দিতেন। একদিন এমনি রচনা লিখতে দিয়েছেন, আমি লিখলাম—

পাঁচ বছর বয়সে আমরা ছিলাম ২৩নং স্ট্রীটে, ভাড়া দিতে পারেন নি মা, তাই ১৭নং স্ট্রীটে চলে এলাম। এখানেও ভাড়া বাকী পড়ল। বাড়ীওয়ালা আর রাখতে চায় না। তাই এলাম বাইশ নম্বর স্ট্রীটে। কিন্তু সেখানেও কি শান্তিতে থাকতে পারলাম! কিছু দিন পরেই চলে এলাম দশ নম্বর স্ট্রীটে।

এমনি করেই ইতিহাস লেখা চলল। সে ইতিহাস ঘন ঘন বাড়ি বদলের কাহিনী। এ-পথ থেকে ও-পথে, ও-পথ থেকে সে-পথে।

ইসকুলে মাষ্টার মশাইকে পড়ে শোনাতে তিনি চটে গেলেন। ভাবলেন, আমি ঠাট্টা করছি। তিনি আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেলেন ইস্কুলের প্রধানের কাছে। তিনিও শুনে চটে গেলেন। মাকে খবর দেওয়া হ'ল। মা এলেন। তিনি রচনাটি পড়ে কেঁদে ফেললেন, বললেন,

এ সবই সত্যি। আমরা তো এমনি ছন্নছাড়ার মতোই জীবন কাটাই।

ইস্কুল ভাল লাগে না। শক্ত বেঞ্চে খালি পেটে বসে থাকা। মাষ্টার মশাইরা তো যেন এক-এক দত্যি-দানা, দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। শুধু আমাদের শাস্তি দেবার জন্যই তৈরী হয়ে আছেন।

বাড়িতে অভাব আর অভাব, কিন্তু সে তো আমাকে দুঃখ দেয় না। দুঃখ দেয় ঐ পাঁচিল-ঘেরা ইস্কুল, তার শক্ত কালো কালো বেঞ্চিগুলি—আর কঠিন-কঠোর মাষ্টার মশাইয়েরা, আর তাঁদের বিধিনিষেধ। মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

এই জেলখানা ভেঙেচুরে ফেলতে ইচ্ছে করে।

ছ'বছর যখন বয়েস, তখন একদিন ইস্কুলের পড়া সাঙ্গ হ'ল।

নাচের ওপর আমার খুব ঝোঁক। নিজে নাচি, পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে নাচ শেখাই। একদিন এমনি নাচ শেখাচ্ছি, মা এমন সময় এলেন ফিরে। তিনি দেখে বললেন,

এসব কি রে?

উত্তর দিলাম, দেখছ না, আমার নাচের ইস্কুল! বোসো, বোসো, দেখ, কেমন নাচ শেখাই!

হাত দোলাতে লাগলাম, পায়ে জাগল ছন্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ছাত্র-ছাত্রীরাও নাচতে লাগল।

মা মহা খুশি। বললেন, দাঁড়া, আমি বাজাই!

পিয়ানোর ডালাটা খুলে বাজাতে বসে গেলেন।

সেদিন বাজনার তালে তালে আমরা নেচে নেচে সারা হলাম। সেই থেকে আমার ইস্কুল জাঁকিয়ে উঠল। আমারও ইস্কুলে পড়ার ইতি হ'ল।

তিন

মা। মা-ই সব। বাবাকে দেখিনি। আমি যখন কোলের শিশু, মার সঙ্গে তাঁর চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়।

বাবাকে তো দেখিনি। আর সবার বাবা আছে, আমার নেই, তাই আমার দুঃখ। মাসীকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, মাসী আমার বাবা নেই কেন?

মাসী বললেন, তার কথা আবার কেন? সে তো তোর মার জীবন ছারেখারে দিয়েছে। একটা শয়তান!

তার পর থেকে বাবার কথা মনে হলেই ছবির বইয়ের শয়তানের কথা মনে পড়ত। তার দুটো মস্ত শিং, আবার আছে লম্বা লেজ। বাবার কথা বললে, চুপ করেই যেতাম।

সাত বছর তখন আমার বয়েস। থাকতাম এক বাড়ির তেতালার দুখানি ঘরে। সে-ঘরে আসবাবপত্রের বালাই ছিল না। একেবারে শূন্য ঘর, সাজসজ্জা-হীন। একদিন দরজার ঘন্টি বেজে উঠতেই ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, চমৎকার চেহারার এক ভদ্রলোক। তাঁর মাথায় লম্বা টুপী। বললেন,

মিসেস ডানকান কোথায় থাকেন বলতে পার খুকু?

উত্তর দিলাম, আমি মিসেস ডানকানের মেয়ে।

আরে, আরে তুমি আমার সেই রূপকুমারী! ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন। আমি যখন মার কোলে, তখন নাকি ঐ ছিল আমার নাম। মা আর মাসীর কাছে শুনেছি। আবার ভদ্রলোকটির কাছে শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম।

ভদ্রলোক এবার আমাকে কোলে নিয়ে চুমোয়-চুমোয় গাল দুখানা ভরে দিলেন। চোখের জল ঝরে ঝরে পড়ল। আমি তো অবাক।

আবেগ কমে এল, এতক্ষণ হাঁফিয়ে উঠছিলাম, এবার শুধালাম, তুমি কে?

তোমার বাবা! তাঁর স্বর অশ্রুরুদ্ধ।

শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলাম। চোখ বড় বড় করে তাকালাম। না, না, মস্ত দুটো শিং তো নেই, নেই তো লম্বা লেজ! ভারী সুন্দর দেখতে মানুষটি। দূর—উনি বুঝি শয়তান হতে পারেন!

খুশি হয়ে ছুটলাম মার কাছে।

মা, মা দোরে একজন কে এসেছেন, বলছেন, তিনি নাকি আমার বাবা।

মা বসেছিলেন, উঠে পড়লেন। মুখ তাঁর ফ্যাকাশে, উত্তেজনায় কাঁপছেন থরো থরো। পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার এক ভাই লুকোলো খাটের নিচে, আর এক ভাই খাবার রাখার আলমারীর পেছনে। আমার বোন তো মূর্চ্ছা যায় আর কি!

ওরা বললে, যা, চলে যেতে বল গে!

বিস্ময় বেড়ে গেল। কিন্তু ভারী ভদ্র মেয়ে আমি। তাই ধীরে ধীরে দরজার কাছে ফিরে গেলাম। গিয়ে বললাম,

বাড়িতে সকলের অসুখ, কেউ যে উঠে এসে বসে দুটো কথা কইবে এমন লোক নেই!

ভদ্রলোকটি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, তারপর প্রস্তাব করলেন,

বেশ তো, ওরা না আসুক, তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে চল রূপকুমারী!

হাত ধরে নিয়ে চললেন।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে পথে এসে পড়লাম। এখনো মনে বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি, তাঁর পাশে পাশে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলেছি। বার বার মনে হচ্ছে এই চমৎকার চেহারার ভদ্রলোক আমার বাবা! দূর, কি সব ভেবেছি! ওঁর আবার শিং আর লেজ কোথায়?

আমাকে নিয়ে গেলেন এক আইসক্রিমের দোকানে, তারপরে পেট পুরে খাওয়ালেন কেক আর আইসক্রিম। ফিরে এলাম উত্তেজনা নিয়ে। মহা খুশি হয়ে। বাড়িতে সবাই কিন্তু ভারি মন-মরা।

সবাইকে বললাম, ভারি চমৎকার আমার বাবা। কত খাইয়েছেন কেক আর আইসক্রিম! আবার কাল আসবেন, আইসক্রিম খাওয়াবেন।

পরদিনও তিনি এলেন। কিন্তু কেউ আজও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে এল না। তিনি আমাকে নিয়ে আজও গেলেন আইসক্রিমের দোকানে। খাওয়ালেন, আদর করলেন।

এমনি রোজ। তারপর একদিন চলে গেলেন লস এঞ্জেলসে। সেখানে আছে তাঁর আর-এক ঘর ছেলেমেয়ে আর বৌ।

তারপরে বহুদিন আর দেখি নি। আবার একদিন হঠাৎ এসে হাজির। মা তো দেখা করবেনই না, কিন্তু বাবা নাছোড়। তিনি দেখা করলেন, একখানা সুন্দর বাড়ি দিলেন আমাদের। সেখানে বড় বড় নাচের হল, টেনিস কোর্ট, গোলাবাড়ি

আর হাওয়ায়-চলা যাঁতাকল ছিল। তখন তিনি মস্ত বড়লোক। বাবা এমনি আগেও বড়লোক হয়েছিলেন। তাও একবার নয়, তিন-তিনবার। তিনবারই তিনি সব খোয়ান। এবার চারবারের পালা। কিন্তু এ-সৌভাগ্যও বেশিদিন রইলো না, মরু মায়ার মতো একদিন উবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল আমাদের বাড়িঘর, নাচের হল, টেনিসকোর্ট আর গোলাবাড়ি। কিন্তু ক'বছর তো আমরা ছিলাম সেখানে। জীবনের ঝড়ে সেই তো ছিল আমাদের ক্ষণিকের বন্দর।

এই সময়ে বাবা মাঝে মাঝে আসতেন। তাঁর সঙ্গে ভাব জমে উঠল। জানলাম, বাবা আমার কবি!

আমাকে নিয়ে তিনি এক কবিতা লিখেছিলেন। সে-কবিতায় ছিল আমার সারা জীবনের ছক কাটা। সে যেন ভবিষ্যৎবাণীর মতো ফলে গেল আমার জীবনে।

বাবার কথা বলতে-বলতে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি। আমার জীবনে তাঁর প্রভাব তো কম নয়।

আমার জীবন তিনি এসে যেন দু'ভাগ করে দিলেন। একদিকে আবেগে-ঠাসা নভেল পড়ে পড়ে কল্পনার কারবারী হয়ে উঠলাম, অন্য দিকে নরনারীর মিলনের ঐ এক শোচনীয় দৃষ্টান্ত ভাসতে লাগল আমার সুমুখে। রহস্যময় বাবা, তাঁরই কালো ছায়ায় ঢেকে গেল আমার ছেলেবেলা, আমার মনের পাতে দাগা হয়ে গেল একটা কথা—সেটি বিবাহ-বিচ্ছেদ। এ নিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করতে যাইনি, নিজের মনে তর্ক-বিতর্ক করে সমস্যার জট খুলতে চেয়েছি।

যে উপন্যাসই তখন পড়তাম, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর হোতো সেখানে মিলন। মিলন হ'ল, চিরসুখে রইল--এই ছিল তার শেষ কথা। এরই মধ্যে একখানা বই পড়ে কিন্তু বেখাপ্পা ঠেকল। বইখানা জর্জ এলিয়েটের য়্যাডাম বীড। লেখিকা এঁকেছেন এক মেয়ের ছবি। সে বিয়ে করতে চায় না, এক অবাঞ্ছিত সন্তান এল তার জীবনে, কুমারী মা লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হ'ল। মেয়েদের উপর পুরুষের এ কি অমানুষিক অত্যাচার। এর সঙ্গে মন জুড়ে দিলে বাবা-মার জীবনের কাহিনী। ঠিক করলাম, বিয়ের বিরুদ্ধে শুরু হবে আমার লড়াই—মেয়েদের মুক্তিই আমার আদর্শ।

বারো বছরের মেয়ের পক্ষে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার, বড়ই বেমানান! কিন্তু আমার জীবন, আমার পরিবেশ আমাকে দিলে পরিণতি।

একটু বা অকালেই পেকে উঠলাম। বিয়ের আইন নিয়ে মাথা ঘামাই, মেয়েদের দাসত্বের কথা ভেবে রাগ করি।

মার বন্ধু-বান্ধবরা আসেন, আমার মনে হয়, ওঁদের মুখে আছে সেই শয়তানের চাবুকের দাগ, দাসত্বের নিশানা ওঁরা বয়ে বেড়াচ্ছেন। শপথ করি, দাসত্ব গ্রহণ করব না—না, না-না!

সোবিয়েৎ রাশিয়াকে ধন্যবাদ দিই, বিয়ে তুলে দিয়ে তাঁরা নারীজাতির সম্মান রেখেছেন। খাতায় পুরুষ আর নারী নাম সই করলে—স্বাক্ষরের নিচে ছাপার অক্ষর জ্বলজ্বল করে উঠছে—

তুপক্ষের কারোই কোন দায়িত্ব নেই। যে কোন পক্ষ ইচ্ছে করলেই একে বাতিল করে দিতে পারবে।

এমন বিয়েতে যে কোন স্বাধীনা মেয়েই সায় দেবে, এমনি বিবাহেই আমার মত।

যাক ও-কথা।

মার জন্যেই আমাদের ভাই-বোনেদের জীবন কবিতা আর সঙ্গীতময় হয়ে উঠল।

মা রোজ সন্ধ্যেয় পিয়ানোর কাছে বসতেন। তারপর চলতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সুরের জাল বোনা। খাবার কথা, শোওয়ার কথা মনে থাকত না। আমাদের পরিবারের জীবনে ছিল না শৃঙ্খলা, ছিল না ঘড়ির কাঁটা মেপে চলা।

মা যখন বাজাতেন বা কবিতা আবৃত্তি করতেন, আমাদের কথা ভুলে যেতেন। পরিবেশ যেন লুপ্ত হয়ে যেত। তিনি তখন বেঠোফেনের সঙ্গে ঘুরছেন, শপ্যাঁর সঙ্গে আলাপ করছেন, নয়তো তাঁর সঙ্গী মহাকবির দল।

আগাস্টা মাসীরও ছিল, এদিকে যথেষ্ট প্রতিভা। তিনিও আসতেন, বাজাতেন। মাঝে মাঝে পারিবারিক থিয়েটারও হ'ত তাঁর উৎসাহে।

ভারি সুন্দরী, কালো চোখ, কয়লা-কালো তাঁর চুল। মনে পড়ে খাটো ঝুল মকমলের কালো জোব্বা পরে তিনি সাজতেন হ্যামলেট। সুন্দর তাঁর স্বর! যদি মঞ্চে নামতেন, তিনি হতেন মস্ত অভিনেত্রী। কিন্তু তাঁর বাপ-মা থিয়েটারের ঘোর বিরোধী। তাঁরা থিয়েটারকে বলতেন নরক। এতবড় প্রতিভা মাটি হয়ে গেল শুধু পরিবারের গোঁড়ামিতে।

এই গোঁড়ামিই তাঁকে দলে-পিষে দিলে। তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর প্রাণের উচ্ছলতা, তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বর—সব ধ্বংস হয়ে গেল। কেন?

সেকেলে বাপ-মা বললেন, মেয়ের মরা মুখ দেখব সেওভি আচ্ছা, তবু থিয়েটারে নামতে দেব না !

সেদিনকার মার্কিন মুলুকে এমনি গোঁড়ামি তো যথেষ্টই ছিল। এ-কালের মার্কিন মুলুকের মানুষ একথা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। এখন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সমাজের জীব—তারই অঙ্গ।

নাচ, গান-বাজনা—এই নিয়েই পাগল আমরা।

বাবার দেওয়া বড় বাড়িতে এসেই আমার ভাই অগাস্টিন গোলাবাড়িতে এক থিয়েটার খুলে ফেললে।

সেই যে ঘুম-কাতুরে রিপভ্যান উইঙ্কেল—সেই পালাই হবে। একশো বছর সে ঘুমিয়ে ছিল, সেই একশো বছরে তার গজিয়ে ছিল ইয়া লম্বা দাড়ি। অগাস্টিন সেই দাঁড়িওয়ালা রিপভ্যান উইঙ্কেল সাজলে।

আমি তো ওর অভিনয় দেখে অবাক! সত্যিই যেন সেই গল্পের বুড়ো, তেমনি চেহারা, তেমনি ভাবভঙ্গী!

অভিনয়ের শেষে সবাই ঘিরে ধরে বললে, ইয়া লম্বা দাড়ি কোথায় পেলি রে?

অগাস্টিন চুপ।

বসবার ঘরে ছিল একখানা ফারের কম্বল। সেইখানার খানিকটা কাটা। আমরা এবার রিপভ্যান উইঙ্কেলের দাড়ির উৎসটা আবিষ্কার করে ফেললাম। মাও শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

আমাদের ছোট থিয়েটার দিনে দিনে বেশ জমিয়ে তুললাম। পাড়ায় সাড়া ফেলে দিলে। এই থেকেই পরে এক ভ্রাম্যমান দল গড়ে উঠেছিল। আমি নাচতাম, অগাস্টিন আবৃত্তি করত, তারপরে এক নাটক হোত, এলিজাবেথ আর রেমাণ্ড তাতে অভিনয় করত। আমরা তখন সবাই ছেলেমানুষ, কিন্তু দলটা বেশ নাম কিনে ফেলেছিল।

আমার শৈশব! তার সবচেয়ে বড় কথা ছিল বিদ্রোহ। সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, জীবনের গণ্ডির বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ। মন তখন উপছে পড়ছে। কে তাকে বেঁধে রাখবে। তাই মনে হোত, ভাঙতে হবে এই সমাজ, গুঁড়িয়ে দিতে হবে এই পরিবেশ, এখান থেকে মুক্তি চাই! সে-মুক্তি উদার বিশ্বে। আর সে-মুক্তির প্রথম কথা, আমাদের এই পরিবেশ পরিবর্তন।

যখনি কথা ওঠে, বলি, এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। এখানে থাকলে, কিছুই করতে পাবব না।

সবাই শুধায়, কোথায় ?

শুধু বলি, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে
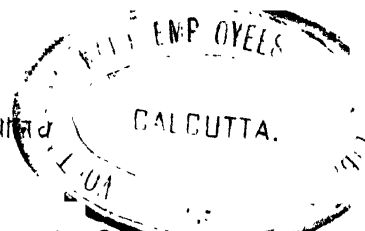
পরিবারের মধ্যে আমার সাহস একটু বেশি। একটু বেশি বেপরোয়া আমি। ঘরে খাবার নেই, পয়সাও নেই যে খাবার কেনা হবে। সবাই গম্ভীর।

এগিয়ে এসে বলি, আমি চললাম খাবার আনতে।

চলে যাই কষাইয়ের কাছে। গিয়ে কত সাধ্য-সাধনা, কত কাকুতি-মিনতি, কত ছল করে তবে মাংস নিয়ে আসি। রুটিওয়ালার কাছেও যাই। তাকেও ভুলিয়ে রুটি আনি।

এতে আমার লজ্জা নেই, ক্ষোভ নেই, বরং আনন্দ। এ যেন এক দুঃসাহসিক অভিযান। কখনো কখনো ব্যর্থতা আসে। তবু মুষড়ে পড়ি না। তবে বেশির ভাগই আসে সফলতা। নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে আসি। দুহাতে জিনিসপত্র, মনটা তখন লুঠেরার মতোই গর্বে ভরা।

এমনি করেই জীবনের পথে চলতে শিখলাম।

ভীষণ-দর্শন কষাইদের কাছ থেকে মাংস আদায় করতাম বলে আজ কূচক্রী ম্যানেজারদেরও আমি ডরাইনে।

একদিনের কথা মনে পড়ে।

আমি তখন খুবই ছোট। খেলতে গিছলাম, বাড়ি ফিরে দেখি, মা অঝোরে কাঁদছেন। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি ?

মা বললেন, তিনি এক দোকানের জন্য কিছু জামা তৈরী করে দিয়েছিলেন, সেগুলো তারা বাতিল করে দিয়েছে, তাই কাঁদছেন। এখন কি হবে ? ঘরে পয়সা নেই, খাবার তো চাই!

বললাম, মা, আমি এগুলো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসি।

কোথায় বিক্রি করবি বাছা ?

সে দেখবে 'খন, একটাও পড়ে থাকবে না।

মাথায় উলের ছোট্ট টুপীটা চাপালাম, হাতে উলের দস্তানা, তারপর বেতের ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দোকান-মুখোও গেলাম না। দরজায় দরজায় ঘুরে বিক্রি করতে লাগলাম। যেখানেই যাই, সবাই ভিড় করে আসে। ফুটফুটে ছোট মেয়েটিকে

দেখে ওদের কৌতূহল বেড়ে যায়। তারপরে একটা-না-একটা কিছু কিনে ফেলে!

দর-দামেও আমি সেয়ানা। চড়া দামই হাঁকি।

শেষে ঝোলা দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল। আর আমিও নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলাম।

মাকে এসে বললাম, দেখতো, কত টাকা এনেছি! দোকানে তোমাকে এত টাকা দেবে কখনো?

মা আমাকে কোলে নিয়ে আমার ঠোঁট দু-খানি চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন।

প্রায়ই শুনি, অমুক ছেলেমেয়ের জন্য বেশ টাকা রেখে যাবেন, তাদের আর ভাবতে হবে না।

কিন্তু সেই তো মহাভাবনার কথা।

বাপের সঞ্চিত টাকা তো ওদের জীবনের সংগ্রাম থেকে বঞ্চিত করবে। কেড়ে নেবে সংগ্রামের সেই আনন্দ, দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ তো ওরা তো জীবনে পাবে না। প্রতিটি টাকা তিলে তিলে ওদের দুর্বল করে ফেলবে। তার চেয়ে বলি, ছেলেমেয়েদের অনুপার্জিত টাকার স্তূপের উপর বসিয়ো না, ওদের নিজেদের পথ করে নিতে দাও! সেই তো পরম উত্তরাধিকার।

এ আমার শেখা বুলি নয়, আমার জীবন আমাকে দিয়েছে এ-শিক্ষা।

নাচ গান শেখাতে আমরা যেতাম বড় বড় ধনীর বড় ঘরে। তাদের ছেলে-মেয়েদের দেখে করুণা হোত। কেমন পুতুলের মতো সেজেগুজে থাকে, পুতুলের মতো পরের উপর নির্ভর করে চলে। তেমনি ওরা ফিটফাট, তেমনি প্রাণহীন। ওদের চেয়ে নিজেদের ঢের বড় বলে মনে হোত।

আমাদের নাচ-গান শেখানোর খ্যাতি তখন ছড়িয়ে পড়ছে। আমরাও আমাদের নাচের ধারাকে আনকোরা নতুন বলেই জাহির করছি। কিন্তু আমার নাচের তো ধারা ছিল না, ছিল না রীতি। আমার কল্পনা জন্ম দিত অনুপ্রেরণার, আর সেই অনুপ্রেরণা থেকে সৃষ্টি হোত নাচ। যা কিছু সুন্দর দেখতাম, তাই নিয়েই গড়ে উঠত পরিকল্পনা। আমার গোড়ার দিকের একটি নাচের কথা বলি।

কবি লিখেছিলেন—

শূন্যে তীর হানি
শূন্যের হাত ছানি।

কবিতাটা আমি প্রায়ই আবৃত্তি করতাম।

এই কবিতা নিয়েই শুরু হ'ল নাচ। আমি হাত-পা নেড়ে আবৃত্তি করতাম, ছেলেমেয়েদেরও আবৃত্তি করতে গিয়ে মুখে ফুটে উঠত লাস্য, হাত যেন দুলে দুলে উঠত আবেগে। অসীম শূন্যে তীর ছুঁড়েছে তারা, আর সেই তীর তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে অসীমের সন্ধান। প্রতি অঙ্গ তাই কাঁদছে অসীমে উধাও হবার কামনায়। পায়েও সেই ব্যাকুলতা। বুঝলাম এইখানেই নাচের সার্থকতা। এই নাচ শেখাতে লাগলাম ছেলেমেয়েদের।

মা রোজ বসতেন পিয়ানোয়, আমি এমনি অবাধ কল্পনা আর অগাধ কামনা মিশিয়ে সৃষ্টি করতাম।

মার এক বন্ধু প্রায়ই আসতেন। তিনি ছিলেন নাচের শহর ভিয়েনায়। তাঁর কাছে শুনতাম নাচিয়েদের খবর। ফ্যানি এলসার তখন বিখ্যাত নাচিয়ে। তিনি বলতেন, আমাদের ইসাডোরাও ফ্যানি এলসার হবে।

শুনে স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতাম।

তিনিই আমাকে ব্যালে ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে বললেন। ভর্তিও হলাম। কিন্তু মাষ্টারের শেখানোর রীতিটা আমার পছন্দ হ'ল না।

তিনি প্রথমেই আমাকে বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন।

শুধালাম, কেন?

কেন? বুঝি বা ক্ষেপে গেলেন তিনি। তীব্রস্বরে বললেন, ভঙ্গীটি সুন্দর— তাই।

আমি উত্তর দিলাম, ভঙ্গীটা বিশ্রী, স্বাভাবিকও নয়।

শুনে তিনি চটে উঠলেন। ইস্কুল থেকে সেই যে বেরিয়ে এলাম, আর ফিরিনি।

কসরৎকেই ওরা ইস্কুলে নাচ বলে। ওতে তো আমার মন ওঠে না। আমার নৃত্যের স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে যায়। আমার নৃত্য-স্বপ্ন তো ভিন্ন। সে-স্বপ্ন কি রূপ নেবে তখনো ভাবতে পারিনি। কিন্তু মনে হোত—এক অদৃশ্য জগৎ আছে, আছে এক রহস্যপুরী, তার ছোঁয়ানকাঠি আসবে আমার হাতে। আমি তার দরজা খুলে দেব, সবাইকে সেখানে ডেকে নিয়ে যাব। আমার পথ তো ছকা হয়ে গেছে—কার না পথ ছকা হয়? কিন্তু সে-পথ রুদ্ধ করে দেন তাদের বাবা-মা, চাপিয়ে দেন বিধিনিষেধের বোঝা, মৌলিকতা, সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা উবে যায়। যে হতে পারত কবি, সে হয় কেরানী। এই তো ধনবাদী সভ্যতার শিক্ষা!

মার আমার চারটি সন্তান। তাদের তিনি হয়তো শাসিয়ে ধমকিয়ে, তম্বি করে মানুষ করে তুলতে পারতেন। মানুষ বলতে এ-দুনিয়ায় যা বোঝায়—আমরা হতাম তাই। হয়তো তাঁর সে-সাধও ছিল। তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করতেন—

চারটে ছেলেমেয়ে, চারটেই মানুষ হ'ল না!

কিন্তু তাঁর অস্থিরতা, সুন্দরের কামনা আমরাও পেয়েছিলাম, তাই অর্থের বিভূতি মাখলাম না, হলাম না ধনবাদী জগতের পরিভাষায় মানুষ। মাও তো তা ছিলেন না। সংসারের তাঁর মন ছিল না, বুঝি ঘৃণাই করতেন। আমাদেরও সেই ঘৃণাই শিখিয়েছিলেন। আসবাবপত্র, বেশভূষা, খাবার, সবকিছু আমরা তুচ্ছ করতে শিখেছিলাম। তিনি শিখিয়েছিলেন বলেই জীবনে হীরে-মুক্তো কখনো পরতে পারিনি। তিনি বলতেন,

ওগুলো তো মানুষের সহজ, সরল, সুন্দর হবার পথে বাধা।

ইস্কুল ছাড়লাম। লেখাপড়ার ইস্কুল আগেই ছেড়েছিলাম, নাচের ইস্কুলেও ইস্তফা দিলাম। কিন্তু পড়া বাদ দিইনি। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে এক মস্ত লাইব্রেরী ছিল। লাইব্রেরীয়ান ভদ্রমহিলাও ছিলেন চমৎকার মানুষ। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি অগাধ পড়াশুনো। তার উপরে আবার কবি। তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন, পড়াশুনোয় উৎসাহ জোগাতে লাগলেন। আমি যখনি যে বইখানি চাইতাম, দিয়ে দিতেন। তাঁর সুন্দর দুটি চোখ আজও মনে পড়ে। সে চোখে ছিল আগুন—কিসের আগুন? কামনার? প্রতিভার? পরে শুনেছিলাম, বাবা এক সময়ে তাঁকে বড় ভালবেসেছিলেন। হয়তো তিনি ছিলেন বাবার জীবনের কামনা, তাঁর কবিতার উৎস। তাই বুঝি প্রথম দেখায়ই তিনি আমার মন টেনেছিলেন।

এই সময়ে পড়লাম মহাকবি শেইকসপিয়ারের নাটক, বড় বড় রথী-মহারথীদের উপন্যাস। তাছাড়া ভালমন্দ কত বই নির্বিচারে পড়ে গেলাম। ভোজে কি কেউ বাছবিচার করে? যে করে সে করুক, আমি তাদের দলে নই।

রাত জেগে পড়তাম। মোম জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে আসত, ভোরের আলো ঝলক দিয়ে উঠত পূব আকাশে, তখনো পড়া আমার শেষ হোত না। আর মোম কোথায় পাব? কুড়িয়ে-কুড়িয়ে আনতাম ফেলে-দেওয়া টুকরোগুলি—তাই জুড়ে জুড়ে আমার রাতের পড়া চলত। এই সময়ে একখানা নভেল লিখতে শুরু করি। একখানা খবরের কাগজও হাতে লিখে বার করি, তার সবটুকুই আমার লেখা; তাছাড়া ছিল আমার ডায়েরী—আমার রোজনামচা। সেটি আবার

এক অদ্ভুত ভাষায় লেখা। সে ভাষা আমার আবিষ্কার। এ আবিষ্কারের মূলেই ছিল আমার নিজের তাগিদ। মনের গোপন কথাকে ঢেকে রাখতাম এই দুর্বোধ ভাষার আড়ালে। কি সে গোপন কথা?

সে আমার প্রেম।

আমাদের নাচের ইস্কুলে শুধু ছেলেমেয়েরাই আসত না, দু-একজন বড় বড়ও এসে উদয় হতেন। এঁরা আবার মেয়ে নয়, পুরুষ। একজন ডাক্তার, আর একজন ডাক্তারখানার সহকারী। সে বড় সুন্দর, সুন্দর তার নাম। কি যেন নাম? ভার্নন।

আমার তখন এগারো বছর বয়েস, বয়েসের চেয়ে বড়ই দেখায়, বেশ-ভূষায়ও বড়দের মতো। তেমনি চুল বাঁধি, তেমনি ঢিলেঢালা গাউন পরি। দেহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, মনও পিছনে পড়ে নেই। তাই ভার্ননকে দেখে ভাল লাগল, ভালবেসে ফেললাম। রোজনামচায় লিখলাম, আমার সুন্দর এসেছে। তার প্রেমে পাগল। সত্যিই তখন মনে হয়েছিল, পাগল হয়ে গেছি।

আমার প্রেমিকটি এ কথা জানে কি জানে না—তা ভাবিনি। জানতেও চাই নি। সেখানে ছিল আমার লজ্জা। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে যেতাম বল নাচের আসরে, কত নাচতাম তার সঙ্গিনী হয়ে। বুকে বুকের স্পর্শ মেখে আসতাম, বাহুতে নিয়ে আসতাম তার দেহের মদির সুগন্ধ মেখে। তারপরে সারা রাত ধরে চলত আমার রোজনামচা লেখা। একবার লিখেছিলাম—ওর বাহুবন্ধনে আমি যেন ভেসে বেড়াই। সত্যি—কথাটা সত্যি!

দিনের বেলায় ও কাজ করত সদর সড়কের এক ডাক্তারখানায়। আমাদের ডেরা থেকে সেটা ছিল বহু দূরে। কিন্তু মাইলের পর মাইল হেঁটে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম রোজ। কখনো বা সাহস করে ঢুকে বলতাম, কেমন আছ?

ওর বাড়িটাও চিনে নিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় তার আশেপাশেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। আলো জ্বলে উঠত ওর ঘরে, জানালা দিয়ে আলোর টুকরো এসে পড়ত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। আমিই যেন রোমিয়ো, ও যেন জুলিয়েৎ। মনে মনে বলে উঠতাম—

ঐ তো পূর্ব দিক, ঐ তো আকাশ
আমার সূর্য—জুলিয়েৎ আমার সূর্য!

দু' বছর ছিল প্রেমের পরমায়ু। একদিন এসে জানালে, ওর বিয়ের কথা। ভেঙে গেল আমার প্রেমের স্বপ্ন, গুঁড়িয়ে গেল। রোজনামচায় লিখে রাখলাম মনের সেই হতাশা, বুকের রক্ত দিয়ে লেখা হ'ল।

বিয়ের দিন, গীর্জায় গিয়ে হাজির হলাম। দেখতে হবে তাকে, যে ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে। দেখি, বিজয়িনীর কি আছে, আমার চেয়ে সে কিসে সেরা? দেখলাম, এক সামান্যা মেয়ে, সাদা ওড়নায় মুখখানি ঢাকা, রূপ নেই, নেই লাস্য, নেই ছন্দ! সাধারণী। একেবারে সাধারণী।

তারপরে ওর সঙ্গে আর দেখা করিনি।

বহুদিন পরে স্যান ফ্রান্সিসকোতে দেখা। নাচের শেষে নিজের ঘরে বসেছিলাম, এমন সময় তুষারের মতো সাদা মাথা একটি লোক এল দেখা করতে। মানুষটির মুখখানি বড় তরুণ, বড় তাজা। দেখেই চিনলাম, এই তো আমার প্রথম প্রেম—এই তো সেই ভার্নন! ওকে হাসতে হাসতে বললাম—

ভার্নন, সেই এগারো বছর বয়সে তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তুমি আমার প্রথম প্রেম।

ভার্নন ভয় পেল। সে বললে, আমার স্ত্রী আছেন, তিনি শুনলে কি ভাববেন?

বললাম, ভাবুন যা খুশি, এ তো রূপকথা। এ নিয়ে কেউ ভাবে নাকি?

কিন্তু ও ভয় পেল। তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে।

হেসে গড়িয়ে পড়লাম সোফায়, ভেঙে পড়লাম। আমি সাহসিকা, একালিনী, বিদ্রোহিনী, কিন্তু আমার প্রথম প্রেমিক খুঁজে নিয়েছিলাম এমনি ভীরু এক মানুষকে!

আমার সেই প্রথম প্রেম। তার এমনি করেই ইতি হ'ল। শেষ স্মৃতিটুকু ভীরুতায় কদর্য হয়ে উঠল! অথচ তখন তো ভেবেছিলাম, আর বুঝি কখনো অমন করে ভালবাসতে পারব না।

চার

স্যান ফ্রান্সিসকোয় আমাদের বাস। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে কবে আমাদের পরিবার এখানে এসে নীড় গড়েছিলা, তারপর থেকে এখানেই আমরা আছি।

কিন্তু আর ভাল লাগে না। একঘেয়ে জীবন, হাঁফিয়ে উঠেছি।

এক ভ্রাম্যমান নাটুকে দল এসেছে শহরে। তারই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

ম্যানেজার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি চাই ?

চাই আপনার থিয়েটারে অভিনয় করতে, উত্তর দিলাম।

অভিনয় জান ?

জানি, নাচতেও পারি।

আচ্ছা, কাল এস, পরীক্ষা দিতে হবে।

পরদিন।

মাকে নিয়ে গেলাম।

শূন্য মঞ্চ পড়ে আছে। সেখানে হবে আমার পরীক্ষা।

পরীক্ষা দিলাম।

মা বসলেন পিয়ানোয়। আমি নাচলাম, বিখ্যাত সুরকার মেণ্ডেলসনের 'নীরব গীতির' তালে তালে। সুর স্তব্ধ হ'ল। ম্যানেজার নীরব!

খানিকক্ষণ পরে বললেন, গীর্জেয় এসব চলতে পারে, থিয়েটারে চলে না। মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান!

মা ফিরে এলেন আমার হাত ধরে। হতাশ হ'লাম, কিন্তু নিজের প্রতিভায় আস্থা হারাইনি। সন্ধ্যেবেলা ডেকে জড়ো করলাম বাড়ির সবাইকে, স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, আর এখানে আমি পড়ে থাকব না।

মা বললেন, সে কি এতদিন আছি, ছেড়ে যাব ? কোথায় যাব ?

জানি না। শুধু জানি, এখানে আর নয়।

মা হক্‌চকিয়ে গেলেন। কিন্তু মেয়ের সাধে তিনি বাদ সাধেন নি। তিনি আমার অনুসরণ করতে রাজী হয়ে গেলেন। আর সবাই রইল, মা আর মেয়ে চললাম শিকাগোর উদ্দেশ্যে। যদি শিকাগোয় সৌভাগ্য এসে ধরা দেয়, তখন যাবে আর সবাই।
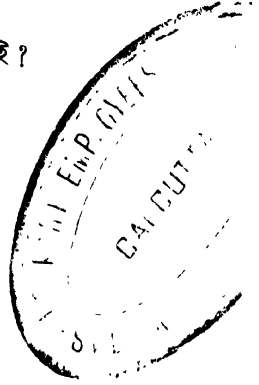
শিকাগো শহরে এসে গেলাম। সঙ্গে একটি ছোট ট্রাঙ্ক। সম্বল দিদিমার কাছ থেকে পাওয়া সাবেক কালের কিছু গয়না আর পঁচিশটি ডলার। তখন ভাবছি, শিকাগোর পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে সৌভাগ্য, তাকে তুলে নিলেই হবে। কাজ পেয়ে যাব, তার পরে তো সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবনধারা।

কিন্তু তা তো হ'ল না।

ম্যানেজারের পর ম্যানেজারের সুমুখে নাচতে হ'ল। সবাই একমত : ভারি সুন্দর, কিন্তু থিয়েটারে এ-জিনিস চলে না!

সপ্তাহ যেতে না যেতেই পুঁজিপাটা শেষ হয়ে গেল। দিদিমার সাবেক আমলের গয়না বেচেও বিশেষ কিছু মিলল না। তারপরে তো সেই অবশ্যম্ভাবী দশা। ঘরভাড়া দিতে পারি নে, ওরা মালপত্র আটকে রেখে দিলে। একদিন পথে এসে দাঁড়ালাম। পকেটে তখন আধলাও নেই।

আমার জামাটার কলারটি ছিল ভারি সুন্দর, চমৎকার তার কাজ, আইরিশ কারিগরের কীর্তি। সেটি বেচবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরছি তো ঘুরছিই, রোদে চন্‌চন্ করছে মগজ, তেঁতে-পুড়ে যাচ্ছি। কিন্তু বন্ধকী দোকানীরা কেউ কিনবে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তার পরে বিদায় দেয়। শেষে বিকেলের দিকে এক দোকানে সেটি বিক্রি করা গেল। দশ-দশটি ডলার পাওয়া গেল।

ঘরভাড়া হ'ল, বাকি যা রইল তা দিয়ে কিনলাম একঝুড়ি টোম্যাটো। হপ্তাভোর সেই হ'ল মা-মেয়ের খাবার। নুন আর রুটির মুখ দেখলাম না। সেদিকে কিন্তু কারোই ভ্রুক্ষেপ নেই—ঐ খেয়ে-দেয়েই বেরুচ্ছি, কাজের ধান্দায় ঘুরছি।

মার বয়েস হয়েছে এ-ধকল সইবে কেন? তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। এমন দুর্বল যে উঠে বসতে পারেন না।

যাহোক, কাজের চেষ্টা করেও কাজ মিলল না। শেষে থিয়েটারের কাজের আশা ছেড়ে দিয়ে যে-কোনো কাজের চেষ্টা শুরু হ'ল। এক কর্মদান সমিতির কাছে দরখাস্ত পেশ করলাম।

অফিসে একটি ভারিক্কী গোছের স্ত্রীলোক বসে ছিলেন, বললেন, কি কাজ করতে পারবে?

যে-কোন কাজ, উত্তর দিলাম।

তা বাছা, তোমাকে দেখে তো মনে হয়, কোনো কাজই পারবে না।

সেখান থেকে চলে এলাম রেগে।

এদিকে শোচনীয় দশা। টোম্যাটোর ঝুড়ি প্রায় ফাঁকা। মা দুর্বল।

শেষে বেপরোয়া হয়ে এক নৃত্যশালার ম্যানেজারের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলাম

লোকটির মুখে মস্ত চুরুট, মাথায় টপ হ্যাট—আর সবকিছুর উপরই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। কিন্তু আমার অত-শতো দেখলে চলে না, কাজ চাই।

মেণ্ডেলসনের 'বসন্তের গান' বাজানো হ'ল। বসন্ত এসেছে, ফুল আর সবুজ পাতার সমারোহ। আমার রক্তে যেন স্থর বেজে উঠল। মনে হ'ল, মনের গভীরে স্পন্দন জাগছে। সবুজ পাতা, সুন্দর ফুল নিজেদের মেলে মেলে দিচ্ছে দলে দলে।

ম্যানেজার মশাই মাথা নেড়ে বললেন, তোমার ভঙ্গীটি ভাল, দেখতেও তুমি সুন্দর, কিন্তু এসব তো চলবে না। একটু কড়া ঝাঁজ চাই—একটু···বুঝলে কি না। তাহলে তুমি এখানে চাকরী পাবে।

মার অসুখ, মাথার উপরের ছাউনি টলমল, খাবারের মধ্যে হয়তো শেষ টোম্যাটোটা ঝুড়িতে পড়ে আছে! তাই চলে আসতে চাইলেও, পারলাম না। বললাম, আপনি কি চান?

এই এসব নয়। স্কার্ট পরতে হবে, পোষাকের ঝালর দুলবে ঘন ঘন, পা পড়বে দুপ্‌দাপ্‌। এই টে আগে, তারপরে কিন্তু সাজগোজ চাই। নইলে কি দিয়ে ভোলাবে দর্শককে?

কিন্তু কোথায় পাব আমি সাজ-পোষাক! ধার বা অগ্রিম চাইতে গেলে ম্যানেজার-মশাই এখুনি বিদেয় দেবেন। তাই বললাম,

আচ্ছা মশাই, কাল সাজ-পোষাক নিয়েই আসব।

বেরিয়ে এলাম।

বাইরে অসহ্য গরম। পথে পথে ঘুরছি, ক্ষুধা তৃষ্ণা আর ক্লান্তিতে বুঝি মূর্চ্ছা যাব এমনি দশা। এমন সময় দেখতে পেলাম মস্ত এক পোষাকের দোকান। শো-কেসে শো-কেসে ঝলমলে পোষাক।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তারপরে ঢুকে পড়লাম। একজন কর্মচারী বসেছিল, বললে, কাকে চাই?

ম্যানেজার মশাইকে।

তাঁর ঘরে তখুনি ডাকও পড়ল। গিয়ে দেখি, একটা টেবিলের ধারে বসে আছেন এক যুবক। মুখখানি দেখে ভালই লাগল। ভারি সুন্দর দুটি চোখ, আর প্রসন্ন তার দৃষ্টি। তাঁকে বললাম, দেখুন, আমার ঝালর দেওয়া নাচের পোষাক চাই, বেশ জমকালো হবে। ম্যানেজার কাকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে

থামিয়ে দিয়ে বললাম, কিন্তু আমার কাছে কেনার মতো টাকা নেই, চাকরীটা পেলে আপনাকে আমি কিস্তিতে কিস্তিতে ধার শোধ করে দেব।

কুণ্ঠা নেই আমার স্বরে, ভিক্ষে চাইতে আসি নি, এসেছি কিনতে।

যুবক ম্যানেজার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা, তাই হবে।

এবার পছন্দ করে কিনলাম সাদা আর লাল কাপড় আর লেস। বাণ্ডিলটি বগল-দাবা করে বেরিয়ে এলাম।

এসে দেখি, মা মরণাপন্না, কিন্তু তবু তিনি উঠে বসে পোষাক তৈরী করতে বসে গেলেন। সারা রাত ধরে কাজ চলল, ভোর বেলায় শেষ লেসটি লাগানো হ'ল। আমি পোষাক পরে এবার গেলাম ম্যানেজারের কাছে।

কি নাচ নাচবে? কোন্ সুর বাজাতে বলব?

তখন আমেরিকায় একটা হাল্কা সুরের খুব চল ছিল, সেইটেই বাজাতে বললাম। তারপর ধেই ধেই করে নাচ। নাচে স্কার্ট বার বার উঠল পড়ল, আমার পা দু-খানা বেশ ভাল করেই দেখানো হ'ল। ম্যানেজার খুশি, মোটা চুরুটটি মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, চমৎকার! কাল রাতে এস, আমি তোমাকে নতুন আবিষ্কার হিসেবে সবার কাছে হাজির করব।

সপ্তাহের মাইনে ঠিক হ'ল পঞ্চাশ ডলার, আর সেটা আগামই দিয়ে দিলেন।

ঘরভাড়া, খাবার সবই জুটল, মাও সুস্থ হলেন।

একটি নতুন নাম নিলাম, ছাদের বাগানের নাচের আসরের আমিই তারকা। ম্যানেজার মশাই খুশি হয়ে জানালেন, আমার সঙ্গে তিনি দীর্ঘ চুক্তি করতে রাজী। কিন্তু আমি রাজি হলাম না।

কেন, রাজী হচ্ছ না কেন? ম্যানেজার মশাই শুধালেন।

উত্তর দিলাম, উপোস থেকে বাচিয়েছেন বলে ধন্যবাদ, কিন্তু আর নয়। আমার আদর্শের বিরুদ্ধে নেচে আর পেট ভরাতে চাইনে!

ম্যানেজার মশাই ক্ষুব্ধ হলেন। আমিও বেরিয়ে এলাম।

আদর্শের বিরুদ্ধে নাচ প্রথম ও সেই শেষ।

তারপরে আবার ভয়াল জীবন। নেই মাথার উপরে ছাদ, নেই খাবার। নিষ্ঠুর শিকাগো শুধু বিছিয়ে আছে। সেখানকার পথঘাট নিষ্করুণ, নির্মম।

কিন্তু মা আমার সাহসিকা, তিনি মুখ বুজে সইতে লাগলেন। একটিবার বললেন না, চল, বাড়ি ফিরে যাই!

দু-একজনের সঙ্গে এরই মধ্যে আলাপ হয়েছিল. কিন্তু অন্তরঙ্গতা হয়নি। তাদের একজনই একখানা পরিচয়-পত্র দিলে এক সাংবাদিক মহিলার কাছে। নাম তাঁর য়াম্বার। শিকাগোর এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক তিনি। আমি দেখা করতে গেলাম।

ঢ্যাঙা, শক্ত-সমর্থ মহিলা। বয়েস পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন, একমাথা লাল চুল। তাঁকে বললাম, আমার নাচের আদর্শের কথা। তিনি মন দিয়ে শুনলেন, তারপরে বললেন,

তোমার মার সঙ্গে আজ বোহেমিয়ায় চল। সেখানে শিল্পী আর সাহিত্যিকরা আসেন। দেখা হবে, আলাপ হবে। সেখানে বলতে পারবে, তোমার আদর্শের কথা ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

মার সঙ্গে বোহেমিয়ায় গেলাম সেইদিন সন্ধ্যেবেলা।

একটা মস্ত বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় এই বেপরোয়া শৃঙ্খলা-বিরহিত মানুষদের আড্ডা বোহেমিয়া। ঘর ফাঁকা, দেয়ালে নেই ছবি, মেঝেয় নেই গালচে। আছে কতকগুলি চেয়ার-টেবিল। আর তাতে বসে আছে সব অদ্ভুত জীবের দল। মাঝখানে মক্ষীরানীর মতো য়াম্বার। শুধু বলছেন,

আরে, আরে, এবার শৃঙ্খলাহীন মানুষের দল, তোমরা ঘিরে দাঁড়াও, ঘিরে দাঁড়াও! তোল, তোমাদের পানপাত্র। ঢাল আর খাও, ঢাল আর খাও!

পুরুষের মতোই তাঁর কণ্ঠস্বর।

তাঁর স্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ারে পূর্ণ মগ হাতে হাতে উঠে এল ঠোটে, পান চলল। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হল্লা আর স্খলিত সুরে গান।

একেবারে গুলজার আসর!

এরই মধ্যে আমি নাচলাম। বোহেমিয়ায় বইয়ে দিলাম নৃত্যছন্দে ধর্মের প্রবাহ। গীর্জেয় যে-নাচ চলে, সেই নাচই চলল এই উচ্ছৃঙ্খল আসরে।

বোহেমিয়া বুঝি অবাক হয়ে গেল, বুঝি বিমূঢ়।

কি বলবে, ভেবে পেল না।

হাততালি দিতে উঠে হাত মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে গেল।

তবু ওরা ভাল মানুষ, বললেন,

তুমি রোজ রোজ আসবে, আমাদের আসর তোমাকে না হলে চলবে না।

এই শৃঙ্খলাবিহীন মানুষের দল অদ্ভুত জীব। এঁদের মধ্যে আছেন কবি, শিল্পী, অভিনেতা। আবার জাতও তাঁদের হরেক রকম। শুধু এক বিষয়ে তাঁরা অভিন্ন—একটি আধলা কারো পকেটে নেই। একেবারে নিঃস্ব। আমার সন্দেহ হোত, আমাদের মতোই ওদের অনেকেই উপোস করে দিন কাটায়। আড্ডায় এসে বীয়ার আর স্যাণ্ডউইচ গিলে পেট ভরায়! এর বেশির ভাগ খরচাই যোগান য়াম্বার।

এরই মধ্যে একটি মানুষকে নজরে পড়ল। হৈ-হল্লার মধ্যে একেবারে চুপচাপ মানুষটি এক কোণে বসে পাইপ টেনে চলেছেন। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের হাসি খেলে যাচ্ছে মুখে। লোকটির নাম মিরোস্‌কী। পোল্যাণ্ডের মানুষ! একদিন তিনি নাচের শেষে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন,

কাছে গেলাম।

পাশে বসিয়ে বললেন, এই এরা কি তোমার নাচের মর্ম বুঝবে? কেন তুমি নাচ ওদের জন্যে?

ওদের একজনও কি আমার নাচ বোঝে না?

না, না! যদি কেউ বোঝে, সে আমি—একমাত্র আমি!

তাঁর সঙ্গে ভাব জমে উঠল।

তিনিও গরীব! তবু মাকে আর আমাকে মাঝে মাঝে ছোটখাটো রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতেন, খাওয়াতেন। কখনো বা আমরা শহরের বাইরে গিয়ে করতাম চড়ুইভাতি। গোল্ডেন রড ফুল তিনি বড় ভালবাসতেন। দেখা করতে এলেই এক গোছা ফুল নিয়ে আসতেন। আজও গোল্ডেন রড ফুলের সেই রক্তস্বর্ণাভা দেখলে মিরোস্‌কীর কথা মনে পড়ে।

অদ্ভুত মানুষ! একাধারে কবি আর চিত্রকর। কি-একটা ব্যবসা করতেন। কিন্তু ব্যবসা ভাল চলত না, তাই খাওয়াও দু-বেলা জুটত না।

আমি ছোট্ট মেয়ে—তাঁর জীবনের গভীরে যে-দুঃখ লুকিয়ে ছিল, তা বুঝতাম না। তাঁর প্রেমও ছিল আমার অজানা।

আমি তখন ভাববিলাসিনী। যাকে মানুষ বলে রোমান্টিক তাই। গীতি কবিতার মতোই ছন্দময় আমার জীবন। বাস্তব প্রেম সেখানে দেখা দেয়নি, শুধু আছে কল্পনার প্রেম—তারই রক্তরাগে মন আমার রঙীন। আমি কি করে বুঝব, তিনি আমার প্রেমে উন্মাদ, অধীর!

আমাকে তিনি কাছে ডাকতেন, পাশে বসাতেন, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন।

নীল চোখে স্ফূর্ত হয়ে পড়ত জ্বালা। সে কি জ্বালা বুঝতাম না, কিন্তু দেহ কেঁপে উঠতো থরোথরো। তিনি হঠাৎ আমার হাত দু-খানি আবেগে চেপে ধরতেন, বহুক্ষণ ধরে থাকতেন। আবার শিথিল হয়ে পড়ত বন্ধন। এমনি করেই চলছিল তাঁর অপ্রকাশ প্রেম।

মাও কিছু টের পাননি। বয়স্ক মানুষ এমনি করে প্রেমে পড়তে পারেন কি করে বুঝবেন!

তিনি তাঁর সঙ্গে অবাধে মিশতে দিতেন, বেড়াতে যেতে দিতেন।

একদিন শহরের বাইরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তাঁর নীল চোখ দুটি জ্বলে উঠল, মুখে রক্তিমাভা! ভয় পেলাম। যৌন-চেতনা তখন আমার জেগেছে। মনে হ'ল, এক আদিম গুহাবাসী মানুষ যেন জেগে উঠেছে কামনায়। সে কারো বাধা মানবে না।

সত্যিই বাধা মানলেন না মিরোস্কী, আমাকে জড়িয়ে ধরে দলিত আঙুরের মত নিষ্পেষিত করতে লাগলেন, চুমু ঝরে ঝরে পড়ল।

বললেন, ইসাডোরা, আমাকে তুমি বিয়ে কর। আমাকে সুখী কর!

কি বলব?—তাঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে চলে এলাম।

আমার জীবনের আর-এক প্রেম এমনি করেই এল। এ এক মহান প্রেম। প্রৌঢ় নিবেদন করলে কিশোরীর কাছে তার প্রেম, কিশোরী তাকে গ্রহণ করলে। দুজনে তারা প্রেমে বিভোর।

একদিকে প্রেমের স্বপ্ন, তাই দিয়ে ঘেরা যুগলের নীড়। অন্যদিকে কঠিন-কঠোর বাস্তব।

হাতে টাকা নেই। শিকাগোতে কাজ মেলবারও আশা নেই।

মন নিউইয়র্কের দিকে ছুটে যেতে চায়।

কিন্তু কি করে যাব? রাহা খরচ নেই।

একদিন কাগজে দেখলাম, অগাস্টিন ডলি আর তাঁর বিখ্যাত দল এসেছে শহরে। সঙ্গে তারকা য়্যাডা রেহান। অমনি ঠিক করলাম, এই বিখ্যাত ডালির সঙ্গে দেখা করব। তাঁর সত্যিকারের রুচি আছে বলেই জানি।

দেখা করতে গেলাম—দিনের পর দিন চিরকূট পাঠালাম—দেখা করতে চাই, কিন্তু সেই এক উত্তর—তিনি ভারি ব্যস্ত, সময় হবে না; তবে তাঁর সহকারীর সঙ্গে দেখা হতে পারে, কিন্তু তাতে আমি নারাজ।

থিয়েটারের দরজায় আমার রাত আর দিনগুলি কাটতে লাগল। সব সময়ে দাঁড়িয়ে থাকি। শেষে বুঝি ডালির দয়া হ'ল। এক সন্ধ্যায় তিনি ডেকে পাঠালেন।

খাস কামরায় গিয়ে দেখি তিনি বসে আছেন। তাঁর মুখের চেহারা ভীষণ। শুনেছিলাম, অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেই মুখের চেহারা তাঁর পাল্‌টে যায়।

তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, কি চাই?

ভয় পেলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই সাহস করে বলে ফেললাম, আমার মহান আদর্শের কথা বলতে এসেছি আপনাকে?

আদর্শের কথা? অবাক হয়ে তাকালেন ডালি। ভ্রু তাঁর কুঞ্চিত!

আমি মরীয়া, বললাম, হাঁ. আদর্শের কথা সেকথা তো আর কেউ বুঝবে না মিঃ ডালি। সারা দেশে একা আপনিই বুঝবেন। যে-শিল্প আজ দু'হাজার বছর হ'ল হারিয়ে গেছে, তাকে আমি খুঁজে এনেছি, আবিষ্কার করেছি। আপনি একজন বিখ্যাত প্রযোজক, কিন্তু গ্রীকদের নাট্যশালায় যে মহৎ শিল্প সৃষ্টি হোত, আপনার এখানে তা হয় না। আপনি এখানে সেই নৃত্যের আমদানী করতে পারেন নি। সে নৃত্য বিয়োগান্ত সুরে বাঁধা, ঐক্যতানে তার সৃষ্টি। আমি সেই নৃত্য ভাইনোসিয়াসের মন্দিরের ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। আমার এই নৃত্যে এযুগে বিপ্লব নিয়ে আসবে। কোথায় একে পেলাম? পেয়েছি গ্রীসের আত্মায় —পেয়েছি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তরঙ্গে, পেয়েছি সিয়েরা নেভাদার মর্মর-মুখর দেবদারু বনে। স্বপ্ন দেখেছি, তরুণ আমেরিকা নাচছে তারই ছন্দে, হুইটম্যান আমাদের সেরা কবি। সেই সেরা কবির কবিতার সঙ্গে তুলনীয় আমার এই নৃত্য। আমি তাঁরই মানসকন্যা! আমি তাঁরই মতো গাইব, বিদ্যুৎময় দেহের গান। কিন্তু সে গান রূপ পাবে নৃত্যে। আপনার থিয়েটারের আত্মা নেই, সে আত্মা আমি এনে দেব—প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করব।

ডালি বলে উঠলেন, ঢের হয়েছে, এবার থাম, থাম!

কিন্তু থামতে তো আমি চাইনা, তাই বলে চললাম,

আপনি তো জানেন, মিঃ ডালি, রঙ্গালয়ের জন্ম নৃত্য থেকে, আর তার প্রথম অভিনেতা ছিলেন একজন নর্তক। তিনি নাচতেন গাইতেন। তার থেকেই তো বিয়োগান্ত নাটক সৃষ্টি হ'ল।

আমি চুপ করলাম।

ডালি কি যেন ভাবছিলেন, এবার বললেন, দেখো আমার মূক অভিনয়ের পালায় একটা ছোট পার্ট আছে। যদি চাও তো পয়লা অক্টোবরে প্রথম মহলার দিন এসো। সেদিন তোমাকে পরীক্ষা করে নিয়ে নেব। এই পালাটা নিউইয়র্কে প্রথম দেখানো হবে। তোমার নামটা কি ?

ইসাডোরা, উত্তর দিলাম।

ইসাডোরা। মিষ্টি নাম। দেখ ইসাডোরা, এর মধ্যে আর দেখা হবে না। দেখা হবে সেই নিউইয়র্কে—পয়লা অক্টোবর।

খুশি হয়ে বেরিয়ে এলাম। ছুটে চললাম বাড়ি। মাকে এসে বললাম, মা, মা, অগাস্টিন ডালি আমাকে দলে নেবেন। পয়লা অক্টোবরে গিয়ে হাজির হতে হবে নিউইয়র্কে।

আনন্দের খবর শুনেও মা চুপ করে রইলেন।

গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, মা-মনি, তুমি খুশি হওনি ?

আমার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু ভাবছি, রেলের টিকিট খরচা কোথায় পাব ?

সেই তো সমস্যা। ভাবতে বসলাম মা আর মেয়ে। শেষে এক উপায় খেলে গেল মগজে।

স্যানফ্রান্সিসকোয় আমাদের এক বন্ধুর কাছে তার করলাম।

অগাস্টিন ডালির ওখানে কাজ পেয়েছি, পয়লা অক্টোবর পৌঁছতে হবে নিউইয়র্কে। ভাড়া পাঠাও একশো ডলার।

তার করলেই কি টাকা আসে। আর আমাদের বন্ধুরাও কেউ বড় মানুষ নন। তাই আশা-আশংকার দোলায় কাটতে লাগল দিন।

কিন্তু মাঝে মাঝে অবাক কাণ্ডও ঘটে যায়। আর তাই ঘটল। টাকা এল। টাকার সঙ্গে সঙ্গে ভাই-বোনেরাও এসে হাজির।

অমনি তোড়জোর পড়ে গেল। একদিন রওনাও হলাম

এবার মনে আশা দুনিয়া আমাকে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু যদি জানতাম, স্বীকৃতি পাওয়ার আগে বহু দুঃখ সইতে হবে। সে-দুঃখময় জীবন আছে সামনে। তাহলে হয়তো ভেঙেই পড়তাম। কিন্তু মানুষের বরাত ভাল, অমন দিব্যদৃষ্টি সে পায়নি।

ইভান মিরোস্‌কীর কাছ থেকেও বিদায় নিতে হল। মিরোস্‌কী আমার মহান প্রেমিক। একটা দিন কাটল তাঁকে বোঝাতে।

তিনি বললেন, আমাকে তুমি ভুলে যাবে না তো ইসাডোরা?

হাসলাম। বললাম, ভুলব! যুগ যুগ কেটে যাবে, পৃথিবী আমাদের ভুলে যাবে—তবু ভুলব না তোমাকে—ভুলব না আমাদের প্রেমকে!

ইভান তবু শান্ত হন না। অনেক করে তাঁকে শান্ত করলাম।

বললাম, নিউইয়র্কে যদি ভাগ্য ফেরে, আমরা তখুনি বিয়ে করে ফেলব।

বিবাহে আমার আস্থা নেই, কিন্তু মা বুঝি তাতে খুশি হবেন।

তাই জীবনের ছক থেকে বিয়েটা তখনো বাতিল করে দিইনি।

তখনো আমি স্বাধীন প্রেমের জয়ধ্বজা তুলে ধরিনি।

পাঁচ

নিউইয়র্ক !

মিনারময়ী নগরী। ডলার-দেবতার অধিষ্ঠান পুরী। ডলারকে কেউ হরিদ্রাভ শয়তান বলবেন, তবু ডলার-পুরীকে ভাল লাগল। সাগর থেকে উঠে এসেছে এই প্রাসাদময়ী পুরী। আর সেখানেই আছেন স্বাধীনতার দেবীর মূর্তি। স্বাধীনতা তিনি দিতে চান, তাঁর হাতের মশালে স্বাধীনতার অনির্বাণ আলো, কিন্তু এ-কার স্বাধীনতা, ক'জনের স্বাধীনতা ?

গণতন্ত্রের নামে এতো মালিকানার পূজা, সাম্যের নামে এতো অসাম্যের আরাধনা। তবু ভাল লাগল। ধনবাদের এই লীলাভূমিতে আমি সংগ্রাম করব আমার বিপ্লবী আদর্শের জন্য, আমি তাকে সার্থক করে তুলব। তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না ধনবাদ, দাবিয়ে রাখতে পারবে না ঐ উচ্চচূড় ধনবাদের কারখানাগুলি। আমার আত্মার ছন্দ দুলে দুলে উঠবে, সাইরেনের চিৎকারের মাঝে। ধোঁয়া আর ধূলো, তার ছন্দ রুদ্ধ করে দিতে পারবে না। কি করে পারবে—আমি যে বিদ্রোহিনী।

শিকাগো থেকে নিউইয়র্ককেই ভাল লাগল। আমরা উঠলাম ৬নং অ্যাভিনিউর এক বোর্ডিং হাউসে। সেখানেও হরেক রকমের মানুষ! শুধু এক জায়গায় তাদের মিল, কেউ তাদের খাই-খরচা চালাতে পারে না। উৎখাত হবার জন্য তারা যেন পা বাড়িয়ে রয়েছে। আমরাও ওদেরই স্বগোত্র, তাই ওদের সঙ্গ ভালই লাগল।

পয়লা অক্টোবর তারিখটা এসে গেল। ডালির থিয়েটারে গিয়ে হাজিরও হলাম। বিখ্যাত ডালির সঙ্গেও দেখা হ'ল।

তিনি তখন কাজে ব্যস্ত।

তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কে—? মুখ তুলে তাকালেন।

বললাম, আমি ইসাডোরা। আপনি আসতে বলেছিলেন।

কেন ?

আমাকে ভূমিকা দেবেন বলেছিলেন।

হাঁ, হাঁ, আবার অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবতে লাগলেন।

আবার নৃত্যের ওপরে বক্তৃতা শুরু করে দিলাম, তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন,

দেখ, জুন মেকে পাওয়া গেছে। মূক অভিনয়ের পালাটা জাঁকিয়েই তুলব। তুমি অভিনয় করতে পারলে নিশ্চয়ই পার্ট দেব।

পরীক্ষা হ'ল, পার্টও পেলাম।

কিন্তু মূক অভিনয় তো আমার কাছে শিল্পকলাই নয়। এতে তো নর্তকের ছন্দ নেই, নেই ভাব ব্যঞ্জনা, অভিনেতার উদাত্ত স্বরও এখানে নেই। দুয়ের মাঝখানে পড়ে মূক অভিনয় তো এক মেকী জিনিস। কিন্তু পার্ট নিতেই হ'ল। বাড়ি নিয়ে এলাম পার্টটি...আমার আদর্শ তো ক্ষুণ্ণ হ'ল।

প্রথম মহলার দিন এসে গেল। সেও এক মোহভঙ্গ। জুন মে ভারি রাগী মানুষ, যখন-তখন ফুঁসে ওঠেন, ফেটে পড়েন। আমাকে শিক্ষক বলে দিলেন, আমি জুন মের দিকে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব, তারপরে নিজের বুকে হাত রাখব—আর বুক চাপড়াতে থাকব। এই অভিনয়ে যে কথাটি ফুটে উঠবে, সেটি—তুমি আমাকে ভালবাস।

আমি তো কিছুতেই পারলাম না। আঙুল দিয়ে ঠিক করে দেখানো হয়না, নিজের বুকে হাত রাখা, বুক চাপড়ানো কিছুই হয় না। আবার সব হয় তো মুখ ভাবলেশহীন হয়ে থাকে। কি করে ভাব ফুটবে, এগুলো তো নিরর্থক বলেই মনে হচ্ছিল।

জুন মে রেগে গেলেন। তিনি ডালির দিকে তাকিয়ে বললেন,

এ-মেয়ের অভিনয়ের ছিটেফোঁটা ক্ষমতা নেই, একে পার্ট দিলে, নাটকটাই মাটি হবে।

শুনে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। তার মানে তো ঘোর বিপদ! ঐ বোর্ডিং হাউসে সারা পরিবারকে বাড়িউলীর দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। সে তার খুশি হলে রাখবে, নয়তো তাড়িয়ে দেবে। গতকালের একটা ছবি ভেসে উঠল চোখে। গাদায়-গায় মেয়েটি, ভাড়া দিতে পারেনি, তাই বাড়িউলী বার করে দিলে। তাঁর একমাত্র সম্বল ট্রাঙ্কটি রেখে সে বেরিয়ে গেল। সবাই আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। আবার কেউ দেখলাম, তাকিয়েও দেখলে না। এসব ওদের জীবনে রোজকার ব্যাপার—তাই বুঝি উদাসীন হয়েই রইল। মনে পড়ল মার কথা। শিকাগোতে এ জীবন আমরাও কাটিয়েছি, এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়ি—এক পাড়া থেকে আর-এক পাড়া। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল।

কে যেন বলেছিল, চোখ দিয়ে জল ঝরলে আমাকে আরো সুন্দর দেখায়, আমার প্রাণ-চঞ্চলতা যেন ঝিমিয়ে আসে, এক বিষাদ যেন ঘনিয়ে ওঠে! মনে হয়, আমি যেন মূর্তিমতী দুঃখ। এ-রূপ আমার ভাল লাগে না—কিন্তু রূপ তবু তো এসে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়। আর এ-রূপ দেখে মানুষের মন করুণা-ঘন হয়ে ওঠে। ডালিরও উঠল। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে জুন মেকে বললেন,

কাঁদলে কিন্তু মেয়েটিকে ভারি সুন্দর দেখায়! মুখখানায় এমন এক দুঃখ ফুটে ওঠে, যা মস্ত বড় অভিনেত্রীরাও হিংসে করবেন। ও তো ছেলেমানুষ, ঠিক শিখে নেবে দেখো!

চাকরী বজায় রইল। নিউইয়র্ক আমাকে পথে নামিয়ে দিলে না—তাড়িয়েও দিলে না।

মহলা চলতে লাগল।

কিন্তু সে কি দুঃসহ পরীক্ষা!—নিজেকে শহীদ বলেই মনে হতে লাগল।

পরিচালক বলেন—ঠিক মেপে মেপে চার পা এগিয়ে এস, এমনি করে এবার তোল তোমার তর্জনী, একটু হেলিয়ে দাও। মুখ দিয়ে অনেকখানি হাওয়া নিয়ে ছেড়ে দাও; তাহলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা হবে।

কলের পুতুলের মতো করে যাই, কিন্তু মন তো মানে না। সারা দেহ চঞ্চল হয়ে ওঠে, অবাধ, মুক্ত ছন্দ দুলে দুলে ওঠে। কিন্তু তাকে পিষে মারতে হয়, পুতুল নাচ নাচতে হয়। তবু ক'দিন পরে মূক অভিনয়ের ভিতরে ব্যঙ্গ প্রহসনের যে অনাবিল হাসি আছে সেটা আবিষ্কার করে ফেললাম।

সেটা কি বলি।

কলের পুতুল দম দিলে হাত তোলে, মাথা নাড়ে, চোখ টিপটিপ করে, আর ছেলেমেয়েরা হাসে, হেসে লুটোপটি খায়। আমারও তাই হ'ল। আরসীতে নিজের ভঙ্গী দেখে হাসি পেত। তাই আর খারাপ লাগল না।

জুন মে অভিনয় করছিলেন পিরোর ভূমিকায়। একটা দৃশ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রেমের অভিনয়। আমি বাজনার তালে তালে এগিয়ে গিয়ে তাঁর গালে তিনবার চুমু খাব। পোষাক-মহলার দিন আমি তাঁর গালে এমন চুমু খেলাম যে, দাগ পড়ে গেল। পিরো তখন জুন মের মূর্তি ধরে আমার কানের উপর দুই থাপ্পড়। থিয়েটার জীবন এমনি করেই শুরু হ'ল।

কিন্তু জুন মেকে ভাল লাগল। কি তাঁর লাস্য—কি তাঁর অভিব্যক্তি! তিনি যদি মূক অভিনয়ের এই মিথ্যা রীতিতে বাঁধা না পড়তেন, তাহলে তাঁকে আমরা

বিখ্যাত নর্তকী হিসেবেই পেতাম। কিন্তু মিথ্যা আঙ্গিকের মোহে একজন শিল্পী নিজেকে ধ্বংস করে ফেললেন। এই তো তাঁর ট্রাজেডী,—শিল্পীর ট্রাজেডী।

মূক অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমার অনুভূতি তীব্র, আমি চীৎকার করে উঠতে চাইতাম,

যদি কথাই বলতে চাও, বলছ না কেন? কেন এই কালা-বোবার মতো ব্যর্থ অঙ্গভঙ্গী?

কিন্তু বলা হ'ত না।

প্রথম রজনী এদিকে এসে গেল।

নীল রেশমের পোষাক পরলাম, মাথায় লাল পরচুল, তার উপরে মস্ত টুপী। আমি এসেছি ডুনিয়ায় বিপ্লব সৃষ্টি করতে, সেই আমি আজ ছদ্মবেশে মূক অভিনয় করছি! মা প্রথম সারে বসেছিলেন, তিনিও হতাশ হলেন। নিউইয়র্কে ছুটে এলাম, কিন্তু একি হ'ল? এরই জন্য কি সয়ে চলেছি তুঃখ। এরই জন্যই কি আধপেটা খেয়ে, কোনোদিন না খেয়ে কাটাচ্ছি? এই কি আমার শিল্প-সাধনার ফল?

সত্যি—দশা তখন চরমে! ডালির ওখানে মহলার সময়ে মাইনে পাইনি। প্রথম সপ্তাহ গেল, তখনো মাইনে ঠিক হ'ল না। তারপরে দল বাইরে চলল। এবার হপ্তায় পনেরো ডলার মাইনে জুটল। মা আর ভাইবোনেরা রইলেন নিউইয়র্কে—তাঁদের অর্ধেক মাইনে পাঠিয়ে দিই, বাকী অর্ধেকে নিজের খরচ চালাই।

সে-একদিন বটে!

স্টেশনে নামে দলবল। হোটেলে ওঠার পয়সা নেই, পুঁটলিটি নিয়ে সস্তা বোর্ডিঙের খোঁজে রওনা হই। থাকা-খাওয়া নিয়ে পঞ্চাশ সেণ্টের বেশি দেওয়ার উপায় নেই। তাই সময়ে সময়ে সস্তা বোর্ডিঙের খোঁজে মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াতে হয়।

একবারের কথা বলি।

এক বোর্ডিং মিললো। বাড়িউলীর কাছে চাবি চাইলাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, গিয়েই শুয়ে পড়ব।

বাড়িউলী বললে, চাবিটা হারিয়ে গেছে।

বললাম, তাহলে অন্য একটা কামরা দাও।

কামরা আর নেই।

কি আর করি, এত রাতে আর সস্তা বোর্ডিঙের খোঁজে বেরুবার মতো শক্তি ছিল না। তাই চাবি ছাড়াই কামরায় এসে ঢুকলাম।

একটু চোখ বুজেছি, অমনি এক কাণ্ড!

একটা লোক টলতে টলতে এসে দাঁড়াল ঘরের ভিতরে!

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দিলাম, চীৎকার করে উঠলাম।

বেরোও, বেরোও বলছি, পুলিশ ডাকব!

চিৎকার শুনে আরো লোক এসে জুটলো। সবাই মাতাল।

একজন বললে, চলে আয়, কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস? আর একজন বললে, বাঃ দিব্যি চেহারা, খাসা মেয়ে! তা কি হয়েছে বাছা, তোমার অমন রূপ দেখতে যদি এসেই থাকে।

বাড়িউলী ওদের অনেক বুঝিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু খোলা দরজা রেখে আর শুতে সাহস হ'ল না। একটা পোষাক রাখার আলমারী ছিল। সেইটে টেনে এনে দরজার গড় দিলাম। আমার প্রতিরোধ-প্রাকার উঠল। কিন্তু তবু তার শক্তির উপরে বিশ্বাস নেই। সারা রাতটা বসে কাটালাম।

এই তো ভ্রাম্যমান থিয়েটারি দলের কম মাইনের মেয়েদের দশা!

জুন মের ক্লান্তি নেই। রোজ মহলা দেবে, আর খুঁত ধরবে।

আমার দিন কাটে মহলা দিয়ে, বই পড়ে। আমার মিরোস্কীকে লিখি দীর্ঘ চিঠি। তাঁকে কত মিছে কথা বলি, মনের রঙে রাঙিয়ে দিই চিঠি। কখনো দুঃখের প্রকাশ সেখানে দেখা দেয় না। প্রেমিক ভাবেন, আমি সুখে আছি, ভাল আছি।

তিনমাস ভবঘুরের মতো ঘুরে ঘুরে দল ফিরে এল নিউইয়র্কে, ডালি খতিয়ে দেখলেন, আর্থিক ক্ষতি প্রচণ্ড। ব্যর্থ হ'ল অভিযান। জুন মে পারী থেকে এসেছিলেন, পারীতেই ফিরে গেলেন।

ফিরে তো এলাম, কিন্তু প্রাসাদপুরীতে কি করে জুটবে আশ্রয়, খাদ্য—নিরাপত্তা কোথায় সারা পরিবারের?

ডালির অফিসে আবার ধর্ণা দিলাম।

আমার আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা জুড়ে দেব, এমন সময় ডালি আমাকে থামিয়ে দিলেন:

থাম তো বাপু! চাকরী চাও, দিতে পারি। শেইক্‌স্‌পীয়ারের ‘মিড সামার নাইটস্‌ ড্রিম’ নিয়ে কোম্পানী বাইরে যাচ্ছে। সেখানে এক পরীদের দৃশ্যে তুমি নাচতে পার।

বললাম, আমার অনুভূতির প্রকাশ আমি চাই, পরীদের দৃশ্যে নাচতে চাইনে। মানুষের আবেগ ফুটিয়ে তোলাই আমার কাজ।

ডালি শুষ্ক স্বরে বললেন, তোমার আদর্শ নিয়ে উপোস করতে চাও কর! এর বেশি কিছু আমাকে দিয়ে হবে না।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, আদর্শকে জিইয়ে রাখতে হলে দেহকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মিঃ ডালি, আমি একাজ নেব।

কাজ নিলাম। নিদাঘ নিশার স্বপ্ন আমাকে ঘিরে ধরল। এ স্বপ্ন তো অলীক কিন্তু অলীক স্বপ্ন চান প্রযোজক—চান দর্শক। মানুষের অনুভূতিকে তাঁরা বাতিল করে দেন। ভাবেন, এই বুঝি সত্যিকারের আর্ট। মহাকবির উপর কটাক্ষপাত করছিনে, কিন্তু অলীক স্বপ্ন হয়তো ষোড়শ শতাব্দীর রাজদরবারে প্রয়োজন ছিল, এখন তার প্রয়োজন কোথায়?

তাও তাইতানিয়া নয়, পাক্‌ নয়, সামান্যা পরী।

প্রথম রজনী এসে গেল।

লম্বা সাদা গাউন পরলাম, তার উপরে সোনালি পাড়-বসানো। আবার দুখানা রাংতার পাখা। ঐ পাখা পরতে আমার ঘোর আপত্তি। সোজা ডালির খাস কামরায় গিয়ে বললাম, ঐ রাংতার পাখার দরকার নেই। আমি যে পরী, আমার যে পাখা আছে, সেকথা আমি ওদের বুঝিয়ে দেব আমার অভিব্যক্তিতে।

কিন্তু ডালি একগুঁয়ে, বললেন, পাখা চাই! হয় পাখা পর, নয়তো পোষাক খুলে রেখে বেরিয়ে যাও!

কি আর করব, রাংতার পাখা পরেই মঞ্চে এসে দাঁড়ালাম।

বিরাট মঞ্চ, অগণন দর্শক। মন নেচে উঠল। এতদিনে সুযোগ এসেছে, এবার আমি নাচব। হোক, এ নিদাঘ নিশীথের অলীক স্বপ্ন, আমি এই নিশীথ স্বপ্নের মায়ার ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলব অরণ্যকে। তার হাওয়ার গান, তার সবুজ পাতা, কুঁড়ি—সব কিছু ফুটে উঠবে আমার নাচে।

নাচলাম, নাচে বিভোর হয়ে গেলাম। দর্শকের করতালি, হর্ষধ্বনি। ভাবলাম, ডালি এবার খুশি হবেন। মঞ্চ থেকে নাচতে নাচতে চলে এলাম

উইংগ্‌স্-এর আড়ালে। দেখি, ডালি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অভিনন্দন জানালেন না। বরং খেঁকিয়েই উঠলেন,

তোমার বোঝা উচিত ছিল, এটা নাচের আসর নয়।

বললাম, কিন্তু দর্শকরা তো নিয়েছে।

দর্শকদের কথা ছেড়ে দাও! ডালির মুখে ভ্রূকুটি।

আর কিছু বললাম না।

পরদিন মঞ্চে যখন উঠে এলাম, দেখি অন্ধকার।

বুঝলাম, ডালি নাচ চান না, শিল্প চান না, চান অলীক মায়া সৃষ্টি করতে। তাই আজ আঁধার করে দিয়েছেন মঞ্চ।

চোখ ছল ছল করে উঠল, কিন্তু তবু নাচতে হ'ল। দর্শক দেখলে, শুধু সাদা একটা কি যেন নেচে চলেছে, মাঝে মাঝে তার পাখা ঝিলিক মেরে উঠছে আঁধারে।

অলীক মায়া এমনি করেই সৃষ্টি হ'ল।

এক বছর এমনি করেই কেটে গেল!

আমি তখন নিষ্ফলের দলে। আমার স্বপ্ন আর আদর্শ রইল মনে, বাইরে অলীক নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন। কি আর করি, বই নিয়েই দিন কাটিতে লাগল।

বন্ধু নেই, আমোদ-প্রমোদ নেই, যখন সময় পাই, বই পড়ি। মনে মনে ভাবি, নিজের মতো একটা জগত খাড়া করে নেব, আর সেখানেই বাস করব। মানুষ একেই বলে হাতীর দাঁতের মিনার। কল্পনার জগত।

তবু বন্ধু জুটল।

তাইতানিয়ার পার্ট করে যে মেয়েটি, সে-ই ভাব করতে এগিয়ে এল। অদ্ভুত মেয়ে, পরীর রাণীই বটে! কল্পলোকে থাকে। শুধু কমলা নেবু ছাড়া কিছু মুখে দেয়না।

বললে উত্তর দেয়, ভাল লাগে না!

চোখ দুটিও বড় উদাস। এমন মেয়েকে ভাল না বেসে পারা যায় না?

কিন্তু প্রাণশক্তি যে ও ক্ষয় করে ফেলছে! ওকে সেকথা কত বলেছি। কিন্তু ও শোনে না। বলে,

যাক্ না ক্ষয় হয়ে, তাহলে তো চলে যাব ঐ তারার দেশে। ওখানে ছায়াপথে নেচে নেচে বেড়াব।

কয়েক বছর পরে একদিন পেলাম ওর মৃত্যু সংবাদ, সেদিন মনে হয়েছিল, স্বপ্নের দেশের মেয়ে স্বপ্নের দেশে চলে গেছে।

যাহোক ডালির দলেই রয়ে গেলাম। ঘুরতে ঘুরতে এলাম একদিন শিকাগো শহরে।

শিকাগো আমার শহর। এখানকার পথেঘাটে আছে কত স্মৃতি। আর আছে আমার প্রথম প্রেম, আমার মিরোস্‌কী।

মিরোস্‌কী খবর পেয়েই ছুটে এলেন।

যেদিন মহলা না থাকে, শহরের বাইরে বাগানে-বাগানে ঘুরে বেড়াই।

মিরোস্‌কী বলেন, তাঁর পোল্যাণ্ডের কথা। বিভোর হয়ে শুনি। তারপর হাত চেপে ধরেন।

যাবে, তুমি পোল্যাণ্ডে যাবে ইসাডোরা?

যাব, কিন্তু কেন যাব?

তুমি যে পোল্যাণ্ডের আত্মা। তুমি যে শুপাঁর মূর্তিমতী সুর। যখন তাঁর 'নিশার গান' কেউ বাজায়, তোমাকে আমি যেন তার মধ্যে খুঁজে পাই।

ভাল লাগে, তবু বলি, এ তোমার কবি-কল্পনা মিরোস্‌কী।

না, না, সত্যি; সত্যি!

শিকাগো ছাড়ার দিন ঘনিয়ে এল।

মিরোস্‌কী সেদিন এলেন, এসে বললেন,

ইসাডোরা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই?

বিয়ের প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম,

ওকথা ভাবিনি তো মিরোস্‌কী!

আমি ভেবেছি।

কিন্তু সেখানে যে বাধা আছে। বিবাহ মানেই চরম দুর্দশা। আমি দেখেছি, আমার মার জীবন! না, বিয়ে আমি করব না!

আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন মিরোস্‌কী, তারপর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন।

কি জানি, কেন রাজী হয়ে গেলাম। কথা রইল, নিউইয়র্কে শীগ্‌গীরই আমাদের বিয়ে হবে।

নিউইয়র্কে দল ফিরে এল। মাকে এসে সব কথা বললাম, মার অমত নেই। ভাই কিন্তু বললে, খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা উচিত লোকটা কেমন, হুট্ করে বিয়ে করা উচিত নয়।

ভাই খোঁজ-খবর নিতে লাগল।

এদিকে মিরোস্কীর চিঠি আসছে ঘনঘন, প্রেমে আমরা নীড়বাঁধার স্বপ্ন দেখছি।

এমন সময় একদিন খবর নিয়ে এল ভাই, মিরোস্কী বিবাহিত, লণ্ডনে তার স্ত্রী আছে।

মা বললেন, দেখ্ তো, কি সর্বনাশ করতে বসেছিলি!

আমি চুপ করে রইলাম।

এ যেন নীল আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল মাথায়।

তবু সয়ে গেলাম।

আমার প্রথম প্রেমের এমনি করেই যবনিকা পড়ল।

ছয়

নিউইয়র্কের বাসিন্দে আমরা এখন। একটা স্টুডিয়ো ভাড়া নিয়েছি। আসবাবপত্র কিছু নেই। ফাঁকা মেঝে, সেখানে নাচের আসর বসে। রাত হলে সেখানে স্প্রিঙের ক'টা গদী পেতে শুয়ে পড়ি। সেগুলি থাকে পর্দার আড়ালে। এলিজাবেথের ইস্কুল বসে এখানে। অগাস্টিন এক থিয়েটারের দলে কাজ পেয়েছে। ওকে বাড়ীতে খুব কম পাওয়া যায়। শুধু দলের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। রেমণ্ড খবরের কাগজে ঢুকেছে। কিন্তু তবু খরচ চালানো মুশকিল। তাই মাঝে মাঝে স্টুডিও ভাড়া দিতে হয় কোন গান-বাজনার মাস্টারকে—নয় তো কোন নীতিকথার প্রচারককে। তখন আমরা সবাই বেরিয়ে যাই। তুষার পড়লেও উপায় নেই। তারপর সময়মত ফিরে এসে দরজায় কান পেতে থাকি। শেষ হলে তবে ঢুকতে পাই। এমনি করেই কাটে আমাদের জীবন।

ডালি এদিকে গান বাজনার এক পালা খুলেছেন। আমি তাঁর মাইনে করা চাকর, আমাকেও গান গাইতে হ'ল। অথচ জীবনে কখনো এক কলি সুর ভাঁজিনি। আর তিনজন মেয়ে আমার সঙ্গী। তারা খালি বলে, তোমার জন্যে আমরাও বেসুরো হয়ে পড়ছি, তুমি তার চেয়ে চুপ করে মুখ নাড়ো। সবাই ভাববে তুমিও গাইছ।

তাই-ই করলাম। আমি চুপ করে ঠোঁট নাড়ি, আর ওরা চেঁচায়। আমার মুখে মৃদু হাসি। আর ওদের কি মুখ বিকৃতি!

কিন্তু ভাল লাগে না। খালি কান্না পায়। একদিন একটি বক্সের ভিতরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছি, ডালি আমাকে দেখতে পেলেন। কাছে এসে মাথায় হাত রেখে আদর করে শুধালেন,

কি হ'ল তোমার?

উত্তর দিলাম, আমি আর সইতে পারিনে! গান তো আমি গাইতে পারিনে, এখানে থেকে আমি কি করব!

ডালি বললেন, কিন্তু পালাটা পয়সা দিচ্ছে। সেকথা ভাবতে হবে বইকি।

আমি আবার বললাম, তাহলে আমার এই প্রতিভা কি এমনি করেই নষ্ট হয়ে যাবে? আমাকে কি আপনি কোনো সুযোগই দেবেন না!

ডালি আমার পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

সত্যিই,—অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম ডালির থিয়েটারে। তোতাপাখীর মতো একই বুলি আউড়ে যাই রাতের পর রাত ধরে। একই ভাব-ভঙ্গী করি। কোথাও নেই স্বাধীনতা। তাই একদিন আর সহ্য হল না। কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম।

স্টুডিয়ো দিনের বেলায় ভাড়া দিয়েই চলতে লাগল। নিজেরা বিশ্রামের ঠাঁই পাইনে। দিনে এখানে-সেখানে কাজের জন্য ঘুরে বেড়াই—রাতে মা বসেন পিয়ানোয়, মেয়ে নাচে। রাত এমনি করে কেটে যায়।

এথেলবার্ট নেভিন তখন সুরকার হিসেবে বেশ নাম কিনেছেন। তাঁর ওফেলিয়া, জলদেবী আর নার্সিস্‌াস তো বাজার মাত্‌ করে দিয়েছে। আমি সেই সুরগুলি দিয়ে আমার নৃত্য-পরিকল্পনা করলাম। দু'একটা নাচও এখানে-সেখানে দেখলাম। তাতে নামও হ'ল।

একদিন স্টুডিয়োতে নাচের মহলা দিচ্ছি, এমন সময় এক যুবক এসে হাজির। চুল তাঁর এলোমেলো, চোখ দুটো বড় বড়। আর সেই চোখে কি উজ্জ্বলতা! যুবকটি এসেই বললেন,

শুনলাম, তুমি নাকি আমার সুর নিয়ে নাচের পরিকল্পনা করেছ? আমি বারণ করছি, বারণ করছি! তুমি জান না, এ নাচের সুর নয়। নাচের সঙ্গে এ সুর আমি কাউকে বাজাতে দেব না!

আবেগে রক্তিম হয়ে উঠল তাঁর মুখ, কাসির দমক এল। রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকলেন।

বুঝলাম, ইনিই নেভিন! তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম একখানা চেয়ারে। বললাম,

আপনার সুরের তালে তালে আমি নাচছি, আপনি দেখুন! আপনার যদি ভাল না লাগে, আমি হলফ করে বলছি, আর নাচব না!

তিনি আশ্বস্ত হয়ে বসলেন, আমি নাচলাম নার্সিসাস্‌-এর নাচ। গ্রীক উপকথার সেই সুন্দর নার্সিসাস্‌, সে নদীর বুকে নিজের ছায়া দেখে ভালবেসেছিল। সেই ছায়ার বিরহে সে শুকিয়ে গেল তিলে তিলে। একদিন সে হ'ল নার্সিসাস ফুল। নিজেকে নিজের ভালবাসা—আত্মরতির এ-কাহিনী। সুরকার তাকে সুরে জীবন্ত করে তুলেছেন। আর আমি তাকে আরো জীবন্ত করে তুললাম নৃত্যে।

সুর স্তব্ধ হ'ল, নৃত্য থেমে গেল। নেভিন লাফিয়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখে জল।

বলে উঠলেন, তুমি দেবী। তোমার ঐ ছন্দ আমি চিনি, ঐ সুর যখন আমার মনে গুনগুনিয়ে উঠেছিল, আমি স্বপ্নে একদিন তোমাকে দেখেছিলাম। তোমার ঐ ছন্দ আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ইসাডোরা, এ সুর তো আমার নয়, তোমার—তোমার! নাচ, নাচ—ইসাডোরা—নাচ থামালে কেন?

এবার নাচলাম—জলবালাদের নৃত্য। ঢেউ উঠেছে নীল সাগরে। তারা যেন লক্ষ লক্ষ সাপ—ফণা মেলে দিয়েছে। আর সেই ফণার শীর্ষে শীর্ষে নাচছে জলবালারা। হেলেদুলে পড়ছে, ছলছল কলকল করে উঠছে—আবার রোষে-ক্ষোভে ফুলে উঠছে। তারপর ঢেউ স্তব্ধ হয়ে গেল। জলবালারা এবার ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল। মিলিয়ে গেল।

নেভিন হাততালি দিলেন। তারপরে নিজে এসে বসলেন পিয়ানোয়।

স্টুডিয়োর বাইরে নিউইয়র্ক। রাতের হাজার আলোর মালা তার বুকে দোলে। সেদিকে চেয়ে রইলেন সুরকার। দৃষ্টি বুঝি নিউইয়র্ক পেরিয়ে চলে গেল কোন্ সুদূরে। সেখানে নেই প্রাসাদের উত্তুঙ্গ চূড়া, নেই কলকোলাহল। শুধু প্রান্তর বিছিয়ে আছে। সে প্রান্তরে নেই তুষারের দাগ। সবুজে সবুজে ঝলমল। সেখানে দুলে উঠছে লতায়-পাতায় ফুলে বসন্তের সুর। পিয়ানোর ঘাটে ঘাটে ঝরে পড়তে লাগল সেই সুর।

গাছপালায় জাগছে আহ্বান, জাগছে আকাশে—মানুষের মনেও কি তুষার অন্তে বসন্তের আবির্ভাব হবে না? হবে হবে। তাইত তরুণ-তরুণী বিহ্বল। চোখের আলোতে তো দেখি বসন্তের সাড়া, দেখিতো লীলায়িত বাহুর সঞ্চালনে, দেখিতো কটাক্ষে।

সুর স্তব্ধ হল, বসন্ত বাতাস যেন ঘুরে ঘুরে মরছিল ঘরে—এবার নিথর হয়ে গেছে। মূর্ছাহত হয়নি, এখনো স্পন্দিত হচ্ছে।

নেভিন উঠে এসে আমার হাত দু'টি আবেগে জড়িয়ে ধরে বললেন, এখন থেকে আমি সুর দেব, তুমি নাচবে। আমরা দুজনে দুনিয়া জয় করব।

দুনিয়া জয় করতে বেরুলাম আমরা। নিউইয়র্ক আমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু একদিন নেভিন চলে গেলেন। কঠোর জীবন-সংগ্রামে তিনি ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন ঝরেও পড়লেন অকালে। নার্সিসাস্ ফুল অকালে ঝরে পড়ল। বসন্ত স্তব্ধ, জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা, জীবন-হত। আর সুর বেজে উঠল না।

রোজ যেমন সন্ধ্যায় আসতেন, সেদিনও তেমনি এলেন।

বসলেন পিয়ানোয়। সুরু হ'ল সুরের ইন্দ্রজাল বোনা।

তারপর এক সময়ে লুটিয়ে পড়লেন নেভিন—পিয়ানোর উপর। কাছে গিয়ে দেখি পিয়ানোর ঘাটগুলো ভিজে গেছে রক্তে।

একটু সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন নেভিন, হেসে বললেন, এ আমার মৃত্যুর পরোয়ানা! তারপর টলতে-টলতে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন পেলাম তাঁর মৃত্যু সংবাদ।

যিনি আমেরিকার শুপাঁ হতে পারতেন, যিনি সুরে তার ধনবাদী নিগড় ঘুচিয়ে মুক্তির সাড়া জাগাতে পারতেন, শেষ পর্যন্ত ধনবাদের পায়ে, অসাম্যের যুপকাষ্ঠেই তাঁকে বলি দিলে আমেরিকা। ডলারের দেশ আমেরিকা তাঁকে তিলে তিলে উপোস করিয়ে হত্যা করলে। আহুতি পড়ল নেভিন। এমনি কত আহুতিই না প্রতিদিন পড়ছে।

নেভিন চলে গেলেন, কিন্তু তাঁরই জন্যে অভিজাত সমাজে পরিচিত হ'লাম। বিলাসিনীদের ড্রয়িং রুমে রুমে বসল নাচের আসর। ওমরখৈয়াম তখন আভিজাতদের মধ্যেও সাড়া এনে দিয়েছে। তাঁরা একে উচ্ছৃঙ্খল আদর্শ বলে ধরে নিয়ে খুব মাতামাতি করছেন। মুখে মুখে শুনি সুরা আর সাকীর কথা। তাই আমিও ওমরের রুবাই নিয়ে এক নৃত্য রচনা করলাম।

আভিজাত আসরে নাম হ'ল, কিন্তু ওঁরা কেউ আমার আদর্শ বুঝতে পারলেন না। ওঁরা শিল্প-রসিক বলে বড়াই করেন, কিন্তু শিল্প-বুদ্ধি ওঁদের বিন্দুমাত্র নেই। তাই ভাল লাগল না। অভিজাতদের মহল থেকে এখন বিদায় নিতে পারলে বাঁচি!

এমন সময় বাইরে গিয়ে এক অগ্নিকাণ্ডের ভিতরে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালাম।

সাত

আবার নিউইয়র্ক। মন টেকে না। চারিদিকে অভাব আর অভাব।

তার উপরে আছে অভিজাতদের প্রতি ঘৃণা। নিউইয়র্ক যেন বিষময় হয়ে উঠল। মন উধাও হতে চায়?

কোথায়?

লণ্ডনে!

লণ্ডন!

সে তো আমার স্বপ্ন। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে টেমস, ডাকে কুয়াশা! আমি চলে যাই সাগর পাড়ি দিয়ে। তার জনতায় মিশে যাই। জর্জ মেরিডিথ আমাকে শোনান তাঁর উপন্যাস, সুইনবার্ণ কবিতার ভাণ্ডার খুলে দেন। আবার হুইস্‌লার দেখান তাঁর জলরঙা ছবি।....তাই লণ্ডনের এত জাদু, এত মায়া!

হয়তো, আমার আদর্শ বুঝবে লণ্ডন।

নিউইয়র্ক তো তাকে অবহেলা করলে, পায়ে থেঁতলে দিলে।

চল, চল লণ্ডন!

পরিবারে এখন আমরা চারটি প্রাণী। অগাস্টিন চলে গেছে। অগাস্টিন নাটুকে দলে সাজে রোমিয়ো। যে মেয়েটি জুলিয়েৎ সাজে, সে তাকে ভালবেসেছে। একদিন এসে সে বললে, আমি আমার জুলিয়েৎকে বিয়ে করেছি।

মা রেগে উঠলেন, বললেন, না!

আমি তো অবাক, বললাম, কেন?

এ পরিবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! এই বলে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এলিজাবেথ চুপচাপ।

রেমণ্ড তো ওকে পাগলের মতো যা-তা বললে।

শুধু আমি অগাস্টিনকে বললাম, বিয়ে করেছো, বেশ করেছ! চল, তোমার বৌ দেখে আসি।

সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। আমাকে নিয়ে চলল।

এক গলির ভিতরে অন্ধকার বাড়ি। সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে পাঁচতলায় উঠে এলাম। জুলিয়েতের সঙ্গে দেখাও হ'ল।

বড় সুন্দর মেয়েটি, কিন্তু বিছানায় শুয়ে ধুঁকছে।

ওর কাছে গিয়ে বসলাম; শুধালাম, কি হয়েছে তোমার?

ও মৃদু হাসল, তারপর বললে, আমার সন্তান হবে।

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলাম।

আমাদের লণ্ডন-যাত্রার পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ল অগাস্টিন।

মা বললেন, ও মরুক।

রেমণ্ড বললে, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন থেকে ওকে বাদ দিয়ে দিলাম।

আর এলিজাবেথ? সে নীরব হয়েই রইল।

কিন্তু টাকা নেই হাতে। লণ্ডন আমাদের স্বর্ণভূমি—কিন্তু সেখানে পৌঁছতে হলে চাই টাকা! সে-টাকা কোথায় পাই?

শেষে মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল। অভিজাত বিলাসিনী, যাঁরা আমার নাচের শত মুখে প্রশংসা করেন, তাঁদের রুধির কিছু শোষণ করে নিলে কেমন হয়?

বেছে বেছে সেন্ট্রাল পার্কের এক ধনবতী মহিলার কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম আমাদের বিপর্যয়ের কথা।

তিনি আমার কথা শুনে বললেন, কি করবে ঠিক করেছ?

এখানে আর নয়। যাব লণ্ডনে। সেখানে আমাকে লোকে বুঝবে।

তিনি নিঃশব্দে টানা থেকে বার করলেন চেক-বই। তারপর চেক লিখে ভাঁজ করে আমার হাতে দিলেন।

মন আনন্দে নেচে উঠল, তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

পথে এসে ভাঁজ খুলে দেখি—মোটে পঞ্চাশ ডলারের চেক।

যাহোক, আর এক ধনবতী-মৃগয়ায় বেরুলাম।

ইনি বসিয়ে উপদেশ দিয়ে বললেন, লণ্ডনে গিয়ে কোন ফল হবে না।

তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলাম, তর্ক করতে করতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

মহিলা ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি খাসনামা এসে কিছু খাবার দিয়ে গেল।

খাবার খেয়ে সুস্থ হয়ে বললাম, আমি নাম করবই! সেদিন লোকে বলবে আপনি আমার প্রতিভার প্রথম সমঝদার।

কিন্তু ধনবতী মহিলা তাঁর সঞ্চিত কোটি কোটি টাকা থেকে শুধু পঞ্চাশটি ডলার দিলেন। তাও চেকখানা হাতে দিয়ে বললেন,

টাকাকড়ি হলেই আমার টাকা ফেরত দেবে।

আমি টাকা ফেরত দিইনি। গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিয়েছি সে টাকা।

এমনি করে ধনবতী মহিলা-শিকার করে করে তিনশো ডলার জমে গেল।

এই টাকা নিয়েই আমাদের রওনা হতে হবে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব? জাহাজের ভাড়াও তো কুলানো শক্ত। আর যদি বা কুলোয়, লণ্ডনে পৌঁছে হাতে একটা পয়সাও থাকবে না।

রেমণ্ডের মগজটা বড় সাফ। সে যাত্রীবাহী জাহাজ বাদ দিয়ে অন্য জাহাজের খোঁজে রইল। জাহাজ পাওয়াও গেল। গোরু-মোষ বোঝাই ছোট্ট জাহাজখানি, ক্যাপ্টেনের দয়ায় সেখানে ঠাঁইও পেলাম।

আজ যখন বড় বড় যাত্রীবাহী জাহাজের পয়লা ক্লাসে যাই, তখন সেদিনের কথা মনে পড়ে।

জাহাজ তো নয়, এক পিঁজরাপোল।

মধ্য প্রাচ্যের-প্রান্তরে চরে বেড়ায় পশুর দল, তাদের নিয়ে চলেছে লণ্ডনের কষাইখানায়। তারা দিনরাত একে-ওকে গুঁতোচ্ছে, নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। তাদের চীৎকার, গোঙানি, গায়ের গন্ধ সব মিলে এক পিঁজরা-পোলের আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠছে।

আমরা এখানেই আছি, নোনা মাংস আর চা খেয়ে কাটাচ্ছি ছোট্ট কেবিনটিতে দিনগুলি। তবু সুখী, খুশী।

জীবজন্তুর সঙ্গে যেতে হচ্ছে বলে, নামও ভাঁড়িয়েছি। আমাদের ডানকান নাম ঘুচে গেছে, আমরা এখন ও'গরমান। আমার নাম ইসাডোরা নয়, ম্যাগি।

জাহাজের পয়লা মেট ছেলেটি আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ। তার সঙ্গে ভাব জমে গেল।

চাঁদের আলোয় ওর সঙ্গে ডেকের উপর ঘুরে বেড়াই। কত কথা হয়।

নামটা তার মনে নেই। সে বন্ধুত্বের গণ্ডি ডিঙিয়ে গেল। একদিন বলে বসল, ম্যাগি, আমাকে বে করবে? স্বামী হিসেবে আমি ভালই হব।

ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিলাম। বললাম, তোমাকে স্বামী বলে ভাবতে পারছিনে। তুমি আমার জাহাজী বন্ধু—তার বেশি কিছু চেয়ো না।

ছেলেটি ক্ষুব্ধ হ'ল, কিন্তু বন্ধুত্বের বন্ধনটুকু ছিঁড়ে ফেললে না।

মে মাসের এক ভোরে ও'গরমানরা এসে পৌছলেন লণ্ডনে। কাগজে-কাগজে শিরোনামায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ল না। তবু তাঁদের কাছে দিনটি এল মহান অধ্যায়ের ভূমিকা রূপে। ঘর মিলল। প্রথম দিনটা কাটল বাসে বাসে, ঘুরে ঘুরে, তারপরে দর্শনীয় যা কিছু একে একে দেখে নিলাম। দু-এক সপ্তাহ ভালই কাটল।

একদিন বাড়িউলী যখন ভাড়ার তাগিদ দিতে এল, তখন দেখি ক'দিনেই আমাদের সঞ্চয় ফুরিয়ে গেছে।

আমাদের লণ্ডনের স্বপ্ন আঘাতে কেঁপে উঠল।

তারপরে একেবারে ভেঙে গেল স্বপ্ন।

সেদিন ন্যাশনাল গ্যালারীতে শিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে ফিরছি। তাই নিয়েই তর্ক-বিতর্ক চলছে।

বাড়ি পৌছে দেখি, দরজা বন্ধ।

রুদ্রমূর্তি বাড়িউলীর আবির্ভাব হ'ল এবার, সে জানালে :

ভাড়া না চুকিয়ে দিলে বাড়ি ঢুকতে পাবে না!

বললাম,

ভাড়া দেব কোথা থেকে? তার চেয়ে আমাদের জিনিসপত্র দাও, চলে যাই!

বাড়িউলী চিৎকার করে উঠল, না, পাবে না! ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে যেয়ো!

দরজা মুখের উপর সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা চললাম কেনসিংটন গার্ডেনস্ পার্কে। সেখানে একখানা বেঞ্চিতে ভাবতে বসলাম।

কি করা যায়?

আট

চারিটি মানুষ লণ্ডনের পথে পথে ঘুরতে লাগল। এ যেন ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স-এর কল্পনা। তিনটি তরুণ তরুণী, আর একজন বৃদ্ধা। তরুণ-তরুণীরা দুঃখ সইতে পারে, কিন্তু দুঃখই যাঁর আজীবন সঙ্গী, তিনি কি করে সইবেন ?

পকেটে টাকা নেই, বন্ধু নেই শহরে, রাতে খাবার না খাই আশ্রয় তো চাই। তিন-তিনটে হোটেলে ঢোকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবাই আগাম চায়। বলে,

মালপত্র নেই, আগাম না হলে থাকতে দেব না।

বোর্ডিংগুলোতেও বাড়িউলীদের তীব্র ঝংকার—না, না, এখানে ঠাঁই হবে না !

শেষে আবার এক পার্কের বেঞ্চিতে গিয়েই বসে পড়লাম। কিন্তু সেখানেও পুলিশ-প্রভু এসে উদয় হলেন। বললেন ঃ

হটো, হটো ! পার্কে রাত কাটাবার নিয়ম নেই !

তিন দিন তিন রাত এমনি চলল। এক পেনীর বান্ রুটি চিবিয়ে কাটাই। তারপরে সারাদিনটা কাটে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ! বই পড়তে পড়তে দিন কেটে যায়। নিজেদের কথা ভুলে যাই, বইয়ের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে হাসি আর কাঁদি। অদ্ভুত আমাদের জীবনী শক্তি ! উপোস আমাদের কাবু করতে পারে না ! মাও তেমনি সজীব ! আমাদেরই মতো আশায় আছেন। বলেন, ভয় কি, কিছু একটা হবেই।

চার দিনের দিন যেন ঝিমিয়ে পড়ল সবাই। আমি প্রস্তাব করলাম, একটা উপায় ঠাউরিয়েছি। কিন্তু কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না—সবাইকে আমার হুকুম মেনে নিতে হবে।

সবাই ব্যগ্র হয়ে শুধালে, কি উপায় ?

বলব না। আমার সঙ্গে চল, দেখবে।

ভোর সবেমাত্র হয়েছে। পথঘাট তখনো জনবিরল। এখানে-ওখানে কুয়াশা জমে-জমে আছে। বাড়িগুলির দরজা-জানালা বন্ধ। পথের পর পথ পার হয়ে একটা হোটেলের ফটকে এসে থেমে পড়লাম।

হোটেলটি মস্ত বড়। বেশ সাজানো-গোছানো। মা অবাক হয়ে শুধালেন, এখানে কেন রে?

চুপ, কথা কোয়ো না! দেখ কি করি!

দেউড়ি সামনে। দরোয়ানকে হাঁক পেড়ে তোলা হ'ল। তাকে জানালাম, শেষ রাতের গাড়িতে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছি। আমাদের মালপত্র আসছে পরে, এখন আমাদের চাই কামরা, আর ছোট হাজিরীও জলদি-জলদি আমাদের কামরায় পাঠিয়ে দিতে হবে। মামুলি ছোট হাজিরী হলে হবে না—তার সঙ্গে চাই ভাল ভাল খাবার।

দরোয়ান তখনো আধ-ঘুমে। তাকে আর ভাবনার সময় না দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

কামরা মিলে গেল, ছোট হাজিরী এল, থরে থরে। রকমারী খাবার।

তারপরে গা ঢেলে দিলাম নরম বিছানায়।

ঘুমিয়েই দিনটা কেটে গেল। দুপুরের খাবার সময় দরোয়ানকে ফোন করে খবর নিলাম, আমাদের মালপত্র এসেছে কিনা। দরোয়ান জানালে আসে, নি।

এমনি ঘন ঘন ফোন করতে লাগলাম, শেষে হতাশ হয়ে বললাম, কি হ'ল কে জানে! কাল স্টেশনে গিয়ে খোঁজ করতে হবে!

স্বরে অভিজাতকুলের বিরক্তিমাখা। দরোয়ান বা হোটেলের ম্যানেজার আমার ঘরানায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারল না।

রাতের খাবার ঘরেই এল। আমরা পেটভরে চব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় দিয়ে ভোজন-পর্ব সমাধা করলাম।

রাতটাও ঘুমে কেটে গেল।

আবার ভোর হয়ে এল। জেগে উঠে সবাইকে ডেকে তুললাম, ওঠ, ওঠ!

সবাই জেগে উঠল, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

হেসে উঠে বললাম, চল, আর দেরি নয়!

ওরা আমার মুখের দিকে তাকালে।

বললাম, হঠাৎ-বাদশাহী শেষ হ'ল, এবার যে-মুসাফির-সে-মুসাফির!

যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। শুধু এবার আর নিদ্রা-বিভোর দরোয়ানটিকে জাগিয়ে বিরক্ত করলাম না।

আবার পথ। কিন্তু পথরেখা তো আর আবছা বলে মনে হয় না। এখন আমরা সুস্থ, সবল। আবার দুনিয়াদারীর মুখোমুখী দাঁড়াতে পারব, ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে পারব।

আজ আর ব্রিটিশ মিউজিয়মে নয়, আমরা বেড়াতে বেড়াতে এলাম চেলসিয়া অঞ্চলে। ভোরটা কাটল এক কবরখানায়। ঘুরতে ঘুরতে কবরখানায় একখানা খবরের কাগজ পেয়ে গেলাম। তুলে এনে কাগজখানা খুলতেই একটা প্যারার উপর নজর পড়ল। যে-সব বিলাসিনীদের ড্রয়িংরুমে নাচতাম, তাঁদেরই একজন ইংলণ্ড-সফরে এসেছেন, গ্রভনর স্কোয়ারে এক মস্ত বাড়ি নিয়ে পার্টির ধুম লাগিয়ে দিয়েছেন। লণ্ডন সমাজের এখন তিনি শিরোমণি, সমাজের কানাকানির সেরা খবর। হঠাৎ অনুপ্রেরণা এল। ঢেউ যেন অনুভব করলাম মগজে, আলোর উল্লাস চমক দিয়ে গেল।

সবাইকে বললাম, তোমরা বোসো, আমি আসছি!

কোথায় যাবি? মা শুধালেন।

হেসে বললাম, বলব না! আগে ফিরে আসি, তারপরে শুনো!

পথ চিনি না। ঘুরে ঘুরে, একে-ওকে জিজ্ঞেস করে যখন গিয়ে গ্রভনর স্কোয়ারে পৌছলাম, তখন দুপুরের খাবার সময়। ফটকে দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ভদ্রমহিলা বাড়ি আছেন। খবর পাঠাতেই, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন।

তুমি এখানে?

হেসে বললাম, আপনার মতো বেড়াতে আসিনি, এসেছি খাবারের খোঁজে।

কি করছ? শুধালেন।

তেমনি নাচ।

ভালই হ'ল, শুক্রবার সন্ধ্যেয় আমার এখানে পার্টি। তুমি নাচতে পারবে?

পারব।

তাহলে ঐ কথাই রইল। এখন এসো!

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, কিন্তু একটা কথা ছিল···

তিনি হেসে বললেন, কি, কিছু চাই?

হাঁ, সামান্য কিছু আগাম।

মহিলাটি ভাল, দশ পাউণ্ডের একখানা চেক লিখে দিলেন। সেই চেক নিয়ে ফিরলাম কবরখানায়। এসে দেখি, সবাই গোল হয়ে বসেছে, রেমণ্ড তাদের কাছে বলছে আত্মার কথা।

এসে চেকখানা সকলের সুমুখে দুলিয়ে বললাম, সামনের শুক্রবার নাচের বায়না নিয়ে এলাম। সেখানে হয়তো যুবরাজও আসবেন। আর কি, এবার বরাতকে বেঁধে ফেলেছি। এই দেখ চেক!

রেমণ্ড বললে, আগে চল একটা স্টুডিয়ো ভাড়া করি। নইলে বাড়িউলীদের এই অপমান আর সহ্য হয় না।

একটা দোকানে সামান্য কিছু খেয়ে স্টুডিয়োর খোঁজে বেরুলাম। চেলসিয়া অঞ্চলে মিলেও গেল ঘর। রাতে আমাদের মাথার উপর ছাদ জুটল। কিন্তু বিছানা তখনো জোগাড় হয় নি। তাই মেঝেয় শুয়েই কাটিয়ে দিতে হ'ল রাত। আর আমরা ভবঘুরে নই, আমরা শিল্পী, আমাদের স্টুডিয়ো আছে। রেমণ্ডের সংগে আমরা সবাই একমত, আর বোর্ডিং বাড়ির মতো বুর্জোয়া পরিবেশে আমরা যাব না। নিজেদের অপমানিত করব না।

আগাম ভাড়া দিয়ে যা রইল, তা দিয়ে টিনে-ভর্তি খাবার কিনে ফেললাম। ভবিষ্যতের এই রইল সঞ্চয়। নাচের আসরের জন্য একখানা ওড়নাও কিনতে হ'ল।

শুক্রবার সন্ধ্যা এসে গেল। আমরা হাজির হ'লাম গ্রভনর স্কোয়ারের প্রাসাদে। ভোজের পরে হলে জমে উঠল মানুষ। কাফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে, পাইপে সুখটান মারতে মারতে ওরা আমার নাচ দেখতে লাগল। প্রথমে নাচলাম, সেই নার্সিসাস ফুলের স্বপ্ন। তারপরে ওফেলিয়া!

কে যেন বলে উঠলেন, এমন দুঃখের অভিব্যক্তি ও কোথায় পেল? ও তো শিশু!

ভাবলাম বলি, দুঃখ দিয়ে আমার জীবন গড়া, তাই তো আমার মুখে তারই ছায়া। কিন্তু চুপ করে রইলাম।

সবশেষে নাচলাম বসন্তের গান।

মা বাজালেন, এলিজাবেথ পড়লে কবিতা। রেমণ্ড একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলে। বক্তৃতার বিষয়—ভবিষ্যতে মানুষের উপর নৃত্যের প্রভাব।

বক্তৃতাটা কফির পেয়ালা আর পাইপের ধোঁয়ার সংগে খাপ খেল না। একটু গুরুপাকই হ'ল।

ভদ্রমহিলা খুশি, অভিজাত বিলাসী-বিলাসিনীরা খুশী। তাঁদের মুখে এককথা —সুন্দর সুন্দর!

সঙ্গে সঙ্গে এল নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণের সংগে যে দক্ষিণাও দিতে হয় সেকথা বহু অভিজাত মহিলাই ভুলে গেলেন। তাই যেদিন রাজারাণীর সুমুখে নাচলাম, তারপরের দিন উপোস দিয়ে কাটাতে হ'ল।

একদিনের কথা মনে পড়ে।

সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি। অথচ সন্ধ্যেয় এক চ্যারিটি নাচের আসরে নাচতে হ'ল। নাচের পরে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। একজন খেতাবওয়ালী মহিলা আমাকে নিজের হাতে চা করে খাওয়ালেন। সঙ্গে শুধু স্ট্রবেরী ফল। হতাশ হয়ে পড়লাম। এমন সময় এক ব্যাগ নিয়ে আর এক ভদ্রমহিলা এসে উদয় হলেন। তিনি একমুঠো টাকা ব্যাগ থেকে তুলে নিয়ে দেখিয়ে বললেন, দেখ, দেখ, আমাদের অন্ধ আশ্রমের জন্য কত টাকা তুমি তুলে দিয়েছ!

মা আর আমি দুজনেই চুপচাপ। এ যেন এক নির্মম পরিহাস হয়ে আমাদেরই বুকে বাজল। অভিজাতদের প্রতি ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠলাম, কিন্তু মুখ ফুটে তো বলতে পারলাম না। সেখানে আমাদের দারিদ্র্যের অভিমান এসে বাধা দিলে। ঐ থলের টাকার ঝংকার আমাদের খালি পেটের ক্ষিদে আরো বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু নিষ্ঠুর দুনিয়ার এই পরিহাস চলতে লাগল। পেটে দানা নেই, অথচ ওদের জন্য নাচি—ওদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের টাকার থলেটা ভারি করে তুলি। গরীবের কিছু উপকার না হোক, গরীব-দরদী ওদের মহিমা ছড়িয়ে পড়ে।

শূন্য উদর, শূন্য রেস্ত। কিন্তু কে ভাবে! ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে রেমণ্ড পুরানো গ্রীক-অধ্যায়ের উপর আঁকা মূর্তিগুলি খাতায় নকল করে নেয়, আর আমি তাদের দেহভঙ্গীকে রূপ দিতে চেষ্টা করি। আমরাও মিউজিয়ামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই, ওরই লাগাও রেস্তোরাঁয় ক্ষিদে পেলে খাই বান্ রুটি আর কাফি।

লণ্ডন! লণ্ডন আমাদের মুগ্ধ করেছে, তার সৌন্দর্যে আমরা বিভোর হয়ে আছি। আমেরিকার তো নেই লণ্ডনের সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য। আর এখানকার আকাশে-বাতাসে তো ছড়িয়ে আছে তারই আভাস। রক্তবিপ্লব এখানে আসেনি, কিন্তু জনগণের দাবি প্রথম এখানে জয়যুক্ত হয়েছিল—এখানকারই কবি মহাকবি-রূপে আজও মানুষের মনের অলি-গলির সন্ধান দিচ্ছেন। এখানকারই কবি শেলী, বায়রন—কবিতাকে জীবনে রূপ দিতে চেয়েছেন—মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এতো আমার নয়, তবু আমার একান্ত আপন। তাই তো আমেরিকা আমার কাছে পর হয়ে গেল, আমি ইংলণ্ডকে ভালবাসলাম. লণ্ডনকে ভালবাসলাম। শিল্পীর ভূমি, ললিতকলার পীঠস্থান লণ্ডন। আমেরিকায় যে সৌন্দর্য খুঁজে পাইনি, এখানে তা পেলাম।

নিউইয়র্ক ছেড়ে আসার ঢের আগে থেকেই মিরোস্কীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। তাঁর কথা মনে পড়ত, প্রবঞ্চক-প্রতারক বলে গাল দিতাম, আবার কখনো বা

খুশি হতাম। যাক, বিবাহের বন্ধনে তো ধরা পড়িনি—ধরা পড়লে কেমন হত জীবন কে জানে!

একদিন এক বন্ধুর চিঠি এল শিকাগো থেকে। স্পেনের যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নামে লিখিয়েছিলেন মিরোস্‌কী—ফ্লোরিদার শিবির অবধি গিয়েও ছিলেন, সেখানে টাইফয়েডে মারা গেছেন। চিঠি পড়ে বাজ-পড়া মানুষের মত বসে রইলাম। সত্য বলে বিশ্বাস হ'ল না।

ভেবেছিলাম, মিরোস্‌কীর সঙ্গে প্রেমের পালা কবে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মন অধীর, শেষ তো হয়নি। যা ছিল অন্তরের গভীরে লুকিয়ে, তারই আভাস চেতন-মনে জেগে উঠল। ক'দিন যে কি করে কাটল জানি না। শুধু বসে বসে তারই কথা ভাবতাম। রোজনামচায় লেখা স্মৃতিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। মন বার বার বললে. না, না, মিরোস্‌কী মারা যাননি। আবার পরক্ষণেই চিঠি তার অকাট্য প্রমাণ নিয়ে বলে উঠত, তিনি মারা গেছেন। এমনি করে টানা-পড়েন চলল মনে। সন্দেহ-সংশয়ের দোলায় দুলতে লাগলাম। শেষে এক লাইব্রেরীতে গিয়ে পুরানো খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে বার করলাম খবর। মৃতের তালিকায় খুদে খুদে অক্ষরে তার নাম ছাপা।

আমার প্রথম প্রেম অকালেই ঝরে পড়েছিল। সে তো প্রেম নয়, সে ছিল কিশোরী কল্পনার বিলাসমাত্র। সেখানে ছিল না স্পর্শ, ছিল না চুম্বনের নিবিড়তা, ভুজ-বন্ধনের মাদকতা। কিন্তু দ্বিতীয় প্রেম এসেছিল সব নিয়ে। আলিঙ্গনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম, চুম্বনে পরস্পরের আত্মাকে অনুভব করেছিলাম। সেই তো ছিল আমার প্রকৃত প্রথম প্রেম। সে প্রেম লাঞ্ছিত হয়েও মরেনি, আজও সে আছে। তাইত আমি মিরোস্‌কীর মৃত্যুতে এমনি অধীর!

বন্ধুর চিঠিতে ছিল মিরোস্‌কীর স্ত্রীর নামধাম—লণ্ডনের ঠিকানা। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কোন্ দূর হ্যামারস্মিথ অঞ্চলে বাড়ি। তাই পথে এসে একটা গাড়ি নিতে হল। ঘোড়ার গাড়ির কোচমানকে ঠিকানা দিয়ে ভিতরে চুপ করে বসে রইলাম। মন কিন্তু চুপ করে রইল না। মিরোস্‌কীর উপর রাগ হ'ল—এই আমার প্রেমিক—কখনো তার স্ত্রীর কথা আমাকে বলে নি। আজ ভাবি, তখন কি গোঁড়াই না ছিলাম।

পথ যেন আর ফুরোয় না। মাইলের পর মাইল ঘুরে গাড়ি এল শহরতলীতে। এখন শুধু ধূসর রঙের বাড়ির সার! একটা আর একটার মতো দেখতে। সামনে ফটক, ফটকে বাড়ির নাম দাগা। বাড়িগুলির জাঁকজমক না থাক, নামে বৈচিত্র্য আছে। কোনটি শারউড কুটীর, কোনটি গ্লেন-ভবন, কোনটি শুধু এলেসমিরার, কোনটি এলেস্‌মোর। আবার কতগুলো নাম অর্থহীন। গাড়ি এবার এসে দাঁড়াল ষ্টেলা-ভবনের ফটকে। নেমে পড়ে ঘণ্টি টিপলাম। একটি দাসী এসে দরজা খুলে দিলে।

বললাম, মাদাম মিরোস্‌কীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

দাসী নিঃশব্দে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে।

উপরে দুপ্‌দাপ পায়ের শব্দ, তীক্ষ্ণস্বর ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে, এই তোমরা হৈ-চৈ করো না! আস্তে আস্তে!

ষ্টেলা-ভবন তাহলে মেয়েদের ইস্কুল!

বসেই আছি, শুনছি মাষ্টারী কড়া শাসনের ধমক। এদিকে মনে গোপন ঈর্ষা জেগে উঠছে। কেমন হবেন মাদাম মিরোস্‌কী—আমার চেয়ে কি সুন্দরী? কি দেখে মজেছিলেন মিরোস্‌কী দেখতে হবে তো! আমার মনে ভয়—মাদাম মিরোস্‌কী আর আমার মাঝখানে তো পড়ে আছে মিরোস্‌কীর মৃতদেহ। এই মৃতদেহের উপর দিয়ে আমাদের সাক্ষাৎ কেমন হবে? আশঙ্কায় মন ছেয়ে গেল। ভাবলাম চ'লে যাই। কিন্তু এখন তো আর চলে যাওয়া চলে না! বসে থাকতে হবে, দেখা করতে হবে।

এমনি জল্পনা-কল্পনা চলছে, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন মাদাম মিরোস্‌কী। ছোটখাটো মানুষ, চার ফুটের বেশি লম্বা হবেন না। রোগা, শুধু শীর্ণ মুখে ধূসর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। বিরল কেশ, ফ্যাকাসে মুখ, পাতলা বিবর্ণ ঠোঁট।

তিনি আমাকে দেখে খুশি হলেন না। ভ্রূ তাঁর একটু কুঁচকেই গেল।

আমি নিজের পরিচয় দিতে গেলাম—আমি—আমি—

তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, জানি, তুমি ইসাডোরা। ইভান বহু চিঠিতেই তোমার কথা লিখত।

বললাম, কিন্তু আমার কাছে সে আপনার কথা কিছুই বলে নি।

না, বলেনি, বলতে চায় নি।

ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনিও কাঁদলেন। দুজনের

ভিতরে যে ব্যবধান ছিল, ঘুচে গেল। আমরা হলাম বন্ধু। চোখের জল আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে তুলল।

তিনি নিজের ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেয়ালে সারি সারি মিরোস্কীর ফটো। তাঁর তরুণ বয়সের ছবি দেখে মুগ্ধ হলাম। এক অনুপম সুন্দর কুমার, মুখখানি তেজদৃপ্ত, এ-মুখ দেখলে কেনা ভালবাসতে চায়? এই তরুণ দেবতাকে আমি পাইনি বলে দুঃখ হ'ল, আবার আছে সৈনিকের উর্দিপরা শেষ ফটোখানি। মাদাম সেখানিকে ক্রেপের কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। মাদাম এবার বলতে লাগলেন, তাঁদের কাহিনী।

শুধু দুজন, আর কেউ সেখানে নেই। শুধু দুই তরুণ-তরুণী। দুজনে দুজনের চোখে কি দেখেছিল, তাই সব কিছু ভুলে গেল। তারা দুজনে দুজনকে চাইল। পেলেও। তারপর তো দুঃখের ভয়াল ছায়াঘেরা জীবনে প্রেমে নীড় গড়ে তোলার পালা এল। প্রেমের কুজন-গুঞ্জন উঠল। কিন্তু বাস্তব তার ভয়াল নিঃশ্বাসে প্রেমের নীড় ধসিয়ে দিতে চাইল বার বার। মিরোস্কীকে ভাগ্যের সন্ধানে সাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হ'ল আমেরিকায়। তিনি একাই গেলেন, এমন অর্থ নেই যে দুজনে যাবেন। মাদাম বলে উঠলেন,

কথা রইল আমি যাব পরে। ও মাঝে-মাঝেই চিঠি লিখত—শীগ্‌গীরই টাকা আসবে হাতে, তুমি চলে আসবে। অতলান্তিকের এ-পারে আমরা গড়ব আমাদের নীড়। কিন্তু টাকাও আর হ'ল না, নীড় গড়াও হ'ল না। ইস্কুলের কাজ নিয়ে পড়ে রইলাম। চুল সাদা হয়ে গেল। কিন্তু তবু ইভান টাকা পাঠাতে পারলে না।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। চোখের সুমুখে ভেসে উঠল এক সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি নারীর ছবি। প্রতীক্ষায় জরা এসে দেখা দিলে—তবু তো নীড় বাঁধা হ'ল না। নিজের সঙ্গে তাঁকে বারবার তুলনা করে দেখতে চাইলাম। আমার তারুণ্য, আমার দুঃসাহস নিয়ে তো তাঁকে বুঝতে পারলাম না। বার বার মনে হ'ল— এত যদি তোমার প্রেম, সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে সাগরপাড়ি দিলে না কেন? জাহাজে তো একটা কাজও জুটিয়ে নিতে পারতে? আমি এখনো বুঝিনি, এখনো বুঝতে পারিনে—মন যা চায়, তা মানুষ কেন করে না? আমি তো জীবনে কখনো প্রতীক্ষায় থাকিনি। মনকে আমার জীবনের নেতা বলে ভেবে নিয়েছি। এর জন্য ঝড়-ঝঞ্ঝা অনেক মাথার উপর ঘনিয়ে এসেছে, তাতে ভ্রূক্ষেপ করিনি। দৃপ্ত মন শুধু বলেছে, ভয় কি, তুমি তো নিজের পথে চলছ। তুমি তো অপরের ছককাটা পথে চলনি। দুঃখ আসে আসুক, তাকে বরণ করে নাও,

তোমার আনন্দকে সে তো ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে পারবে না। তাই তো মাদামকে দেখে সেদিন মনে হয়েছিল, ঐ জরতী নারী—কেমন করে বছরের পর বছর ধরে প্রতীক্ষা করে কাটিয়ে দিলে? কি করে রইল আশা পথ চেয়ে, স্বামী রাহাখরচ পাঠাবে—সে যাবে সাগরপাড়ি দিয়ে—গিয়ে প্রেমের নীড় গড়বে? মনের নির্দেশ সে মানতে পারলে না, সাহসিকা সে হ'তে পারলে না—তবে সে প্রেমিকা কিসে?

তাঁর ঘরে তাঁর হাত ধরে বসে রইলাম, মিরোস্‌কীর কথাই বলতে লাগলাম দুজনে। এবার রাত হয়ে এল, উঠে পড়লাম।

মাদাম আমাকে বার বার অনুরোধ করলেন, আবার এসো!

আমিও পাল্‌টা অনুরোধ জানালাম, আপনিও আসবেন!

তিনি উত্তর দিলেন, আমার তো সময় নেই। সারাদিনই কাজ। সেই ভোরে উঠে কাজ শুরু হয়, দুপুর রাত্ত অবধি একটানা চলে! তারপরে বিশ্রাম। তখন কি কারো সঙ্গে দেখা করা যায়! তুমিই এসো!

গাড়ি বিদায় করে দিয়েছিলাম, দোতলা বাসে উঠে ফিরে এলাম বাড়ি।

মিরোস্‌কীর জন্য মন কেঁদে উঠছিল। তাঁর স্ত্রীর জন্য চোখের জল ফেলছিলাম। আবার ওঁরা নিষ্ফলের দলে বলে ওঁদের জন্য জাগছিল করুণা। প্রতীক্ষা করেই কাটিয়ে দিলেন, নীড় বাঁধতে পারলেন না! এই কি ওঁদের সত্যকারের প্রেম? প্রেম তো নরনারীর হৃদয়ে বিপ্লব নিয়ে আসে, তাদের পথের বাধা চূর্ণ করে দিয়ে তারা মিলিত হয়।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি এসে পৌছলাম। এতদিন মিরোস্‌কীর ফটো আর চিঠির বাণ্ডিল বালিশের তলায় রেখে ঘুমোতাম, আজ সেগুলি তুলে নিয়ে বাণ্ডিল বেঁধে রাখলাম ট্রাঙ্কের তলায়। যারা নিষ্ফল, তারা আমার কেউ নয়। যারা ধনবাদী জগতের অনুশাসন মেনে নিলে, নিজেদের প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে যেতে দিলে —তারা আমার কেউ নয়। না, না, মিরোস্‌কী আমার কেউ নয়। সে যে ছিল, তাও আমি ভুলে যাব—ভুলে যাব!

চেলসিয়া থেকে এলাম কেনসিংটন গার্ডেনসে। স্টুডিয়োখানি আগেকার চেয়ে অনেক বড, তাছাড়া আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। পিয়ানো আছে, আমার নিজস্ব কামরাও মিলেছে। কিন্তু লণ্ডন নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। জুলাই মাসেই নাচের আসরের নিমন্ত্রণ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সামনে আগস্ট মাস। হাতে টাকাও

নেই। সারা আগস্ট মাস কেনসিংটন আর ব্রিটিশ জাদুঘরে কেটে গেল। লাইব্রেরী বন্ধ হলে হেঁটে বাড়ি ফিরি। খাওয়া-দাওয়া বাইরেই যে করে হয় সেরে আসি।

এমনি দিনে মাদাম মিরোস্‌কী এসে হাজির।

সন্ধ্যে তখন হয়ে এসেছে। তিনি আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন এক রেস্তরাঁয়। সেখানে এক ভোজের হুকুম দিয়ে বসলেন। সুস্বাদু বারগাণ্ডি সুরার বোতলও খোলা হ'ল। দুজনের মগজে এবার কথার মুক্তো ফুট্‌ কাটতে লাগল। শুরু হ'ল কথা। ইভান তার নায়ক।

মাদাম শুধালেন, শিকাগোতে কেমন ছিল ইভান? প্রথম দিনে তাকে কেমন দেখেছিলে?

অতীতের স্মৃতির উপর তুষার ঝরে, তুষারে ঢেকে যায়, কিন্তু আমার এ অতীত তো সুদূরের নয় তাই চোখের সুমুখে ভেসে উঠল বোহেমিয়া ক্লাব। সেই নিঃশব্দে পাইপ টেনে-যাওয়া মানুষটি। বললাম তাঁকে সেকথা, তারপরে এল আরো কথা। সোনালি গোল্ডেন রড ফুল ভালবাসত ইভান, নিয়ে আসত গোছা গোছা ফুল। সেই সোনার ফুলের আলো যেন ছড়িয়ে পড়ত ওর চোখে। আজও সোনালি ফুল দেখলে ওর দুই দীপ্ত চোখের কথা মনে পড়ে।

মাদাম, শোনেন আর কাঁদেন। আমার চোখেও জল। আর এক বোতল বারগাণ্ডি এল। বারগাণ্ডির আঙুর চোলাই করে আঙুবিনা তৈরী হয়েছে, তারই অতলে ডুবে গেলাম। চোখে সোনালি নেশা, মনেও তারই রঙ। তাই নিষ্ফলের স্মৃতি নিয়েই প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। ইভান নিষ্ফল হলেও সে ছিল প্রেমিক। সেই প্রেমকে আবার ফিরে পেলাম স্বর্ণাভ পানীয়ের টলটল পাত্রে। আমি ফিরে পেলাম প্রৌঢ় ইভানকে, আর, আর বঞ্চিতা স্ত্রী ফিরে পেলেন তরুণকে। কে জিতল জানিনা, মনে হ'ল দুজনেরই জিত। দুজনে গলা জড়িয়ে ধরে কত কাঁদলাম। তারপরে মাদাম চলে গেলেন স্টেলা-ভবনের ঘানিতে, আর আমি ফিরে এলাম স্টুডিয়োতে। বুঝলাম, নিষ্ফলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় না আমার মন—তবু আমার নিষ্ফল প্রেমিকের স্মৃতি তো বড় মধুর। তাকে আরো মধুর, আরো নিবিড় করে তোলে ফ্রান্সের দলিত দ্রাক্ষার বেদনা। বেদনা এনে দেয় নেশা—আনন্দ আর ব্যথা!

সেপ্টেম্বর এসে গেল। এলিজাবেথ আমাদের নাচের ইস্কুলের ছাত্রীদের অভিভাবিকাদের কাছে চিঠিপত্র লিখত। তাঁদেরই একজন একখানা চেক পাঠালেন, সঙ্গে চিঠি।

এলিজাবেথ ফিরে আস্থক, নাচের ইস্কুল সে আবার খুলে বস্থক।

আবার পরিবারের পরামর্শ বৈঠক বসল। এলিজাবেথ জানালেঃ আমি আমেরিকায় ফিরে যাব। যদি সেখানে কিছু রোজগার হয়, তোমাদের টাকা পাঠাব। এদিকে তোমরা চেষ্টা কর। ভাগ্য যদি ফেরে আবার ফিরে আসব।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তাই-ই স্থির হ'ল। ওকে গরম একটা কোট কিনে দিলাম। তারপর তুলে দিয়ে এলাম জাহাজে।

এলিজাবেথ আমুদে মেয়ে। আমাদের দুঃখের সংসারে আনন্দ। সে-আনন্দ আর রইল না। এদিকে এল অক্টোবর মাস। ঠাণ্ডা, অন্ধকার দিন। কুয়াশা ঘিরে ফেলল মহানগরীকে। আমাদের সম্বল তখন এক পেনির স্থরুয়া। ব্রিটিশ জাদুঘরও আর মন টানে না। কোথাও বেরুই না, সারাদিন কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকি।

মন ভেঙে পড়ল। কোথায় সেই দুর্দম সাহস—কোথায় সেই সবুজের অভিযান! পুচ্ছ তো আর নেচে-নেচে ওঠে না। সারাদিন পড়ে-পড়ে ঘুমোই। আর লণ্ডনের কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকি। নিঃশব্দে আসে কুয়াশা, শার্সির উপর নিঃশ্বাস ফেলে। বিড়াল-পায়ে এগিয়ে এগিয়ে চলে। নগরী ডুবে যায়। তাঁর মিনারগুলি মুছে যায়, মুছে যায় পথঘাট। আমরা দেখি—ভয়ে বুঝি কেঁপে কেঁপে উঠি। আমাদের সাহস উপিয়ে নিয়েছে কুয়াশা—আমাদের তারুণ্য শুষে নিয়েছে।

এমন সময় এল এলিজাবেথের চিঠি আর টাকা। সে লিখেছে, নাচের ইস্কুল খুলেছে, ভালই আছে।

এরই মধ্যে স্টুডিয়োর লিজের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল, আমরা কেনসিংটন পার্কের স্মুখে একখানা ছোট বাড়ি ভাড়া নিলাম।

অক্টোবর মাস চির দিন থাকে না, থাকেনা নভেম্বরের অন্ধ তমসার পালা থাকে না তুষার ঝড় আর কুয়াশা, আর বৃষ্টি। তাই আবার বসন্ত এল।

বসন্তে মন আবার নেচে উঠল, তারুণ্যে ফিরে এলাম। আবার নাচ শুরু হ'ল। কখনো কখনো রাতে নিরিবিলি পার্কেই নাচি। রেমণ্ডও আমার সঙ্গে থাকে। সে করে আবৃত্তি।

একদিন এমন নাচছি, এমন সময় এক অপরূপ রূপসী মহিলা এসে দাঁড়ালেন আমাদের স্মুখে,বলে উঠলেন,

তোমরা কোথা থেকে এলে?

হেসে বললাম, আমরা তো পৃথিবীর নই, চাঁদের দেশের মানুষ।

রূপসীও হাসলেন, বললেন, তা পৃথিবীরই হও, আর চাঁদের দেশের মানুষই হও, আমার ওখানে একটি বার যাবে?

তখুনি আমরা রাজী। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। তিনি নিয়ে গেলেন পার্কের কাছে এক সুন্দর বাড়িতে। ছবির মতো সাজানো বাড়িখানি, দেয়ালে দেয়ালে আছে ছবি। আর সে ছবি রূপসীরই। তাঁরই ছায়াকে নানা রূপে রঙে তুলিতে পটে মূর্ত করে তুলেছেন শিল্পী বার্ণ জোনস, রসেটী, উইলিয়াম মরিস।

কে এই রূপসী—যাঁর ছায়া শিল্পীর মনের আরসীতে এমনি করে ছায়া ফেলেছে?

কে?

পরিচয় মিললো।

ইনি শ্রীমতী প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল। অভিনেত্রীদের শিরোমণি। বিদ্রোহী বাস্তবতা যেদিন নাটকে ফুটে উঠল, তাকে তিনিই প্রথম রূপ দিয়েছিলেন। তিনি পলা ট্যাঙ্কারী—বিপ্লবী নায়িকার অভিনয়ে ইংলণ্ডকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। জীবনেও ইনি বিপ্লবী। কত প্রেমিককে প্রেম বিলিয়েছেন, কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি। এমন যে বুদ্ধিদীপ্ত বার্ণাড শ, তিনিও তো তাঁর প্রেমিক। এই সেই প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল, এই সেই পলা ট্যাঙ্কারী! ভাগ্যের সড়কের উপর অনড় হয়ে খাড়া ছিল বাধা, সে-বাধা উপে গেল। শ্রীমতী ক্যাম্পবেল আমাকে ভালবাসলেন, তাঁর ভালবাসা পেলাম। এবার পেলাম লণ্ডনের চাবিকাঠি, লণ্ডন আমার হ'ল।

তিনি আমাকে শ্রীমতী উইণ্ডহামের কাছে পাঠালেন। ইনি শিল্পীদের জননী। শ্রীমতী ক্যাম্পবেল এঁর বাড়িতেই প্রথম জুলিয়েতের অভিনয় করে নাম কেনেন। শ্রীমতী উইণ্ডহাম আমাকে আদরে গ্রহণ করলেন।

দিনটা ছিল সুন্দর। ঘরে জ্বলছিল আগুন। এসেই মনে হ'ল, এ-যেন এক বন্দর। এখানে আছে খাবার, আছে সাচ্ছন্দ্য—আছে নিরাপত্তা।

শ্রীমতী উইণ্ডহাম আমার জন্যে এক নাচের আসর বসালেন।

লণ্ডনের শিল্পী-সাহিত্যিক মহল এসে হাজির হলেন। তাঁদের সুমুখে নাচলাম। গ্রীক আদর্শ ফুটিয়ে তুললাম। আজ তো আর বাধা নেই, আজ আমি আমার আদর্শকে রূপ দিলাম দেহের ছন্দে ছন্দে, সঙ্গীতের তালে তালে। এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তিনি কে?

তরুণ নন, পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়।

কিন্তু প্রৌঢ় হলে কি হবে, অমন সুন্দর মুখ তো দেখিনি! কি গভীর, অতলস্পর্শী দুই চোখ, কি উন্নত তাঁর ললাট, কি সুগঠিত নাক—আর কি কোমল মুখের রেখা। ছিপছিপে দেহ, একটু বা নুয়ে চলেন। সাদা চুল মাথায়, মাঝখানে সিঁথি, মাঝে মাঝে চুল এসে পড়ে কানের কাছে—আরো সুন্দর দেখায়!

কে ইনি?

চার্লস হালি। বিখ্যাত পিয়ানোবাদক হালির ছেলে। কি আশ্চর্য, কত তরুণ তো ছিলেন, কাউকে মনে ধরল না—এক পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়কে ভালবেসে ফেললাম!

তবে কি প্রৌঢ়ের মনে আর দেহে যে পরিণতি, তাই-ই আমাকে টানে?

হাঁ তাই। অভিজ্ঞতাকেই আমি বরণ করি; পরিণতিকেই আমার ভাল লাগে। অপরিণত তরুণ তো সেখানে আনাড়ির খেলা খেলবে—মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় এঁটে উঠতে পারবে না। তাইত তরুণদের সেদিন আমার চোখেও পড়ল না। এক নিমেষে চিনে নিলাম পুরুষ পরেশকে।

পুরুষ পরশ পাথর। সে সোনা করে দেয় মন। তিনিও সোনা করে দিলেন। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর স্টুডিয়োতে। সেখানে চা খেলাম দুজনে, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তারপরে তো রোজ বিকেল তার ওখানেই কাটতে লাগল।

কত গল্প শুনি তাঁর কাছে।

শিল্পী বার্ণ জোনস্ তাঁর বন্ধু। কবি রসেটিও আসেন, আসেন উইলিয়াম মরিস। হুইসলার, যিনি এশিয়ার রীতি এনে চিত্রকলায় যুগান্তর এনেছিলেন, তিনিও ছিলেন তাঁর পরিচিতদের একজন। আর ছিলেন কবি টেনিসন। মুগ্ধ হয়ে শুনি তাঁদের কাহিনী, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।

একদিন ঠিক হ'ল নিউগ্যালারীর প্রাঙ্গণে, যেখানে গাছপালার ভিতরে ঝরণা বয়ে যায়, সেখানে আমি নাচব। এ্যাণ্ড্রু ল্যাং গ্রীক উপকথার সঙ্গে নৃত্যের কি সম্বন্ধ তার ব্যাখ্যা করবেন।

আমি গ্রীক কুমারীর মতো শুধু শুভ্র এক অঙ্গাবরণ পরে নাচতে এলাম। ঝরণার চারিধারে ঘুরে ঘুরে নাচলাম, কখনো বা ঘন পামের ছায়ায় মিলিয়ে গেলাম।

হর্ষধ্বনি ওঠল, খবরের কাগজে-কাগজে সুখ্যাতি। নিমন্ত্রণের তোড় বয়ে গেল।

ভাগ্যদেবী হাসলেন।

যুবরাজ এলেন নাচ দেখতে। ইনি পরে সপ্তম এডোয়ার্ড নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি তো নাচ দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ যে ইংরেজ চিত্রকর গেইনস্‌বরোর ছবি! সেই থেকে আমার নাম হ'ল গেইনস্‌বরোর ছবি।

হালি আছেন, আবার আর-এক স্বপ্নবিলাসী কবি জুটলেন। স্বপ্নিল তাঁর চোখ, মৃদু স্বর। তিনি আসেন রোজ সন্ধ্যায়, বগলে গাদাগাদা কাব্য-সংগ্রহ। কোনদিন বা পড়েন সুইনবার্ন, কোনদিন বা কীটস্—কোনোদিন ব্রাউনিং, রসেটি বা অস্কার ওয়াইল্ড। জোরে পড়েন, আমি কান পেতে শুনি। মাও বসে থাকেন। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন। আর সেই সময় কবিটি কি করেন?

আমার কাছ ঘেঁসে বসেন, গালের উপর ঠোঁট দুটি বুলিয়ে নেন।

কবির নাম ডগলাস।

ডগলাস আর হালি এই দু'জনই আমার বন্ধু, আমার প্রেমিক। আর কারো প্রেম তো আমি চাইনে। কিন্তু তবু তারা আমাকে চায়। নাচের পর আমাকে ঘিরে ধরে। ফুলের তোড়া পাঠায়। আলাপ করতে আসে। আবার কখনো বা নিমন্ত্রণ করে বসে। কিন্তু সেখানে মহিমময়ী রাণী আমি। আমার মহিমা দেখে ওরা ভয় পায়, তুষার শীতল হয়ে যায় ওদের কামনা।

হালি আর তাঁর বোন থাকেন এক সঙ্গে। চমৎকার পরিবারটি! এঁদের সঙ্গেই একদিন হেনরি আর্ভিং আর এলেন টেরীর অভিনয় দেখতে গেলাম।

নাটক 'ঘণ্টাধ্বনি'। আর্ভিং আর টেরী নায়ক-নায়িকা।

কি করে সে-অভিনয়ের বর্ণনা করব! আর্ভিং যেন ঘণ্টাধ্বনি শুনেই উন্মাদ হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর রূপ বদলে যায়। * অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত। কয়েক সপ্তাহ তো ঘুমুতে পারিনি। তারপর আছেন এলেন টেরী। যেদিন তাঁকে প্রথম দেখি, সেইদিন থেকে তিনি আমার ধ্যান-জ্ঞান।

হালি শিল্পী মহলের দ্বার খুলে দিলেন। একদিন বিখ্যাত চিত্রকর ওয়াটস্-এর ওখানে গেলাম। তাঁর বাড়িতে চারিদিকে শুধু এলেন টেরীর ছবি। এলেন টেরীর বিভিন্ন রূপকে তিনি ধরেছেন পটে, এই তাঁর গর্ব। তিনি আমাকে ঘুরে

* এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই 'ঘণ্টাধ্বনি' নাটকটি আমাদের দেশী পরিবেশে শঙ্খধ্বনি নাম দিয়ে অভিনয় করেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার। আর্ভিং যে ভূমিকাটি নিয়েছিলেন, সেটি তিনি গ্রহণ করেন। শিশির-প্রতিভার সে এক অপূর্ব নিদর্শন।

ঘুরে ছবি দেখালেন, তারপর বাগানে নিয়ে গেলেন। ফুলের কেয়ারীর ভিতরে ঘুরতে ঘুরতে বলে গেলেন নিজের শিল্প আর জীবনের কথা।

এলেন টেরীর সঙ্গেও এখানে পরিচয়।

এলেন টেরী! সে-নামের জাদু আজকের জগত কি জানে? হলিউডের চিত্রতারকা নিয়েই আজকের জগত উন্মত্ত।

এলেন টেরীকে দেখলাম। সেই তন্বঙ্গী যুবতী এলেন টেরী আর নেই—কিন্তু সে-মহিমা, সে-সৌন্দর্য তো উবে যায়নি। এখনো তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি একদা ছিলেন ওয়াটস্-এর মানস-সুন্দরী; একদা বার্ণার্ড শ' তাঁকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর বরতনু এখন আর লতার মতো নয়, সেখানে এসেছে বনস্পতির মহিমা। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এলেন, য়ুরোপের প্রিয়া এলেনকে ভালবেসে ফেললাম, হৃদয়ের শ্রদ্ধার অর্ঘ দিলাম তাঁর পায়ে। তিনিও আমাকে ভালবাসলেন।

কত স্মৃতি তাঁর জীবনে। মহিমময়ী নায়িকা, কত গুণীজন তাঁর পায়ে ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের দীর্ঘ জীবনের তপস্যার ফল, কত শিল্পী তাঁকে পটে ধরতে গিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, কত কবি তাঁকে কেন্দ্র করেই অমরতা পেয়েছেন। যখন তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম, মনে হতো, তাঁর ঐ চোখের ভাষায়, মুখের ব্যঞ্জনায়, দেহের সঞ্চালনে কত স্মৃতি গুন্‌গুনিয়ে উঠছে। সে তো শুধু তাঁর নিজের স্মৃতি নয়, য়ুরোপের সংস্কৃতি তার সঙ্গে জড়িত।

...বার্ণার্ড শ'। তখন তিনি নামী শিল্প আর নাট্য-সমালোচক, সেই শ' তাঁকে ভালবেসেছিলেন। সেও মঞ্চে দেখে ভালবাসা, সাক্ষাৎ পরিচয় নয়। শ' লিখলেন চিঠি।

আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব না। আমাকে অতি কুৎসিত দেখতে, তার উপরে আমি প্রৌঢ়, লাল দাড়ি আমার।

এলেনও অমনি উত্তর দিলেন।

তুমি বোধ হয় ভালবাসায় পাগল! তুমি তো ছেলেমানুষ! একজন আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষের পক্ষে চল্লিশটা বয়েসই নয়। একটু শক্ত হও! মেয়েদের পিছনে সময় নষ্ট কোরো না! বোকা আমার, দুনিয়াটাকে নাড়া দাও!

অমন খোঁচা খেয়ে শ'ও কি চুপ করে থাকেন? তিনি আবার জবাব দিলেন, জবাবে এলেন-এর হুলের বদলে হুল ফোটালেন। তবে সেখানে ব্যঙ্গের থেকে দরদ বেশি।

শ' লিখলেন—উনত্রিশ বছর বয়েস অবধি এমন নোংরা ছিলাম যে, কোনো মেয়ে আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। একটা জীর্ণ সবুজ রঙের কোট থাকত আমার গায়ে, তারও ছেঁড়া হাতা কাঁচি দিয়ে কেটে ঠিক করা, আর পায়ে মস্ত বেঢপ জুতো। তারপরে একটা কাজ পেয়েই কিনলাম এক প্রস্থ পোষাক। অমনি এক মহিলা চায়ে নিমন্ত্রণ করে বসলেন, আমার গলাও দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, তিনি আমাকে ভালবাসেন। আমি তখন ভালবাসা সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাই ওটা বরদাস্ত করে গেলাম। নিজেকে কখনো আকর্ষণীয় বলে ভাবিনি, তাই অবাক যে না হ'লাম এমন নয়। সেই থেকে যে কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে একা থাকলেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন এবং ভালবাসা জানিয়েছেন। এই বুঝি আমার অদৃষ্ট। সাবধান! এক মুহূর্ত যদি আমার সঙ্গে একা থাক, তোমাকেও অমনি আমার গলা জড়িয়ে ধরতে হবে জানাতে হবে ভালবাসা।

এলেন এমনি ছিলেন বলেই তো এমন প্রেমিক পেয়েছিলেন। এখন আর তাঁদের দেখা হয় না। কিন্তু শ' বলেন, এলেন তো আমার কাছে বুড়ো হবে না কখনো। এলেনও হাসেন, বলেন, অমন বন্ধু ক'জন আছে!

এমন এলেন টেরির সঙ্গে পরিচয় হ'ল, এ তো আমার গর্ব।

তারপরে তো লণ্ডনের রসিক মহলের দরজা খুলে গেল। আমি কাজও পেলাম—সেই নিদাঘ নিশীথের স্বপ্নে পরীর ভূমিকা।

এরই মধ্যে একদিন বিখ্যাত অভিনেত্রী লেডী ট্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী, তার স্বামী বীরবম ট্রী বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক। লেডী ট্রী তখন সাজঘরে।

তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তারপরে নিয়ে গেলেন মঞ্চে। আমার পরনে সেই নাচের পোষাক। তার স্বামীর সুমুখে নাচতে হ'ল। এবারও নাচলাম মেণ্ডেলসনের বসন্তের গানের সুরে। বিখ্যাত ট্রী দেখলেন কিনা জানি না। তিনি তখন অন্যমনস্ক। মাছি উড়ছে মঞ্চে, তিনি তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। যাহোক, নাচ শেষ হ'ল, কিন্তু তাঁর কোনো মন্তব্য শোনা গেল না। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।

অনেকদিন পরের কথা।

মস্কৌয়ে এসেছেন বীরবম ট্রী, এক ভোজের মজলিসে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা। আমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল, কত কথাই কইলেন, উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার নাচের প্রশংসা করলেন। এবার পানের পালা।

প্রথমে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে পান করা হ'ল, তারপর পৃথিবীর শিল্প-সংস্কৃতির মিলনের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ স্যার বীরবম পানপাত্র হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

আসুন আমরা ইসাডোরার নামে পান করি, তিনি তো জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন।

পান করা হ'ল, বিখ্যাত নর্তকীর দীর্ঘায়ু কামনায়, তাঁর মহান শিল্পকলার উদ্দেশ্যে। পান-পাত্রে ঝংকার উঠল। বিজয়িনী আমি হাসলাম, তারপর স্যার বীরবমের কানে কানে বললাম,

জানেন, একদিন আপনার সম্মুখে নেচেছিলেন এই বিশ্ববিজয়িনী নর্তকী ইসাডোরা, সেদিন আপনি তাকিয়েও দেখেন নি। সেদিনও আমি কিন্তু এমনি নাচই নাচতাম।

কি—কি বললে! স্যার বীরবম অবাক হয়ে গেলেন। আমি তোমার নাচ দেখেছি, তোমার সৌন্দর্য, তোমার তারুণ্য দেখেছি, অথচ তারিফ করিনি! হায়, আমি কি বোকাই না ছিলাম! কিন্তু এখন তো তারিফ করেও লাভ নেই।

মৃদু হেসে বললাম, আপনার তারিফ করার দাম এখনো আছে।

সেদিন থেকে স্যার বীরবম হলেন আমার নৃত্যকলার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। আর সবচেয়ে বড় কথা, তাঁকে বন্ধু হিসেবেও পেলাম।

সত্যি, আজ ভাবি, লণ্ডনের রসিক-মহলে আমি সাড়া জাগিয়ে ছিলাম, অথচ থিয়েটার মহল আমার নাচকে সেদিন ভাল চোখে দেখেননি। তাঁরা ভাবতেন, জনগণ বুঝবেনা আমার এই আধ্যাত্মিক নৃত্য। কিন্তু যে জনগণ তাঁদের রুটি মাখনের জোগানদার তাঁদের রুচির উপর এই তো তাঁদের শ্রদ্ধা! অথচ আমি এর উল্টোটাই দেখেছি। জনগণ আমার এই নৃত্যকে গ্রহণ করেছে, তাঁদের জীবনের মহা কামনাকে আমি মূর্ত করে তুলেছি। সেইখানেই তো আমি সার্থক।

যাকগে, এবার আবার কাহিনীর খেই তুলে নিলাম হাতে।

সারাদিন কখনো নাচি, কখনো ভাবতে বসি নাচের পরিকল্পনা, কখনো বা আপন মনে গেয়ে উঠি। এমনি করে দিন কাটে। এবার সন্ধ্যার ছায়া নামে। কবি কাব্য-সংগ্রহ বগলে করে এসে দেখা দেন। পড়েন কত কবিতা। স্বপ্নমাখা তাঁর চোখ, মধুমাখা তাঁর স্বর। আসেন শিল্পী, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান। নয়তো বসে বসে দেখেন নাচ। দুই প্রেমিক কখনো একসঙ্গে আসেন না। দুজনের দুজনের প্রতি ঘৃণা।

কবি মাঝে মাঝে বলেন, ইসাডোরা, কি করে তুমি ঐ বুড়ো লোকটার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটালে! তোমার অসহ্য মনে হয় না? ওর কি পুঁজি আছে যে, ওর বক্‌বকানি তুমি সহ্য করে যাও?

আর শিল্পী বলেন, ঐ লোকটাকে কি করে তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে সইতে পারে? ওর তো কোনো সম্বল নেই!

দুজনের কথায়ই হাসি, উত্তর তো দিই না। দুজনের বন্ধুত্বেই আমি খুশি। বলতে পারিনে, কাকে বেশি ভালবাসি। কিন্তু এঁরা সপ্তাহের প্রেমিক, রবিবার দিনটা হ্যালির। তিনি আমাকে সেদিন স্টুডিয়োতে নিয়ে যান। শেরী আর কাফি মিশিয়ে অপূর্ব পানীয় তৈরী করেন। আমরা পান করি, গল্প করি। কখনো বা তাঁর মডেল হতে হয় আমাকে। হ্যালি আমার প্রেমিক-প্রবর, তাঁর তুলিতে আমার রূপ আরো যেন সুন্দর হয়ে ওঠে।

এমনি করে কাটে দিন।

নয়

কিন্তু টানা-পোরেন করে চলে সংসার। আয়ের চেয়ে ব্যয় ঢের-ঢের বেশি। তবু মনে আছে শান্তি। এমন শান্তি সানফ্রান্সিসকোয় পাইনি, নিউইয়র্কে পাইনি, পেলাম লণ্ডনে। লণ্ডন আমার শান্তির নীড়, আমার শান্তির স্বর্গভূমি।

তবু হাঁফিয়ে উঠল রেমণ্ড। বললে,

ইসাডোরা, আমি চলে যেতে চাই!

কোথায় যাবে? শুধাই।

রেমণ্ড বলে, আমার ভাল লাগে না এই লণ্ডন, এই টেমস, এই কুয়াশা—এ যেন বড় সাজানো—এখানে নেই বৈচিত্র্যময় জীবনের আমেজ। এ-জীবন গোঁড়ামির ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা—এখানে নেই উদ্দামতা। আমি লণ্ডন ছেড়ে যাব পারীতে। আমাকে ডাকছে সেইন নদী, ডাকছে এইফেল মিনার—ডাকছে মোপার্নাসের চঞ্চল জীবন। আমি যাব, যাব!

বলি, আমিও উদ্দাম রেমণ্ড, কিন্তু লণ্ডন যা দিয়েছে, কেউ তো আমাকে তা দেয়নি। আমি অর্থ না পাই, পেয়েছি স্বীকৃতি। রসিকমহল আমার বন্ধু। পারী কি আমাকে তা দেবে?

রেমণ্ড বলে, পারী দেবে, দেবে? পারী না দিলে কে দেবে? সে যে মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র—সংস্কৃতির লীলাভূমি। আমি আগে যাই, গিয়ে চিঠি দেব, তোমরা এসো!

সে একদিন চলে গেল।

বসন্ত এসেছে। বরফ গলে গেছে। কুয়াশা সরে গেছে। এখন ঊষার উদয় দেখা যায় পূব আকাশে, গোধূলি ঘনিয়ে আসে পশ্চিমে। নেই বৃষ্টি, নেই তমসাঘন দিন।

এমনি দিনে এল রেমণ্ডের তার। এসো, তোমরা চলে এসো!

রসিকসুজন, বন্ধু, তাঁদের ছাড়তে মায়া হয়। আছেন প্রেমিকেরা। তাঁদের ছাড়ি কি করে! তবু ডাকে সেইন, ডাকে এইফেল মিনার, ডাকে শাঁজেলিজে,

ডাকে মোমার্ত-মোপার্নাস। ডাকে বিপ্লবীনী পারী—কমিউনের পারী—হুগোর পারী—বালজাকের পারী।

ওখানে গেলে কি দেখবে তুমি ?

দেখবে সেই স্বাধীনতার লীলাভূমি। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়গান শুনবে কানে। কাফেতে কাফেতে দেখা পাবে বালজাক, হুগোর আত্মার। তাঁদেরই ওয়ারিশদের সঙ্গে। পরিচয় হবে, শুনবে তাঁদের কথা। তাছাড়া চিত্রজগতও তোমার সুমুখে খুলে যাবে। আছেন সেজানে, গ্যগ্যাঁ, ভানগক্, রেনোয়াঁ। আলো-আঁধারি মায়ায় ডুবে যাবে, কখনো বা বিন্দুর হেঁয়ালিতে ঘুরে মরবে। আকাশে বাতাসে তো সেখানে শিল্পের গুঞ্জন। সে-শিল্প চিরাচরিতের বৃত্তে ঘুরে মরে না, সে বিপ্লবের বিজয়কেতন উড়িয়ে দেয়। আমি বিপ্লবী তাই তো আমার স্বপ্ন পারী। আমি তো কান পেতে শুনতে পাই জোলার সেই উদাত্ত আহ্বান—

আমি নালিশ করি! শুনতে পাই মালার্মের কাব্যের গুঞ্জন—শুনতে পাই…

তবু যাওয়া হয় না। লণ্ডন আমাকে ঘিরে ঘিরে ধরে। বিপ্লবী-নায়িকারও মায়া!

আবার তার আসে—এসো, এসো!

শেষে মায়া কাটাতে হ'ল। বিদায় লণ্ডনের কুয়াশা, বিদায় প্রেমিকদল, বিদায় রসিকমহল!

বসন্ত দিনের এক সকালে এসে পৌছলাম সারবুর্গে। ফ্রান্স যেন এক বাগান। তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে রইলাম, চোখ ভরে দেখতে দেখতে চললাম।

সারবুর্গ থেকে পারী এমনি দেখতে দেখতেই এসে পৌছলাম।

স্টেশনে রেমণ্ড এসেছে। চেনা যায় না। চুল লম্বা, কানের উপর এসে পড়েছে। বেশভূষায়ও সে খাঁটি ফরাসী ভাবুক বনে গেছে। কোটের কলার ওল্টানো, টাইটিও মস্তবড়। আমরা তো ওর বেশভূষা দেখে অবাক। বললাম:

একি রেমণ্ড, এমন বেশভূষা কেন ?

রেমণ্ড মৃদু হেসে বললে, আমরা থাকি পারীর বাঁ ধারে, শিল্পী মহল্লায়, ওখানকার এই-ই রীতি। চল, দেখতে পাবে।

ওর সঙ্গে গিয়ে উঠলাম ওর ডেরায়। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুলাম মা-মেয়ে ও ভাই স্টুডিয়োর খোঁজে। রেমণ্ডের এখনো ফরাসীভাষা রপ্ত হয়নি। দুটি কথা সে জানে। চার্চের আতেলিয়ে—তার মানে স্টুডিয়ো ভাড়া চাই। কিন্তু আতেলিয়ে বলতে যে আবার ছোটখাটো দোকানও বোঝায়, এটা তার জানা নেই। তাই অনেক নাজেহাল হয়ে শেষে সন্ধ্যের দিকে এক স্টুডিয়ো মিলল। সাজানো-গোছানো স্টুডিয়ো—মাসিক ভাড়া মাত্র পঞ্চাশ ফ্রাঁ। আমরা খুবই খুশি—এক মাসের ভাড়া তখনি আগাম দিয়ে দিলাম।

সস্তা ভাড়ায় স্টুডিয়ো পেয়েই খুশি—কেন যে সস্তা, অতো খতিয়ে দেখতে যাই নি। সেটা টের পেলাম রাতে।

রাতে যেই বিছানায় গা ঢেলে দিয়েছি, অমনি যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। সব জিনিস ছত্রখান!

যথানকার যেটি গুছিয়ে রেখে শুয়েছি, আবার ভূমিকম্প। শেষে রেমণ্ড গেল ব্যাপারটা তদন্ত করতে। ফিরে এসে বললে, ঠিক আমাদের নিচেই আছে এক ছাপাখানা। ছাপাখানায় মেসিন যখন চলে, তখনি ভূমিকম্প হয় ঘরে। তাই ভাড়া এত সস্তা।

সারারাত এমনি ভূমিকম্পের ভিতরে কাটালাম। পারীর আনন্দ ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু তবু তো সস্তা ভাড়ার এই ঘর ছাড়া হ'ল না। পঞ্চাশ ফ্রাঁর তখন আমাদের কাছে ঢের দাম। তাই আমি বললাম:

ভালই হ'ল। মেসিনের আর সাগরের গর্জনে তো তফাত নেই। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবব ঢেউয়ের দোলায় দুলছি। এমন বাড়ি কার আছে!

মা হাসলেন, রেমণ্ড হাসল।

বহাল তবিয়তে সেই স্টুডিয়োতেই রয়ে গেলাম। দারোয়ানের ঘর থেকে আসে খাবার, সস্তায় খাই, সস্তায় থাকি।

ভোর পাঁচটায় উঠি, লুক্সেমবুর্গ বাগানে নাচ দিয়ে শুরু হয় দিন। তারপরে মাইল চারেক হেঁটে যাই ল্যুভর চিত্রশালায়। রেমণ্ড গ্রীক ফুলদানী থেকে নক্সা আঁকে, ভঙ্গিমাময় নর্তক-নর্তকী আঁকে। যেখানে গ্রীক ফুলদানী-গুলো থাকে সেই ঘরেই আমরা দিন কাটাই। ঘরে যে পাহারাওয়ালাটি থাকে সে তো সন্দেহের চোখেই দেখতে লাগল। একদিন জিজ্ঞেস করে বসল:

তোমরা এখানেই সারাদিন কাটাও কেন?

ভাবভঙ্গী দেখে ওর প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম। তারপরে ভাবভঙ্গী দিয়েই জানিয়ে দিলাম, আমরা গ্রীক নাচের ভঙ্গী আয়ত্ত করছি।

লোকটা আর কিছু বললে না। কি ভাবলে কে জানে।

গ্রীক স্থাপত্যের ঘরেই দিন কেটে যায়। রেমণ্ড নকল করে, আর আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি। কখনো বলি :

রেমণ্ড, দেখ, দেখ, ডাইনোসিয়াসের মূর্তি !

কখনো বা মা বলে উঠেন, দেখ, দেখ, মিডিয়া তার সন্তানদেব হত্যা করছে !

ফুলদানীর মূর্তিগুলি আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কবি কীটস্ এর কথা মনে হয়। ভস্মাধার দেখে তিনি তো লিখেছিলেন এক দীর্ঘ প্রশস্তি। অতীত দিনের গ্রীস যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তেমনি করে আমিও তাকে মূর্ত করে তুলব নৃত্যে।

তাই দিনের পর দিন এখানে কেটে যায়। বন্ধ হবার সময় বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসি।

টাকা নেই হাতে, বন্ধু নেই, কিন্তু কিছুতো চাইনে। ল্যুভর চিত্রশালা আমাদের স্বর্গ। এই স্বর্গ থেকে বিদায়ের ক্ষণ যখন আসে, স্বপ্নাবিষ্টের মতো পথে এসে দাঁড়াই। তারপর পথ চলি। মা প্রায়ই সঙ্গে থাকেন না। শুধু আমি আর রেমণ্ড।

এ-পথ—সে-পথ ঘুরে ঘুরে বাড়ির দিকে চলি। রাতের পারা চঞ্চল। পথে পথে মানুষ।

যত রাত বাড়ে, তত মানুষ বাড়ে। নৈশ অভিসারে বার হয় নাগর-নাগরীরা। সেই চঞ্চল ধারা আমাদের ছুঁয়ে যায়, হাতছানি দিয়ে ডাকে রহস্য—কিন্তু আমরা তো সেদিকে ফিরেও তাকাই নে। চঞ্চলা পারী, চঞ্চলতাই যাব চাবিকাঠি, সে-রহস্য মহল তো আমাদের ভোলাতে পারে না—আমারা চাই পারীর আত্মাকে জানতে, তার অন্তরের রহস্য আবিষ্কার করতে, চাইনে তো তার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা। সৌখিন ভ্রমণকারীরা ভাবে—পারীর আত্মা আছে নৈশ নগরীর গোপনে, আছে নিষিদ্ধ আনন্দে, যৌন দেবতার পায়ে বিকৃত আত্মনিবেদনে। কিন্তু কি ভুল ! পারীর আত্মা তো আছে তার চিত্রশালায়, জাদুঘরে, আছে বালজাক, হুগোর অমর রচনায়, আছে মালার্মে-বোদলেয়রের কবিতায়, আছে সেজান-গগ্যার চিত্র পটে ; আছে তার অপেরায়, তার থিয়েটারে। সে-আত্মা কি ফলিবার্জারে তুমি পাবে ? পাবে না তো ! তাই তো সৌখীন ভবঘুরে, তুমি পারীকে দেখ, কিন্তু তার আত্মাকে চিনতে পার না।

একদিন হালি এলেন পারীতে। তাঁর পারী-পরিক্রমায় সঙ্গী হলাম আমি। বিখ্যাত প্রদর্শনী তখন বসেছে। সারা সপ্তাহ সেখানে কাটে, রোববারে যাই ট্রেনে করে ভার্সাঙ্গি নয় তো সাঁ-জোরম্যাঁর অরণ্যে। অরণ্যে সবুজের কোলে তাঁরই জন্যে নাচি। সবুজ মায়ায় গ্রীসের আত্মাকে আহ্বান করি, আমার দেহের রক্তে রক্তে জাগে আহ্বান, দেহ সেই আহ্বানে সাড়া দেয়। দেখি, গ্রীসের আত্মা কখন পারীর আত্মার সঙ্গে মিশে গেছে।

একদিন তিনি প্রদর্শনীতে বিখ্যাত ভাস্কর রোদাঁর প্যাভিলিয়নে নিয়ে গেলেন। ভাস্কর রোদাঁর জীবনের সাধনা এখানে থরে থরে সাজানো। ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। এ যেন এক নয়া দুনিয়া। যে গাম্ভীর্য তাঁর মূর্তিতে ধরা পড়েছে, তার তুলনা কোথায়? তবু দেখি কত মানুষ আসে আর বলে, কোথায়, মূর্তির মাথা কোথায়? কেউ বা বলে, হাত কোথায়? একদিন এমনি ক'জন দর্শক মন্তব্য করছিল। তাঁদের মন্তব্যে ছিল ব্যঙ্গের হুল। তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম:

এগুলো অবিকল মূর্তি নয়, জীবনের প্রতীক—জীবনের আদর্শ।

ওরা বুঝলে না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রোদাঁকে বোঝে না, জনগণ, অথচ তিনি জনগণেরই শিল্পী। তিনি রূপ দেন তাদের আদর্শকে। কেন এমন হয়? ধনবাদী জগত যে আমাদের বিযুক্ত করে দিয়েছে ঐতিহ্য থেকে, আমাদের চোখ ঢেকে দিয়েছে সোনার হলুদ ছানিতে—তাই তো রোদাঁর শিল্প আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে।

প্রদর্শনী শেষ হ'ল, হালি চলে গেলেন। তাঁর ভাগ্নে চার্লস নুফার্ডের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে গেলেন। তিনি আমার শিক্ষার ভার নিলেন।

আর এক স্টুডিয়ো ভাড়া নিলাম। বেশ বড়ো-সড়ো, ভূমিকম্পের ভয়ও নেই। রেমণ্ড সেটাকে নিজের হাতে সাজালো। গ্যাসের আলোয় মুড়ে দিল ঝলমলে রাংতা। আলো যখন জ্বলে, বলে:

দেখ, দেখ, রোমের মশাল জ্বলে উঠল!

তার ওতেই আনন্দ, কিন্তু এতে যে বিল বাড়তে লাগল সেদিকে খেয়াল নেই। মা আবার তাঁর সঙ্গীত ঝালাতে বসলেন।

স্টুডিয়োয় শোবার ঘর নেই, স্নানের ঘর নেই। রেমণ্ড দক্ষ শিল্পী, সে কয়েকটা সিন্ধুক এনে শোবার ঘর তৈরী করে ফেলল। সিন্দুকের গায়ে কাগজ লাগিয়ে তাতে রং করে তাকে দিলে স্তম্ভের রূপ। এই সময়েই সে আবিষ্কার করলে তার প্রসিদ্ধ স্যাণ্ডাল।

সুফার্ড আমাদের নিত্য অতিথি। তিনি দু-একজন ফরাসী শিল্পীকে নিয়ে আসেন, তাঁদের সুমুখে নাচি। একদিন একজন শিল্পীর মারফতে নিমন্ত্রণ পেলাম। মাদাম দ্য সাঁত মারফোর বাড়িতে নাচতে হবে।

পিয়ানোয় বসে ছিলেন একজন অদ্ভুত মানুষ। দেখেই ভাল লাগল।

নাচ শুরু হ'ল, শেষও হ'ল। সেই অদ্ভুত মানুষটি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন।

ইনিই বিখ্যাত সুরকার মেশজার।

পারীর রসিকমহল আমাকে অবহেলা করলেন না। তাঁরা বরণ করে নিলেন। পারীর সড়ক খুলে গেল। কবি-সাহিত্যিক আন্দ্রে বোনিয়ে আমার বন্ধু। তিনিই সড়ক খুলে দিলেন।

শুধু কি তাই। তিনি আমাকে পড়াতে লাগলেন ফরাসী সাহিত্য। মলেয়ার-এর ব্যঙ্গ আমি উপভোগ করলাম, ফ্লবের-এর বিশ্লেষণী শক্তি আমার কাছে ধরা পড়ল, গতিয়েয়ে আর মোপাসাঁকে চিনলাম।

বিকেল হয়ে আসে রোজ। এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত। দরজা খুলে দিই। আন্দ্রে এসে ঢোকেন। যেন ভেসে আসেন। বগলে তাঁর নতুন বই বা মাসিক পত্র। তারপরে পড়া শুরু হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পড়ি, কখনো বা দোতলা বাসে চড়ে বেড়াতে যাই। চাঁদের আলোয় তাকিয়ে থাকি নোতরদামের গির্জার চূড়ার দিকে।

মার ওকে পছন্দ নয়। বলেন, কি দেখলি ওর ভেতরে? দেখতেও তো ভাল নয়। মোটা-মোটা ঠোঁট, কুতকুতে চোখ! এই বুঝি তোর আদর্শ প্রেমিক?

হেসে বলি, ওঁর কুতকুতে চোখই দেখলে, তার আলো তো দেখলে না!

মা আর কিছু বলেন না।

আমাদের বন্ধুত্ব অব্যাহতই আছে। রাতে দুজনে বেড়াতে বেরুই, আন্দ্রে বলে পারীর কথা, তার প্রতিটি পাথর তাঁর চেনা। রাত বাড়ে, ফিরে আসি। বাহুতে ওর আঙুলের মৃদু স্পর্শ অনুভব করি। কখনো বা ট্রেনে ওর সঙ্গে বেড়াতে যাই। কোথাও নেমে পড়ি। মাঝে মাঝে ওরই সুমুখে নাচি। ওরই জন্যে নাচি। বনদেবীর মতো নাচতে নাচতে গিয়ে লুকোই ঝোপের আড়ালে, হাতছানি দিয়ে ডাকি, হেসে উঠি। ঝরণার কলধ্বনি যেন উৎসারিত হয়ে পড়ে।

আন্দ্রে বলে সে কি লিখতে চায়। সে-বই তো বাজারে বিকোবে না, তবু সে-বই থাকবে, সাহিত্যের ইতিহাসের এক কোণে ঠাঁই হবে তার। কত কথাই

হয়। দুজনে দুজনের স্বপ্নের মোহানায় মিশে যাই। ফিরে আসি আবার পারীতে।

একদিন আন্দ্রে সকাল বেলায় এল। চোখ-মুখ বসে গেছে। নিঃশব্দে এসে ও আমাকে চুমু খেল।

বললাম, কি হয়েছে তোমার আন্দ্রে ?

ও ম্লান হাসি হাসল।

কত সাধ্য সাধনা করলাম, ও কিছু বলে না, শুধু ম্লান হাসি হাসে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ঠোঁট দুটি এগিয়ে দিলাম, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও আল্‌তো করে ছুঁয়ে দিল নিজের ঠোঁট দিয়ে। তার পর ঝড়ের মতো ছুটে চলে গেল।

চিৎকার করে উঠলাম, যেয়োনা, আন্দ্রে যেয়ো না !

কিন্তু সে চলে গেল।

তিন দিন তিন রাত কেটে গেল উৎকণ্ঠায়। তারপরে আবার ও এল। সেই পাংশু মুখ আর নেই, নেই সেই মৃত্যুময় দৃষ্টি। আবার সেই বুদ্ধিদীপ্ত আন্দ্রে, আমার প্রেমিক আন্দ্রে ! শুধালাম, কি হয়েছিল আন্দ্রে ?

ও উত্তর দিলে, আমার শত্রুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে এলাম ইসাডোরা। আমি আজ বিজয়ী বীর।

কত জিজ্ঞেস করলাম, আর কিছু বললে না, শুধু চুমোয় চুমোয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ও চলে গেল বিজয়ীর উল্লাসে।

ওর কথা কিছুই জানিনে। শুধু জানি, আন্দ্রে আসে রোজ বিকেলে, আমাকে ভালবাসে। ওর ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানতেও চাইনে। ও আমাকে ভালবাসে, আমার কাছে এই ওর পরিচয়। আর কিছু তো নয়।

একদিন এক চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, ও আমাকে বললে, ঐ যে ডান দিকের রাস্তাটা ওটা কি জান ?

মাথা নাড়লাম।

ওটা ভাগ্যের সড়ক।

আর আমরা যেখানে আছি, এই মোহানাকে কি বলবে ? জিজ্ঞেস করলাম।

একে বলব ভালবাসার নীড়, মৃদুস্বরে উত্তরে দিলে আন্দ্রে।

হেসে বললাম, আমি তো এখান থেকে নড়ব না! আমি ভাগ্য চাই না, শান্তি চাই না,—চাই—চাই—

ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। আমার প্রেম যেন চোখে ঝলমল করে উঠল। কিন্তু ও দেখি উঠে পড়ে বললে,

না, না, এখানে তো ঠাঁই নেই—আমাদের ঠাঁই নেই!

তার পরে সমুখের সোজা সড়ক ধরে চলতে লাগল।

হতাশ হয়ে ওর পেছু পেছু ছুটলাম। বললাম, কেন, কেন তুমি আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ আন্দ্রে?

কিন্তু ও নীরব। সারাপথ একটিও কথা বললে না, বাড়ির দোর গোড়ায় এসেও নিঃশব্দেই বিদায় নিলে।

বন্ধুত্ব তবু অটুট রইল। আন্দ্রে তেমনি আসে, আমার দিকে পূজারীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আমার স্বপ্ন তো সার্থক হয় না। একদিন তাকে রূপ দিতে চাইলাম। রেমণ্ড আর মাকে সন্ধ্যের সময় পাঠিয়ে দিলাম বাইরে। কিনে আনলাম এক বোতল শাম্পেন, আর অনেক ফুল। তারপরে প্রতীক্ষায় রইলাম।

দ্বারে তেমনি করাঘাত, ও যেন ভেসে এল ঘরে। ওকে হাত ধরে নিয়ে গেলাম টেবিলের কাছে। সেখানে দুখানি চেয়ার মুখোমুখী পাতা। একখানিতে ওকে বসিয়ে দিলাম, আর একখানিতে নিজে বসলাম। টেবিলে ফুল আর ফুল, আর শাম্পেন। আর দুটি গেলাস।

আমার বেশভূষাও আজ অসাধারণ, পরেছি মিহি কাপড়ের এক গাউন, চুলে গুঁজেছি গোলাপ।

ও তো অপ্রতিভ, বিস্মিত।

শাম্পেনের বোতল খুলে পূর্ণ করে দিলাম দুটি গেলাস। ওরটায় ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে দিলাম। তারপর নিজেরটা তুলে নিয়ে পান করলাম। ও একটু চুমুক দিয়েই গেলাস নামিয়ে রাখলে। এবার উঠে নাচতে শুরু করে দিলাম! ডাইনোসিয়াস্ বুঝি নিজে ও কল্পনা করতে পারেননি এ-নৃত্যের! দেহমন ঢেলে দেবার এ আবেদন, এ অপূর্ব—অদ্ভুত! কিন্তু একি! আমার প্রেমিক যে উঠে পড়ল!

বললাম, কি হ'ল আন্দ্রে?

যাই—আমার কাজ আছে।

হেসে উঠলাম, আজ কোনো কাজ নয়, আজ শুধু তুমি আর আমি!

ও মৃদুস্বরে বললে, না, না! আমাকে লিখতে হবে।

ও চলে গেল।

শুধু রইল টেবিলে ফুল, অনেক ফুল। আর শাম্পেনের বোতল। কেঁদে উঠলাম, লুটিয়ে পড়লাম।

আমার প্রেমিক এমনি করে চলে গেল? বসে বসে ভাবতে লাগলাম, এর কারণ। ও তো আমাকে ভালবাসে না। দলিত প্রেম প্রতিশোধ নিতে চাইলে। শপথ করলাম, ওকে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে দেব, তবে আমার নাম ইসাডোরা!

আন্দ্রে আবার পরের দিন বিকেলে তেমনি এল বই বগলে। সেদিন আরো দুজন বন্ধু ছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই গল্পে মেতে উঠলাম। ওকে দেখেও দেখলাম না।

ও খানিকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল।

পরের দিন এসে দেখল, আমি আর এক প্রেমিক জুটিয়ে নিয়েছি। এটি ওরই বন্ধু, কিন্তু চুম্বন-আলিঙ্গনে ওর চেয়ে ঢের পাকা—ঢের সাহসী।

আন্দ্রে রোজই আসে, রোজই দেখে প্রেমের অভিনয়। ওর খুদে চোখ দুটিতে বুঝি বুদ্ধির দীপ্তি মিলিয়ে যায়, ঈর্ষায় সবুজ হয়ে ওঠে। হয় তো আমারই এ মনের ভুল! হয়তো নয়।

একদিন বিকেলে কেউ নেই, এমন সময় ও এল। উদভ্রান্ত ওর চোখ দুটি। এসে বললে, আমার সঙ্গে আজ যাবে ইসাডোরা? না—আর কেউ তোমার অপেক্ষায় বসে আছে?

মনে মনে হাসলাম, আমার সময় তাহ'লে এল! মুখে বললাম, না, কেউ নেই! আজ আমি বড় নিঃসঙ্গ—বড় একা।

তাহলে চল না, কোথাও যাই?

কোথায় নিয়ে যাবে আন্দ্রে—ঐ নীলিম আকাশে? ঐ ছায়াপথে?

আন্দ্রে গম্ভীর, শুধু বললে, চল!

আমি তো তৈরী।

এক পানশালায় গিয়ে উঠলাম, সেখানে শাম্পেনের বোতল খোলা হ'ল নিরালা-নিভৃতে। আন্দ্রে আজ দেবতা, শাম্পেনে তার বিতৃষ্ণা নেই। দুজনে পান করলাম, বিভোর হয়ে গেলাম নেশায়!

বেরিয়ে পথে এসে বললাম, বাড়ি ফিরব না। এমন রাতে শুধু তুমি আর আমি। আমাকে নিয়ে চল আন্দ্রে, শুধু তুমি আর আমি থাকব—আর কেউ নয়।

আন্দ্রে আমার হাত ধরে চলল।

এক হোটেলে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে কামরা ভাড়া নিলাম।

আমি তরুণী, শিরায় শিরায় আমার রঙীন নেশা। বললাম:

আন্দ্রে, দাও, দাও, আমাকে ভালবাসা দাও! ভালবাসার জন্য আমি উন্মুখ।

আন্দ্রে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সোহাগের ঝড় বয়ে গেল। মনে হ'ল, আমার উন্মুখ ভালবাসা এবার তৃপ্ত হবে। শিরায় শিরায় আনন্দের ঢেউ জাগছে, দেহ আমার স্নান করছে সেই ধারায়। আমি যেন ফুল, দল মেলে দিয়েছি, ভালবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে আছি। তাইত খসে পড়েছে পাপঁড়ির মতো আমার বেশ, তাইতো এখন আমি আদিম নারী। আদিম পুরুষের কামনা আমাকে আকুল করে তুলেছে। মিরোস্‌কী যা দিতে পারেনি, তা দেবে আমাকে আন্দ্রে। আমার প্রথম যৌবনকে সে ধন্য করবে···

কিন্তু একি হোল?

হঠাৎ ও লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের তলায়, আবেগরুদ্ধ স্বরে বলে উঠল:

আমাকে ক্ষমা কর ইসাডোরা, আমি তোমার ঐ পবিত্র দেহকে কামনার স্পর্শে অপবিত্র করে দিতে চেয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর! তুমি চির পবিত্র! তোমার ঐ নগ্নরূপ তো আমাকে বাধা দিলে। ওখানে আমি দেখতে পেলাম, কুমারীর শুচি-শুভ্রতা। তুমি পোষাক পরে নাও, চল।

আর্তনাদ করে উঠলাল, আন্দ্রে, তুমি আর আমি কি হারাতে বসেছি, আমরা জানি না। না, না, তুমি কাছে এস আন্দ্রে, আমাকে ধন্য কর! জীবনের বেদনাকে, যৌবনের বেদনাকে তৃপ্তি দাও!

কিন্তু ও শুনলে না আমার আর্তনাদ, আমার করুণ মিনতি বৃথা হ'ল। বেশ খসে পড়েছিল, আবার সেই খোলসটাকে দেহে এঁটে নিলাম। আমাকে নিয়ে ও বেরিয়ে এল।

পথে গাড়িতে শুধু অনুতাপ আর দীর্ঘশ্বাস। ইসাডোরা—এ আমি কি করতে বসেছিলাম!

সারা পথ চুপ করে শুনছিলাম ওর কথা। ভাবছিলাম—কি সে পাপ, যা সে করতে বসেছিল?

ও আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল

আর এল না।

বহুদিন পরে দেখা হয়েছিল। তখন জিজ্ঞেস করেছি, আন্দ্রে সেই পাপের কথাটা তো বললে না?

ও উত্তর দিয়েছিল ; আমাকে ক্ষমা করেছ তো ইসাডোরা ?

এমনি করেই আমার যৌবনের অভিযান শুরু হ'ল। ভালবাসার সীমারেখার কাছে এসে হাজির হই, সেখানে ঢুকতে চাই, কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি। মন অমনি চেঁচিয়ে ওঠে, এ পাপ, পাপ ! আবার বিদ্রোহও দেখা দেয়। ছুটে যাই। কিন্তু আন্দ্রের স্বর তো ভুলতে পারিনে। সে বলে, ইসাডোরা এ আমি কি করতে বসেছিলাম। তাই ভালবাসার স্বর্গ-কামনা ছেড়ে আমার শিল্পের স্বর্গ রচনা করতে বসলাম। এখানেও আছে আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ—সে আনন্দে নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দিলাম।

দশ

পারীর রসিক মহল আমাকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখলেন না। আমার প্রেম ব্যর্থতা নিয়ে এল, কিন্তু নৃত্যে আমি হলাম বিজয়িনী। নৃত্যে আত্মার পরম বিকাশ দেখাব এই ছিল আমার পণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, হাত দু'খানি বুকের উপর জড়ো করা থাকত। সে এক ধ্যান। ধ্যান ভাঙাতে কেউ পারত না। মা তো দেখে ভয়ই পেতেন। তিনি তো বুঝতেন না, সমস্ত গতির উৎস আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, চাইছি নৃত্যের জন্য সেই দিব্য দৃষ্টি—যে-দৃষ্টি আমার সম্মুখে প্রকাশ করে দেবে জীবনের যত ছন্দ, যত মুদ্রা, যত লাস্য। এমনি ধ্যান করতে করতে একদিন আবিষ্কার করলাম—ছন্দের উৎস, গতির উৎস। আমার ছাত্রীদের ডেকে বললাম,

যে গান পৃথিবীতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, সে-গান তোমাদের আত্মার গান। গান-শুনে কি আত্মার গভীরে স্পন্দন জেগে ওঠে না, বাহু কি উঠে আসে না উর্ধে, মুখ কি উর্ধমুখী হয়ে থাকে না—মনে কি হয় না তোমরা আলোর দিকে ছুটে চলেছ?

ওরা বুঝতে পারল—এই যে নিজেকে জাগানো, নৃত্যের এই তো প্রথম কথা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ওরা ঠিক বুঝে নিলে। তাইত ওরা বড় বড় অপেরার দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলে: ওদের আত্মার ছন্দ দেহের ছন্দকে ফুটিয়ে তুলল, সেই ছন্দ আবার অনুভূতি হয়ে সঞ্চারিত হ'ল দর্শক-হৃদয়ে। সার্থক হ'ল আমার শিক্ষাদান, সার্থক হলাম আমি। কিন্তু ওরা তো বড় হয়ে ঐ আত্মার ছন্দ হারিয়ে ফেললে। আমাদের রুক্ষ বাস্তব ওদের ঐ জাগরণের বাধা হয়ে দাঁড়াল। ওরা হারাল অনুপ্রেরণা!

কিন্তু আমি তো হারাইনি। কেন হারাইনি জান? আমার পরিবেশ, আমার জীবন—আত্মার এই জাগরণে চিরদিন আমাকে সাহায্য করেছে। তাই তো পৃথিবীকে আমার ভাল লাগেনি, ভাল লাগেনি পৃথিবীর প্রেম—আমি আত্মার শক্তির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি।

তাই আমার নৃত্যে তো কখনো সঙ্গীতের সঙ্গতের দরকার হয় নি, এক অদৃশ্য সঙ্গীত তার সঙ্গে সঙ্গত করেছে। আমার স্টুডিয়োর উঁচু ছাদ, পর্দাহীন জানালা তাকে সাহায্য করেছে। সেখান থেকে দেখতে পেয়েছি উন্মুক্ত আকাশ—দেখেছি চাঁদ-তারাদল। আবার কখনো আকাশ ঢেকে গেছে বর্ষার বর্ষণ মুখর মেঘে, জল

ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে মেঝেয়—এসেছে শীতের কুয়াশা—আবার গ্রীষ্মের দাবদাহও দেখেছি। এরা সবাই মিলে সঙ্গত করেছে আমার নাচের সঙ্গে, আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই জনগণের আমাকে ভাল লেগেছে, যাঁরা সত্যিকারের রসিক তাঁরাও কদর করেছেন—কিন্তু ভালবাসে নি শিল্প নিয়ে যারা নাগর-বৃত্তি করে সেই স্নবের দল।

পারীতে আমি পেলাম জনগণকে, পেলাম সমজদারদের, স্নবরাও যে ভিড় না করল এমন নয়। এক বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ কলারসিক রায় দিলেন,

ইসাডোরা গ্রীকশিল্পের মাধ্যমে নিজের নৃত্যকলাকে রূপ দেন! কিন্তু গ্রীসের অনুকরণ এ নয়, তিনি নিজের ছন্দে ছন্দময়ী। গ্রীস তাঁর ভাবনা, আদর্শ, কিন্তু নিজের আত্মার নিয়মই তিনি মানেন। তিনি যে আনন্দের অনুসন্ধানী সে তাঁর নিজস্ব। তিনি আশাময়ী, আমাদের ভিতরে আশা উদ্দীপ্ত করে তোলেন। ইসাডোরার নাচ তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।······

নাম পেলাম, যশ পেলাম, কিন্তু অর্থের দুর্দশা ঘুচল না। স্টুডিয়ো ভাড়া ঠিক ঠিক দিতে পারিনে, শীতের দিনে কয়লা থাকে না।—চারিদিকে অভাব আর অভাব। কিন্তু তবু আমার সাধনা তো চলেছে। আত্মা জোগায় অনুপ্রেরণা, আর আমি নাচি। আত্মা দলে দলে বিকশিত হয়ে ওঠে।

একদিন স্টুডিয়োতে একজন ভদ্রলোক এলেন। দামী পোষাক তাঁর পরণে, হাতে হীরের আংটি। তিনি এসেই বললেন,

আমি বার্লিন থেকে এসেছি। আপনার খালি পায়ে নাচার কথা শুনেছি। (আমার নাচের এই বর্ণনা শুনে মনে মনে শিউরে উঠলাম।) আমি বড় একটা থিয়েটার থেকে আপনার সঙ্গে চুক্তি করতে এসেছি।

ভদ্রলোক হাত ঘসলেন বার বার, মুখ চোখে অপূর্ব দীপ্তি ফুটিয়ে তুললেন—এমন ভাবখানটা যেন ভাগ্য বিধাতা এসেছেন আমার! কিন্তু আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। নিজেকে বহু কষ্টে সংযত করে বললাম,

ধন্যবাদ, কিন্তু থিয়েটারে তো আমি নাচিনে। আমার শিল্প থিয়েটারের জন্য নয়।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমাদের তেমন থিয়েটার নয়। এখানে কে না নেচেছেন, কে না বাজিয়েছেন! টাকাও যথেষ্ট পাবেন। এখন আমরা রাত-

পিছু পাঁচশো মার্ক (জার্মান মুদ্রা) দিচ্ছি, পরে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আপনার জন্যে ম্যাস। প্রচার করব দেখবেন--লিখব—পৃথিবীর একমাত্র নগ্নপদ নর্তকী। আপনি নিশ্চয়ই রাজী ?

আমি রেগে উঠে বললাম, নিশ্চয়ই না! চুক্তি আমি করব না!

এত অসম্ভব, অসম্ভব! আমি 'না' জবাব শুনে চলে যেতে রাজী নই। আমি চুক্তিপত্র তৈরী করে এনেছি।

না, চুক্তি হবে না! স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম। আমার নাচ আপনাদের সঙ্গীত-শালার জন্য নয়। যদি সম্ভব হয় তো একদিন বার্লিনের রসিকমণ্ডলের কাছে তা আমি দেখাব—কিন্তু কসরতের আসরে কখনো নয়। না. না, যত টাকায় চুক্তি করতে চান না কেন, আমি নারাজ। আপনি আসুন!

ভদ্রলোক স্টুডিয়োর চারিদিকে তাকালেন। আসবাবপত্র নেই ঘরে। আমাদের পরণে নোংরা ছেঁড়া পোষাক। তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না আমার কথা। বললেন, এত তাড়া কি, আপনি ভেবে দেখুন, কাল আবার আসব।

পরের দিন এলেন, তার পরদিনও এলেন। কিন্তু আমার সেই সাফ জবাব—না, পারব না।

শেষে বললেন, রাত পিছু হাজার মার্ক দেব, আপনি রাজী হয়ে যান!

হাজার কেন, লাখো মার্ক দিলেও না।

ভদ্রলোক চটে উঠলেন, আপনি কি এমন নাচিয়ে যে, এমন প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন!

চিৎকার করে বললাম, সস্তা অপেরার মালিক আমার নাচ বুঝতে বুঝতে পারবে না। আমি এসেছি য়ুরোপে নাচের ভিতর দিয়ে এক নতুন ধর্ম শেখাতে। এ ধর্ম চির যৌবনের ধর্ম—এ ধর্ম বিপ্লব। তাকে সস্তা নাট্যশালার হাল্‌কা পরিবেশে পরিবেশন করতে আমি পারব না। আমি মানুষকে শিক্ষা দেব সৌন্দর্য, মানুষের দেহের পবিত্রতার কথা বলব, আমার এ-নাচ তো ভুরিভোজাদের জন্য নয়। আপনি চলে যান, এখানে আর আসবেন না!

তবু একবার ভেবে দেখুন, চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক, প্রতিদিন হাজার মার্ক তো সোজা কথা নয়!

বলেছি-তো, দৃঢ় স্বরে জানালাম, হাজার মার্ক তো দূরের কথা, লাখো মার্ক হলেও না। আমার আদর্শ তো আপনাদের সঙ্গে মিলবে না। একদিন বার্লিনে আমি যাব, মহাকবি গ্যায়টে, মহাসঙ্গীতবিদ ভাগ্‌নারের দেশের মানুষকে দেখাব

আমার নৃত্য—হাজার মার্কে সে-নৃত্য দেখা চলবে না ; তার জন্যে জার্মান জাতিকে অনেক বেশি দিতে হবে।

ভদ্রলোক ক্ষুন্নমনে চলে গেলেন।

আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল তিন বছর পরে। সেদিন বার্লিনের রসিকজন আমাকে নৃত্যের রাণী বলে সমাদর জানিয়েছিলেন। আর একরাতের টিকিট বিক্রি হয়েছিল পঁচিশ হাজার মার্কেরও উপরে। সেদিন আবার ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,

আমার ভুল হয়েছিল, আমি বুঝতে পারিনি।

বন্ধুভাবে হেসে উত্তর দিয়েছিলাম, সবাই কি বুঝতে পারে। অনুভূতি না থাকলে কি করে বুঝবে?

ভদ্রলোক হাসিমুখেই স্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু সে তো তিন বছর পরের কথা। তিন বছরের আগেকার কথাই বলি। প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হ'ল, এদিকে চারিদিকে দেনা। শুধু নাম ধুয়ে তো খাওয়া চলে না। কিন্তু আদর্শ হারালাম না। এরই মধ্যে রেমণ্ড একদিন এক দলের সঙ্গে আমেরিকায় চলে গেল।

এখন শুধু মা আর আমি। মার অসুখ, স্টুডিয়োও রইল, একটা ছোট খাটো হোটেলে এসে বাসাও বাঁধলাম। এখানে আমাদের পাশের ঘরেই থাকতেন একজোড়া স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রীটির বয়েস ত্রিশ, বড় বড় তাঁর চোখ দুটি—এমন চোখ আমি দেখিনি! মানুষকে যেন চুম্বকের মতোই টানে। সে চোখে আছে উদগ্র কামনা, আবার নম্রতায় মেদুর হতেও সে জানে। প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে তাঁর ভালবাসার আবেদন ফুটে ওঠে। ওর চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, এক আগ্নেয়গিরির গহ্বরে প্রবেশ করেছি।

স্বামী তো বেঁটেখাটো, দুটি তুলি-আঁকা ভ্রূ, তরুণ মুখ, অথচ ক্লান্তি তাতে মাখানো। ওদের স্বামী-স্ত্রীকে কখনো একা দেখিনি, সবসময়েই থাকে একজন সঙ্গী। সবসময়েই ওরা আলাপে মগ্ন। ওদের যেন ক্লান্তি নেই, একঘেয়েমিতেও হাঁপিয়ে ওঠে না। নিজেদের অন্তরের দীপ্তিতেই ওরা উজ্জ্বল, অন্তরের সৌন্দর্যেই ওরা পাগল। স্বামীটির অন্তরের বুদ্ধির দীপ্তি তাকে সুন্দর করে তুলেছে, স্ত্রীর কামনার দীপ্তি তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আর তৃতীয় মানুষটির মুখে কিসের দীপ্তি বলতে পারব না। কেমন এক নিবন্ত আলো ওর মুখে ঝলসে ওঠে এ আলো ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা।

একদিন স্ত্রীটি আলাপ করতে এল স্বামী আর তৃতীয় পুরুষটিকে নিয়ে।

এই আঁবি বাতাইল, এই জঁা লোরেইন, আমি বার্থা বেডী। যদি একদিন আপনার স্টুডিয়োতে যাই, নাচ দেখাবেন তো?

বার্থা বেডী অপূর্ব সুন্দরী। তখন নারীর রুচি এমন উন্নত ছিল না, সেখানে সৌন্দর্যের তত্ত্ব এসে ঢোকেনি, কিন্তু তার রুচিবোধ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বাতাইল কবি। একদিন কোন সভায় বাতাইলের কবিতা পড়বে বার্থা, সে সেজে এল অপূর্ব সাজে। গাউনের রং তো অপূর্ব, চুলে লাল ফুলের মালা জড়িয়েছে।

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও বললে, কি দেখছো ইসাডোরা?

দেখছি—আর বাতাইলের উপর হিংসে হচ্ছে। কোন কবির মানসসুন্দরী তো এমন সুন্দর নয়।

আলাপ হবার পর থেকেই ওদের সঙ্গে ভাব জমে গেল! রোজই ওরা স্টুডিয়োতে আসে, কত আলাপ হয়। কোনদিন বা নাচি। বাতাইল একদিন পড়ে শোনাল তার কবিতা। আমি লেখাপড়া তেমন শিখিনি, কিন্তু সেদিন পারীর শিল্পী-সাহিত্যিক মহলের মনের চাবিকাঠি পেয়ে গেলাম। ইতিহাসের গরিমাময় যুগে আথেন্স ছিলেন শিল্পীর জননী, আজ তাঁর স্থান পূর্ণ করছেন পারী।

এই পারীতেই আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম।

রোদাঁর হাতের কাজ দেখে অবাক হয়েছিলাম। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁর স্টুডিয়োতে। এর মধ্যে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, ছিল না অন্য কোন কামনা।

রোদাঁ মানুষটি বেঁটে, কিন্তু শরীরখানা মজবুত। মাথার চুল কদম-ছাঁট, কিন্তু মুখে লম্বা দাড়ি।

অতি বিনয়ের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলাম।

তিনি আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখালেন নিজের কাজ। বড় আদরের জিনিস তাঁর নিজের এই সৃষ্টি; দেখাচ্ছেন, হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মনে হ'ল, ওঁর হাতের ছোঁয়ায় কঠিন মর্মর যেন গলে যাচ্ছে, যেন অন্য রূপ নেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। তিনি এবার এসে বসলেন। একটা কাদার তাল তুলে নিলেন হাতে, হাতের চেটোয় পিষতে লাগলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। এক জ্বলন্ত হাপরের মতো উষ্ণতা যেন তাঁর নিঃশ্বাসে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গড়ে উঠল নারীর একখানি

পরিণত বুক। তাঁর হাতের আঙুলের জাদু-স্পর্শে যেন তাতে স্পন্দন জেগে উঠল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই তো প্রকৃত শিল্পী! নারীর রূপ তার মুখে নয়, তার পরিণত বক্ষে—সেই বক্ষকে তিনি কাদার তাল দিয়ে রূপ দিলেন। মাথা নেই, দেহ নেই—শুধু বুকখানি; অথচ তাতে তো রূপ যেন আরো ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। দেহের অন্য অঙ্গগুলি থাকলে এ ইঙ্গিতময়তা তো লুপ্ত হয়ে যেত। সে হোত বাজারের শিল্পীর কাজ, আনাড়ি হাতের কাজ।

অনেকক্ষণ আলাপ হ'ল। তিনি আমাকে হঠাৎ বলে উঠলেন, চল!

কোথায়? চোখ তুলে তাকালাম।

তোমার নাচ দেখব, স্টুডিয়োতে চল।

একটা গাড়ি ডেকে আমাকে নিয়ে উঠে বসলেন।

স্টুডিয়োতে তার সম্মুখে নাচলাম গ্রীক কবি থিয়োক্রিটাসের এক গাথা। আন্দ্রে সে গাথা অনুবাদ করে আমাকে শুনিয়েছিল।

একো। সে বনে বনে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাকে ভালবাসলেন দেবরাজ জুপিটার। কিন্তু দেবতার রাণী জুনো সেকথা জেনে ফেললেন। তাঁর কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। একো হ'ল শুধু প্রতিধ্বনি। সেই প্রতিধ্বনি ভালবাসল এক অনুপম তরুণকে—নাম তার নার্সিসাস।

কিন্তু নার্সিসাস নিজেকেই শুধু ভালবাসে, তাই তাকে প্রত্যাখ্যান করলে। একো কেঁদে সারা। বিরহে শুকিয়ে গেল, একদিন আর তার কায়া রইল না। সে হ'ল ছায়া। সেই ছায়া আজও আছে। মানুষের কথার প্রতিধ্বনি তোলে।

ওগো একো, জুপিটারের প্রেমিকা একো—কোথায় তোমার দেখা পাব?

দেখা কি পাব ডেইজি ফুলের বনে?

না, পর্বতের নীল ছায়ার আড়ালে? না কলনাদী নদীর বাঁকে?

তুমি কি সত্য—না—স্বপ্ন—একো?

স্বপ্নের বন্দীশালা ভেঙে কি তুমি এসে দেখা দেবে না?

নাচের শেষে রোদাঁকে বলতে লাগলাম আমার আদর্শের কথা। কিন্তু চেয়ে দেখি, তিনি আনমনা হয়ে গেছেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন। চোখে দীপ্তি, সে দীপ্তি সৃষ্টির আনন্দে উজ্জ্বল, মহান। যখন তিনি আমাকে তাঁর কীর্তি দেখাচ্ছিলেন, তখন অমনি দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তার চোখে। তিনি বসেছিলেন। এবার আমার কাছে ছুটে এলেন। আমার কাঁধের উপর হাত রাখলেন, হাত

নেমে এল আমার বুকে, আমার বাহুতে। তারপরে নিতম্বের রেখায় রেখায়, উরুতে, পায়ের পাতায়। যেন সমস্ত দেহকে দলছেন, পিষছেন, মাখছেন, কাদার তালের মতো ছানছেন। তাঁর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার দেহে এসে পড়তে লাগল, পুড়ে পুড়ে যেতে লাগলাম, গলে গলে যেতে লাগলাম। মনে হ'ল, নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি—আর তো কিছু জানিনা। ইন্দ্রিয়ের পরম মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে এবার। হয়তো আসতো, কিন্তু ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি তাঁর স্পর্শের বাইরে চলে গেলাম।

রোদাঁ দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখের দীপ্তি তাঁর নিবে এল। তারপরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। রোদাঁ কি আমার জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ?

না।

রোদাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েই উঠল। তিনি হলেন আমার বন্ধু, আমার গুরু।

আর একজন শিল্পীর সঙ্গেও পরিচয় হ'ল। তিনি বিখ্যাত শিল্পী ইউজেন ক্যারিয়ে। তিনি আমাকে তাঁর স্টুডিয়োতে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে এলাম।

ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে বসে শিল্পী আঁকছেন ছবি, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আত্মা যেন ঝলমল করে উঠছে চোখে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন তাঁর স্ত্রী আর বন্ধু-বান্ধব। তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন,

এই আমাদের ইসাডোরা, মার্কিন দেশের বিপ্লবী নায়িকা।

এগারো

বিখ্যাত নর্তকী ও গায়িকা লয় ফুলের একদিন এসে দেখা দিলেন। আপনারা ওঁকে চেনেন না? পাতা ঢাকা নিকুঞ্জে শুনেছেন নাইটিঙ্গেলের গান—কবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভেবেছেন, এ বুঝি এক অমৃতময় বিষ—ইন্দ্রিয়কে বিবশ করে দেয়—কিন্তু ফুলেরের গান কি শুনেছেন? তিনি মানুষের মনে যে-কোনো ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন—তিনি বুঝি য়ুরোপের আত্মার নেত্রী। তিনি এসেই বললেন,

আমি বার্লিন যাচ্ছি ইসাডোরা, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

রাজী না হয়ে উপায় নেই। তাই রাজী হলাম।

আন্দ্রে খবর পেয়ে ছুটে এল। সেই রাতের পর সে এসেছে খুব কমই। এলেও নীরবে বসে থেকে চলে গেছে। কখনো মামুলি দু-একটি কথা ছাড়া বলে নি। সেদিন সে এসে বললে,

ইসাডোরা, তুমি বার্লিন চলেছ, আবার কবে দেখা হবে কে জানে! চল, একটু ঘুরে আসি!

ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ন্যোতরদাম গীর্জার ওখানে আমাদের বিদায়ের পালা জমে উঠল। প্রেমিকরা যেমন বলে থাকে, তেমনি গাঢ়স্বরে ও বললে,

ইসাডোরা, ভুলে যাবে না তো?

ওকে চুমু খেয়ে বললাম, প্রেমিক আন্দ্রেকে ভুলতে পারি, কিন্তু কবি আন্দ্রেকে কখনো ভুলব না।

আন্দ্রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

তারপর স্টেশনে।

সেখানেও চুম্বনের পালা। কিন্তু দেখলাম, ওর পরকলার আড়ালে যেন কি এক উদ্বেগ ধিকিধিকি জ্বলছে।

কিন্তু উদ্বেগ আমার কেউ নয়, আমার যাত্রাপথে দীর্ঘশ্বাস তো পাথেয় নয়। আমার যাত্রাপথ আলোয় সমুজ্জ্বল, সেখানে নেই আঁধারের ঠাই। তাই আন্দ্রের দীর্ঘনিঃশ্বাস আর ব্যথাতুর দৃষ্টি আমার মনে ছায়া ফেলল না, গাড়িতে উঠে বসলাম উচ্ছল মনে।

বার্লিনে এসে পৌছলাম। লয় ফুলের-এর অতিথি আমি এখন, আমার প্রতি তাঁর অসীম দরদ, সব সময়েই সজাগ দৃষ্টি—যেন আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে

না হয়। সেরা হোটেলে তুললেন, সেরা খাওয়া-দাওয়া পেলাম। রাতে তিনি নাচলেন, অপূর্ব নাচ, অপূর্ব গান।

একবার বিরামের সময় সাজঘরে এসে দেখি তিনি শুয়ে গোঙাচ্ছেন। শুধালাম কি হয়েছে ?

তিনি ম্লান হেসে বললেন, তুমি আইস ব্যাগটা নিয়ে এসে শিরদাঁড়ায় চেপে ধর তো, ওতে ব্যথা কমবে।

বললাম, তাহলে নাচছেন কেন ?

আমার যশ কি সে কথা শুনবে, শুনবে কি আমার এই বিলাসী জীবনযাত্রা ? আমি নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে একদিন কবরের দেশে চলে যাব—সেই দিন নেব চির বিশ্রাম—তার আগে নয়।

একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন, যাও গিয়ে বস, আবার লয় ফুলের আসছেন। টেরও পাবে না তাঁর দেহের এই বিকলতা। এই তো যশ বন্ধু, এই তো মহিমা !

আমি গিয়ে বক্সে বসলাম। আবার সেই দীপ্ত শিখার নর্তন, মুখে সেই জ্যোতি, দেহ যেন অগ্নিশিখা। কে বলবে কয়েক মুহূর্ত আগে ইনি শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছিলেন ! আমাদের চোখের সুমুখে তিনি বহুবর্ণী অর্কিডে নিজেকে রূপান্তরিত করলেন। আবার সমুদ্রের অতলের ফুল ফুটে উঠল, ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে ফুল। যেন এক ইন্দ্রজাল। কিন্তু পেশাদার জাদুকরের জাদুদণ্ড তো নেই। না, না, জাদুদণ্ড আছে, সে তাঁর আত্মা। সেই আত্মা ব্যথাতুর দেহকে নমনীয় কোমল ফুলের রূপ দিয়েছে। লয় ফুলের-এর এমন বহু বর্ণা সুষমা নিয়ে আর কোনো শিল্পী তো নৃত্যজগতে এসে দেখা দেন নি। তিনি তো য়ুরোপের আলোর উৎস, আলোর দেবী।

হোটেলে তাঁরই কথা ভাবতে ভাবতে গিয়ে পৌছলাম, রাতও কাটল আলোর দেবীর রূপে বিভোর হয়ে।

পরদিন সকালে উঠে বার্লিন দেখতে বেরুলাম। গ্রীস্ আমার মনভূমি জুড়ে আছে। আমি সেই গ্রীসের আত্মার ধ্বনি শুনতে পাই আমার কানে। শুনি ভায়োলেটকেশী সাফোর আহ্বান। শুনি তাঁর প্রেমার্ত হৃদয়ের রক্তমাখা সুর। আবার ডাইনোসিয়াসের মন্দিরে গ্রীসের আত্মা দুলে দুলে ওঠে ছন্দে—তাও যেন দেখি। দেখি ফিদিয়াসের গড়া সৌন্দর্য—পার্থেনন আমাকে টানে, টানে ডেলফির মন্দির। আমি যে গ্রীক, আমি জাতিতে আইরিশ হলেও মনে মনে গ্রীক।

গ্রীস আমার দেশ। এ দেশ আনাক্রিয়নের গানে মুখর, এ দেশ লিওনিদাসের বীরত্বে মহান। আজ বার্লিনের পথে নেমে উচ্চচূড় প্রাসাদ দেখে মনে হল, আমার স্বপ্নের দেশে বুঝি এসেছি। বলে উঠলাম,

এই তো গ্রীস—আমার গ্রীস!

কিন্তু ভুল শীগ্‌গীরই ভাঙল। গ্রীসের অনুকৃতি আছে, কিন্তু গ্রীসের প্রাণ নেই। না, বার্লিন গ্রীস নয়। যে গ্রীসকে বার্লিন ফুটিয়ে তুলেছে তার স্থাপত্যে, সে পণ্ডিতের শুষ্ক পুঁথির পাতার গ্রীস—আমার গ্রীস নয়। তাই ত বার্লিন আমার মনকে বিরূপ করে তুলল। ক'দিন পরেই চললাম লাইপজিগে। লয় ফুলের-এর ভারী ভারী ট্রাঙ্কগুলোর সঙ্গে আমার ছোট ট্রাঙ্কটাও বার্লিনের হোটেলে পড়ে রইল।

লয় ফুলেরকে শুধালাম। তিনি নীরব। অনেক পরে শুনেছিলাম, লয় ফুলের ঋণজালে জড়িত। সেই ঋণের দায়েই ট্রাঙ্কগুলো রেখে আসতে হ'ল।

লাইপজিগেও নাচলেন গাইলেন লয় ফুলের। আমি মুগ্ধ, বিস্মিত। তিনি যেন নাচের সময় তরল হয়ে যান। যেন স্রোতের মত তরল। তিনি যেন বহু বর্ণী হয়ে দীপ্ত হয়ে ওঠেন, আগুনের শিখা হয়ে লক্‌লক্‌ করে ওঠেন। তারপরে সেই স্রোত ছুটে চলে অসীমের পানে।

লাইপজিগ ছেড়ে আমরা এলাম মিউনিকে। মিউনিক থেকে ভিয়েনায়। অর্থের প্রচণ্ড অভাব। বসে বসে ভাবি, কেন পারী ছেড়ে এলাম। এখানে তো শুধু ফুলের-এর সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই দিন কাটছে।

ভিয়েনায় হোটেলে ফুলের এর সঙ্গিনী নার্সির সঙ্গে আমাকে থাকতে দেওয়া হ'ল। মেয়েটি ফুলেরকে ভালবাসে। অভাবের সময় সেই-ই টাকাকড়ি জোগাড় করে আনে। নাচের পরে এসে শুয়েছি, অঘোরে ঘুমুচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। চোখ মেলে তাকাতেই ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। চারটে বেজেছে! নার্সি মোমবাতি জ্বালিয়েছে। সে এবার আমার বিছানার কাছে এসে বললে,

ঈশ্বর আমাকে হুকুম দিয়েছেন, তোমাকে টুঁটি টিপে মারতে হবে।

বলে কি! পাগল হ'য়ে গেল নাকি মেয়েটা? কিন্তু পাগলকে ঘাঁটাতে নেই। তাই নিজেকে সংযত করে বললাম,

বেশ তো, ঈশ্বরের যখন আদেশ, মানতেই হবে। কিন্তু প্রার্থনা করবার সময় দেবে তো?

ও রাজী। বিছানার কাছে ছোট্ট টেবিল, সেখানে মোমখানি রাখল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম, ধীরে ধীরে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম, তার পরে দরজা খুলে তো ছুট্ ছুট-ছুট। মুখে চিৎকার—

পাগল-পাগল। আমাকে মেরে ফেললে!

নার্সিও ছুটল আমার পিছনে পিছনে। হোটেলের দু'জন কেরাণী কোনরকমে তাকে ঠেকাল। ফুলেরকে বললাম, এর পরে আর আমি ভিয়েনায় থাকব না!

ফুলের চুপ করে রইলেন।

কিন্তু পারী ফেরা হ'ল না।

ভিয়েনায় থাকতে একদিন সেখানকার শিল্পীদের এক মজলিশে নাচি। সেদিন লাল গোলাপে গোলাপে তাঁরা আমায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন। এইখানেই হাঙেরীর ইম্প্রেসারিয়ো বিখ্যাত আলেকজান্দার গ্রসের সঙ্গে দেখা। তিনি বলেছিলেন,

যদি ভবিষ্যতের কথা কখনো মনে হয়, বুদাপেস্ত-এ আমার খোঁজ কোরো।

গ্রসকে তার করলাম, মাকেও। গ্রসের উত্তর এল, চলে এস। মাও পারী থেকে ছুটে এলেন। দুজনে এবার চললাম হাঙেরীর প্রধান নগর বুদাপেস্ত-এ।

বারো

এপ্রিল মাস। বসন্ত কাল। গাছে গাছে ধরেছে ফুল। এমনি দিনে এলাম বুদাপেস্ত-এ। পাহাড়, নদী, বন, এখানে-ওখানে ফুটেছে লাইলাক। পথে জনারণ্য। কিন্তু সেখানে দুঃখ নেই। আনন্দ, ঘন আনন্দ। বেদেরা রেস্তরাঁয় বাজাচ্ছে বাঁশী, হাঙেরীর আশা ফুটে উঠছে তাদের সুরে। হাঙেরীর পাহাড়, নদী, বন; লাইলাক ফুলের মেলা, ধূলোভরা নগরীর পথ, প্রান্তর, গ্রাম—সব যেন সেখানে মিশে আছে। তাইত ভাল লাগে হাঙেরীকে, তার মানুষকে।

হাঙেরীর আত্মাকে আমি খুঁজে পেয়েছি। তাইত আমার নাচ দেখে হাঙেরী খুশী। একদিন রাতে আমার বাজনদারদের বললাম, আজ তোমরা 'ব্লু দানিউব' বাজাবে। প্রসিদ্ধ সুরকার স্ট্রাউসের এ সুর। ঘুমন্ত নগরী, ঘুমন্ত মানুষ, শুধু বয়ে যাচ্ছে নীল দানিউব—নগরী জাগবে, তারই আত্মাকে আবাহন করছে সুর।

নাচলাম সেই সুরের তালে। আমি যেন ঘুমন্ত নগরী, আমি যেন নীল নদী —আমার জাগার আহ্বান জাগছে। আমি স্পন্দিত হয়ে উঠছি। দর্শকরা তো পাগল। এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। তারা লাফিয়ে উঠলে, বার বার এস্কোরধ্বনি—আবার, আবার!

সেইদিনই এক তরুণ দেবতা এসে দেখা দিলেন সাজঘরে।

বসন্ত রাতে চাঁদের আলোয় কি ছিল কে জানে, তাঁর সঙ্গে হাত ধরে নেমে এলাম পথে।

বেদিয়া ছন্দ বাজছে পানশালায়, পথে ভিড়। আমরা গিয়ে এক রেস্তরাঁয় উঠলাম। এল হাঙেরীর খাবার, হাঙেরীর সুরা। সেই প্রথম আমি মাতাল হয়ে গেলাম। চাঁদের আলো, বসন্তের সুগন্ধা হাওয়া যেন মিশে গেল সুরায়, আমাকে পাগল করে তুললে। মনে হ'ল আমার দেহের ভিতরে যেন অঙ্কুর উদ্গত হয়েছে, শুনতে পাচ্ছি তার স্পন্দন। আমার স্তন তো অতি-পিনদ্ধ নয়, সেই স্তন এখন পূর্ণ হয়ে উঠেছে যৌবনের রক্তধারায়, আমার নিতম্ব তো নিবিড় নয়, বরং বালকের মতোই। সেই নিতম্বে তরঙ্গ-হিল্লোল উঠছে। আর সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়েছে ঘন আনন্দ। এ আনন্দ বুঝি বসন্তের ফুল অনুভব করে তার ফোটার সময়। এ বুঝি কামনা, যৌবনের অনাস্বাদিত কামনার উন্মেষ। তবে কি যৌবন এল, আর এল যৌবন-ফুল যে ফোটায়—সে!

সারারাত জেগে কাটালাম, বিছানায় গড়াগড়ি দিলাম। অঙ্কুরের ব্যথা, উন্মেষের ব্যথা আমাকে ঘুমোতে দিলে না।

তার চোখ দেখেই অবাক হয়ে গেছি আমি। এ চোখে যে বুদার উদ্বেল বসন্তের অভিজ্ঞান। তার মুখে, দেহে যে মহান শিল্পী মিকায়েল এঞ্জেলোর সৃষ্টির রূপ। যখন সে হাসে তার প্রবাল ঠোঁটের ভিতর দিয়ে ঝিলিক দিয়ে ওঠে সাদা দাঁতগুলো। আমার মনে হ'য়, ওর গলা জড়িয়ে ধরব, ওকে আর ছাড়ব না। ও আমার তরুণ দেবতা।

আর কি ওর চাহনি, কি ওর স্বর! ও বার বার বললে, ইসাডোরা, তুমি আমার ফুল, আমার ফুল।

শুধু ফুল? হেসে বললাম। আর কিছু নয়?

ফুল তো হাঙেরীর আত্মা। ফুলই তো সব। ফুল মানে তো দেবদূত।

আমার তরুণ দেবতা অভিনেতা। সে আমাকে আর মাকে নিমন্ত্রণ করলে, সে রোমিয়োর অভিনয় করবে থিয়েটারে, যেতে হবে।

গেলাম, দেখলাম অভিনয়। রোমিয়োর কামনা যেন মূর্ত হয়ে উঠল ওর স্বরে। ওর সঙ্গে সাজঘরে দেখা করতে গেলাম। দলের সবাই তাকিয়ে দেখল; হাসল। কিন্তু একটি অভিনেত্রী যেন খুশী হলেন না। আমার রোমিয়ো মাকে আর আমাকে নিয়ে হোটেলে এল।

মা চলে গেলেন ঘরে, আমি আর রোমিয়ো বসে রইলাম।

বাইরে বুদার মদির রাত, ভিতরে আমি আর আমার রোমিয়ো।

সে ডাকলে, জুলিয়েত!

বললাম, বল!

জান, আজ আমি আমার অভিনয়ের প্রাণ খুঁজে পেয়েছি। রোজ যখন ঐ বারান্দার দৃশ্যটি দেখা দেয়, আমি দেয়াল বেয়ে উঠে গিয়ে চিৎকার করে বলি,

> আঘাত পায়নি যেজন, সে তো ক্ষত দেখে ব্যঙ্গময় হয়ে উঠবে।
> কিন্তু থাম, ঐ গবাক্ষ পথে কিসের আলো?
> ঐ পূর্বগগন, জুলিয়েত তো আমার সূর্য!

আজ কিন্তু চিৎকার বেরুল না, ফিসফিসিয়ে বললাম। আজ যে আমি জেনেছি, রোমিয়োর মন। রোমিয়োর ভালবাসা, তার প্রেমের মর্ম আজ বুঝেছি। হাঁ, হাঁ, আমি বুঝেছি। তোমার ভালবাসা আমাকে দিয়েছে প্রেমের অভিজ্ঞান, তাইতে আমি হব মহান শিল্পী।

মুগ্ধ হয়ে শুনলাম ওর আবৃত্তি। মহাকবির ছত্রগুলি যেন রূপ ধরে এসে দেখা দিল।

রোমিয়ো, রোমিয়ো, সবাইকে ত্যাগ কর রোমিয়ো, নিজের নাম ভুলে যাও! আমাকে গ্রহণ করো। মন বলে উঠতে চাইল।

রাত ভোর হয়ে এল। আমাদের প্রেমের একটি রাত এমনি করে কেটে গেল। যৌবন, আর বসন্ত, রোমিয়ো আর বুদা—তোমাদের কি আমি ভুলব! সে আজ কত কাল হয়ে গেছে, তবু মনে হয় যেন গত রাতের কথা।

রোমিয়ো রোজ আসে, রোজ আবৃত্তি করে, বলে ভালবাসার কথা। বেশ লাগে। ওর চোখে পড়ি আমার প্রেমের নতুন পাঠ, কিন্তু ও যেন বিভ্রান্ত। চোখ ওর জ্বলতে থাকে, ঠোঁট দু'খানি ফুলে ওঠে আবেগে, ও ঠোঁট কামড়ায়।

আমিও যেন কেমন অশান্ত হয়ে উঠি। ওকে চাই, ওর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চাই। কিন্তু সে কি দেহ? মন তো সঁপে দিয়েছি! একদিন আবিষ্কার করলাম, ও যদি আমাকে কোলে করে তুলে নেয়, শয্যায় নিয়ে যায়, শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়, তাতেও তো আপত্তি নেই। ভাবতেই অমনি আগুন জ্বলে উঠল শিরায় শিরায়।

শেষে একদিন দুজনে ভোরবেলা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম ঘোড়ার গাড়িতে। মাইলের পর মাইল ছুটে গাড়ি এসে থামল এক চাষীর কুঁড়ে ঘরে। সেখানে আশ্রয় মিলল। সারাদিন কেটে গেল। আমি কাঁদি, রোমিয়ো চুমু খেয়ে আমার কান্না থামায়।

সেদিন নাচ ছিল, খুবই খারাপ হ'ল। দেহ মন অবসন্ন। নাচের পরে আবার রোমিয়োর সঙ্গে দেখা, সে আমাকে এক রেস্তরাঁয় নিয়ে গেল, বললে,

জানো ইসাডোরা, স্বর্গ ঐ নীল আকাশের কোন কোণে নয়—এইখানে—এইখানে! আজ সেই স্বর্গের কাছে আমরা এসেছি। তুমি আর আমি এই স্বর্গ রচনা করব। এখানে তুমি জ্যোতির্ময়ী নারী, আমি জ্যোতির্ময় পুরুষ—আর কেউ নেই।

পুরুষ ও নারীর সেই স্বর্গ নেমে এল।

রোমিয়ো জানে বেদিয়াদের গান। সে যখনি আসে, আবৃত্তি করে, গান গেয়ে শোনায়। চিৎকার করে গেয়ে উঠে,

এক মেয়ে আছে দুনিয়ায়
ওরে কবুতর উড়ে আয়।
সে মেয়েকে কোথায় পেলাম।
প্রেম দিয়ে তারে জিনে নিলাম

বুদাপেস্ত-এর পালা শেষ হ'ল। বিদায় আসন্ন। রোমিয়ো আর আমি উধাও হ'লাম। সেই চাষীর কুঁড়ে ঘরে দুদিনের ঘর পাতলাম। দুজনে দুজনের আলিঙ্গনে কাটিয়ে দিলাম কয়েকটি রাত। সকালে উঠে অবাক হয়ে দেখতাম, ওর কোকড়ানো চুলে কি করে জড়িয়ে গেছে আমার চুল। এমনি করেই স্বর্গ রচনা করলাম দুজনে। কিসের স্বর্গ? পুরুষ আর নারীর স্বর্গ—তাদের কামনার স্বর্গ—পূর্ণতার স্বর্গ।

কিন্তু এ-পূর্ণতায় মন তো পুরোপুরি সায় দিলে না। আমি তো কামনার স্বর্গের মাদকতায় বিভোর হয়ে থাকতে পারলাম না। আমার মগজের কোষে কোষে তখন রব উঠেছে, ইসাডোরা, এই পরম লগ্নই তো সব। তোমার নৃত্যের আদর্শ তো এর কাছে ধোঁয়া, এই পরম মুহূর্তের কাছে কিছুই কিছু নয়। এই মুহূর্তে তুমি যদি মরে যাও, সে মৃত্যুর মহিমা তো সব চেয়ে বড। কিন্তু মগজের কথা শুনলে না মন, সে আর্তনাদ করে উঠল, বললে, না না, ইসাডোরা এ তো পরমক্ষণ নয়, এ তোমার প্রতিভার মৃত্যু। এমনি মৃত্যু তো শিল্পীর জীবনে আসে। আত্মার মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু কি করব আমি? এ মৃত্যু ভগবান যদি না দিয়ে থাকেন, দিয়েছেন প্রকৃতি। নারীর এই মৃত্যুকে মহিমায় ভরে দিয়েছেন। কিন্তু মহিমার উত্তুঙ্গ চূড়া থেকে আমি চ্যুত হলাম, সশব্দে পড়লাম এসে বাস্তবে। গ্রস্ আমাকে বুদাপেস্ত-এর গণ্ডি থেকে মুক্তি দিলেন। হাঙেরীর শহরে শহরে ঘুরতে লাগলাম। আমার বিপ্লবী নাচের বিষয় হ'ল হাঙেরীর বিপ্লবী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

হাঙেরী আমার হ'ল। রোজ নাচের শেষে যখন গাড়িতে উঠতে যাই, দেখি ফুলে ফুলে ভরে গেছে গাড়ি। ছাত্ররা এসে ঘিরে দাঁড়ায়, তাদের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে বিপ্লবী নায়িকার প্রতি ভালবাসা! কিন্তু তবু রাতে আমার রোমিয়ো আসে! কায়া নিয়ে নয়, স্মৃতির পাখায় ভর করে আসে তার ছায়া। আপন মনে বলে উঠি, রোমিয়ো, রোমিয়ো—তোমার জন্যে আমার সব কিছু দিতে পারি। আমার এই শিল্পের আদর্শ তোমার এক মুহূর্তের আলিঙ্গনের জন্য আমি বিকিয়ে দিতে পারি। আমাকে নাও, রোমিয়ো, আমাকে নাও!

হাঙেরী জয় করে আবার বুদাপেস্তএ ফিরে এলাম। স্টেশনে এল রোমিয়ো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু ভুজবন্ধে তো সে মাদকতা আর নেই, চুম্বনে তো মনে হয় নয় না দুজনের আত্মা এসে মিশে গেছে অধর ওষ্ঠের মোহানায়। কি হ'ল? ওকে শুধালাম,

রোমিয়োর প্রেমের দীপ্তি কি নিবে গেল?

ও চুপ করে রইল। তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, রোমিয়োর পালা। শেষ, এখন আমি য়্যাণ্টনী।

সেই ক্লিয়োপাট্রার য়্যাণ্টনী ?

না, তার চেয়েও বড়, ও বললে। সিজারের প্রিয় শিষ্য য়্যাণ্টনী, রোমের মানুষের নেতা য়্যাণ্টনী। শুধু প্রেম দিয়ে তার চলে না। শুধু কুজনে-গুঞ্জনে তার জীবন কাটে না, তার স্বপ্ন রোমের মানুষের সে দৃষ্টির নেতা হবে।

তুমি তো আমার দৃষ্টির নেতা, আর কি চাই ? শুধালাম

না। এখনো নই। তুমি আমাকে বিয়ে কর ইসাডোরা, প্রেমের প্রতিষ্ঠা তো বিবাহে।

বিয়ে করব ? বিস্মিত চোখে তাকালাম।

হাঁ, উন্মাদ হয়ে উঠল রোমিয়ো, হাঁ, বিয়ে করতেই হবে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে বুকে টেনে নিলে। গলে গলে পড়ল চুম্বন। ওর কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে আস্তে আস্তে বললাম,

আমি তোমার, একান্ত তোমার। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তাই হবে।

তারপর দিন থেকে শুরু হ'ল বাড়ি খোঁজা। সারা বুদা আর পেস্ত চষে ফেললাম।

কিন্তু বাড়ি আর পছন্দ হয় না। কোনটার ঘর ভাল নয়, কোনটায় আবার বাথরুমটি খারাপ। কোনটা-বা বদ্ধঘর, পরিক্রমা চলল।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠি, আবার ভাঙা মন নিয়ে ফিরে আসি।

একদিন ওকে বললাম, বুদাপেস্তেই আমরা থাকব তো ? কেমন করে জীবন কাটবে আমাদের ?

রোমিয়ো উত্তর দিলে, তুমি আর আমি সারাদিন কাটাব বাড়িতে। আমাকে তুমি দেখাবে নাচ, আমার পড়াশুনোয় সাহায্য করবে। তারপর রাতে দেখবে আমার অভিনয়।

বললাম, এই তোমার জীবনের ছক ?

কেন—এ ছক কি ভাল লাগে না ?

চুপ করে রইলাম।

রোমিয়ো মরে গেছে, তারই ভস্মস্তূপের উপর জেগে উঠেছে মার্ক য়্যাণ্টনী। জনতাকে সে চায়, জুলিয়েতকে নয়।

এখনো রোজ বেড়াতে যাই। ছুটির দিনে কখনো বা যাই গ্রামে। সারাদিন কাটিয়ে আসি। কিন্তু বিদায়ের সময় জুলিয়েতের মতো আব ব... হয় না,

তুমি যেও না, এখনো তো আসেনি দিন আসন্ন হয়ে।
ও তো নাইটিঙ্গেল, চাতক তো নয়!
ঐ ডালিম গাছে ও রোজ রাতে গান গায়......
প্রিয়, বিশ্বাস কর ও নাইটিঙ্গেল!

রোমিয়ো বলে ওঠে না,

ও চাতক, উষার ও দূতী।
ও তো নাইটিঙ্গেল নয়!
প্রিয়ে, দেখ, দেখ, ঐ যে পূর্ব দিকে
ছিন্ন মেঘে কারুকাজ করে দিয়ে গেল ঈর্ষার রেখা।
রাতের মোমখানি তো পুড়ে গেছে, এখন উজ্জ্বল দিন
এসে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়েছে কুয়াশাময় পর্বতের চূড়ায়।
আমি চলে যাই, বাঁচি। আর নয় তো থেকে
মৃত্যুকে বরণ করি।

রোমিয়ো মরে গেছে, এখন জননেতা মার্ক য়্যান্টনী: প্রেম নয়, প্রেমের নেশা আর নয়, এখন ক্ষমতার নেশায় সে মাতাল।

একদিন আমরা শহরের বাইরে বেড়াতে গেলাম। ক্লান্ত হয়ে এক খামার বাড়ির খড়ের গাদার উপরে দেহ এলিয়ে দিলাম।

রোমিয়ো আছে আমার পাশে। তাকে ডাকলাম,

রোমিয়ো!

ও আমার দিকে তাকাল।

আবার বললাম, যা হয় কিছু বল! অর্থহারা ভাবেভরা কথা—শুনি—কান পেতে শুনি।

ও আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, তোমাকে একটা কথা শুধাই। তুমি আর আমি শিল্পী। আমাদের জীবন আলাদা। আলাদাভাবে জীবন কাটালে কেমন হয়?

উঠে বসলাম; ব্যাকুল স্বরে বললাম, কি বললে?

বলছি, আমাদের পথ তো মেলে না, তাই মিলন কি সম্ভব?

দিগন্তবিসারী প্রান্তরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। বুকের রক্তধারা যেন তুষারায়িত, স্তব্ধ।

ও আবার বললে, শিল্পীর আদর্শ প্রেমের চেয়ে বড়—একথা কি তোমার মনে হয় না?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কি জানি! রোমিয়োর চেয়ে তাহলে মার্ক য়্যাণ্টনী বড়?

ও নীরব।

ফিরে এলাম। রোমিয়ো আজও দোর গোড়ায় নিঃশব্দে বিদায় নিলে। তাকিয়ে দেখলাম। পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

পরদিন আমি চললাম ভিয়েনা-বার্লিন বিজয়ে। কিন্তু বিজয়ে তো মন নেই। শুধু তারই স্মৃতি হানা দেয়। ভিয়েনায় এসে তাই অসুখে পড়লাম। খবর পেয়ে ছুটে এল রোমিয়ো। হোটেলে আমারই ঘরে সে রইল। নার্স এসে সেবা করে, রোমিয়ো বলে মিষ্টি কথা। রোগশয্যায় শুয়ে মনে হয় য়্যাণ্টনী মরে গেছে, আবার রোমিয়ো বেঁচে উঠেছে।

সকালে সেদিন ঘুম ভেঙে গেল। মন নির্লিপ্ত, উদাসীন। রোমিয়োর দিকে তাকালাম। দেখি, নার্স ওরই শয্যায়। নার্স রোমিয়োকে হত্যা করল, শুনলাম প্রেমের শবযাত্রার ঘণ্টাধ্বনি।

রোমিয়ো চলে গেল। সুস্থ হয়ে উঠলাম। আবার নাচ শুরু হ'ল। আমার বুকের ব্যথা, আমার প্রেমের ব্যর্থতা নাচে রূপ পেল। ভিয়েনা আমার হ'ল, বার্লিনকে জয় করলাম, মিউনিক আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু নীল রক্তের দল নাচ দেখে, তারিফ করে। সেই ঘন জনতার আবাহন কোথায়? তারা তো প্রবেশ করতে পারে না অভিজাত নৃত্যশালায়। একদিন জনতার আহ্বান পেলাম। কয়েকজন ছাত্র এসে বললেন, আমার নাচ যৌবনের আত্মাকে বিকশিত করে তুলেছে, কিন্তু যৌবন তো তার দর্শন থেকে বঞ্চিত।

শুধালাম, কেন?

দর্শনীর অভাব, তাঁরা বললেন।

বললাম, আপনারা নাচের বন্দোবস্ত করুন, আমি নাচব।

এক সস্তা কাফেতে বসল নাচের আসর। ওরা আমাকে তুলে টেবিলে টেবিলে নিয়ে গেল। নাচের পরে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন আমার পোষাক ছিন্নভিন্ন,

গায়ের শাল ফালি ফালি হয়ে গেছে। আর তারই টুকরো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ঝুলছে ওদের বুকে, ওদের টুপীতে।

তবু সেদিন খুশীমনেই ফিরলাম। জনতার জয়তিলক আমি পরেছি, আর কি চাই!

জার্মানী থেকে এবার বিদায় নেব, যাব ফ্লোরেন্স-এ।

তেরো

ফ্লোরেন্স! তুমি কি কখনো দেখনি সূর্যকরোজ্জ্বল ফ্লোরেন্স? দেখনি কি তার পথঘাট। শোননি কি বঙ্কিম, সঙ্কীর্ণ পথে দান্তের আহ্বান। বিয়াত্রিচেকে কি আবিষ্কার করনি তার নারীদের মাঝে? দেখনি তাঁর জলপাই-বাগিচা, তার উদ্যান, তার চিত্রশালা। বত্তিচেল্লী কি তোমার তরুণ মনে উন্মাদনা জাগিয়ে তোলেন নি?

আমি তো ভালবেসে ফেললাম ফ্লোরেন্সকে। আর ভালবাসলাম বত্তিচেল্লীর ছবি। চিত্রশালায় তাঁর এক বিখ্যাত ছবির নিচে দিনের পর দিন কেটে গেল। ছবিখানির নাম—প্রাইমাভেরা। ছবিতে যে আশ্চর্য গতি চুঁইয়ে পড়ছে, তাকে রূপ দিতে হবে দেহে। ফুলেভরা মাটির মৃদু তরঙ্গ, বনদেবীদের আবেষ্টনী—আর তার মধ্যে আফ্রোদিতের উচ্ছল কামনা আর মাতার স্নেহ মিশিয়ে তুলিতে লেখা এক অপূর্ব রূপসী। সে-ই প্রাইমাভেরা।

চিত্রশালার এক রক্ষক এনে দিয়েছে একখানা টুল, তারই উপর বসে বসে দেখি। একদিন দেখতে-দেখতে কি যেন হ'ল। হঠাৎ মনে হ'ল, ছবির ফুলে যেন সত্যিই স্পন্দন জাগছে। আমার পায়ে যেন জাগছে তারই দোলা, দেহও কাঁপছে আবেগে। বলে উঠলাম, আমি নাচে মূর্ত করে তুলব প্রাইমাভেরাকে, বত্তিচেল্লীর ভালবাসার বাণী জানাব, জানাব বসন্ত আর সৃষ্টির আনন্দের কথা। ছবির আনন্দকে আমি ছড়িয়ে দেব, বিলিয়ে দেব।

চিত্রশালা বন্ধ হবে এবার, তবুও বসে রইলাম। তখনো আমি খুঁজছি প্রাইমাভেরার জীয়নকাঠি। যদি জীয়নকাঠি পাই, আনন্দের বানে ভাসিয়ে দেব মানুষকে। তাকে শিক্ষা দেব, তার পঙ্গুতা, ব্যর্থতা থেকে বাঁচাব।

আমি তাকে রূপ দিলাম, তার নাম হ'ল আগামীর নৃত্য।

কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

ফ্লোরেন্স জয় করে আমরা আবার বার্লিনে ফিরে এলাম। বার্লিন আবার লুটিয়ে পড়ল পায়ের তলায়। ছাত্রেরা আমার গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরা টেনে নিয়ে চলল।

নাম, টাকা সবই পেলাম। আর কি চাই!

বার্লিনে রেমণ্ড একদিন এসে হাজির হ'ল। দীর্ঘ দিনের পরে তাকে পেয়ে খুশি হলাম। বললাম,

রেমণ্ড, এবার আমরা যাব গ্রীসে, সেখানে কলাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।

রেমণ্ড আমার মুখের দিকে তাকালে।

হেসে বললাম, টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ, তুমি তৈরী হয়ে নাও।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন গ্রস, বললেন, তোমার এ কি খেয়াল ইসাডোরা? এই তো তোমার তুনিয়া জয়ের সময়। আর এখন তুমি বিদায় নিচ্ছ?

বললাম, নাম চাই না, অর্থ চাই না আমি কলাদেবীর সাধক, তাঁরই উপাসনা করতে চাই।

সে তো ভাল কথা, তার ঢের সময় আছে।

না, নেই!

গ্রস চলে গেলেন, আমরা ট্রেনে চেপে বসলাম।

ভেনিস হয়ে যাব আথেন্স-এ—সেখানে আমাদের কলালক্ষীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করব!

ট্রেন, ট্রেন থেকে স্টীমার। সোজা পথে তো গ্রীসে আমরা যেতে রাজী নয়। আমরা যাব ঘুরতে ঘুরতে--গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে, শেষে একদিন রহস্যময়ী গ্রীসকে পেয়ে যাব। তাই জটিল করে তোলা হ'ল পথ, বড় বড যাত্রীবাহী জাহাজে চাপলাম না, উঠলাম গিয়ে ছোট স্টীমারে। এমনি করে ঘুরতে-ঘুরতে এসে পৌছলাম ব্রিন্দিসি। ব্রিন্দিসি থেকে স্যান্তামরা অবধি একটি স্টীমার যাতায়াত করে, আমরা সেটিতে চেপে বসলাম।

স্যান্তামরায় এসে নেমে পড়লাম। এইখানে ছিল ধূসর অতীতের সেই ইথাকা নগরী। ওডিসিউস ছিলেন এখানকার রাজা। আজ ইথাকার ধ্বংসাবশেষও নেই, তবু তার লুপ্ত গরিমার স্মৃতিতে বিভোর হয়ে গেলাম। গাইড এসে বললে, দেখবে না সেই পাহাড়—যেখান থেকে পৃথিবীর প্রথম মহিলা কবি সাফো সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন?

আমরা ছুটলাম।

সাগরের তীরে পাহাড়, সেই পাহাড়ের একখানি পাথর।

আর কিছু তো নেই। তবু বহুক্ষণ বসে রইলাম সেখানে।

সাফো, ভায়োলেট তাঁর কেশ, প্রেমে পাগল সাফো—তার সেই প্রেমের উৎস

থেকেই একদিন কবিতার জন্ম হ'ল। সে কি কবিতা! কামনায় কামনায় আগুনের লেলিহ শিখা জ্বলে উঠল সেখানে। তারপরে কবির কি হ'ল? তিনি প্রেমে হতাশ হয়ে সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিখ্যাত শিল্পী আলমা তাদেমার ছবিতে দেখেছি সাফোকে, আমার মন তো তিনি জুড়ে আছেন। পৃথিবীর প্রথম মহিলা কবি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হতাশ প্রেমিকা, পৃথিবীর প্রথম কামনাময়ী বিদ্রোহিনী—তিনি—তাঁকে বার বার নতি জানাই। আজও যখন মনে পড়ে সেদিনের কথা, কবি বায়রনের ছত্র ক'টা মনে ঘনিয়ে আসে।

দ্বীপময় গ্রীস

দ্বীপময় গ্রীস

সাফো, বহ্নিমানা সাফো

এখানে ভালবেসেছিলেন,

গান গেয়েছিলেন ভালবাসার

......হায় এখন তো সূর্য অস্তমিত।

গ্রীস আমার স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন সার্থক হ'ল। গ্রীসের আকাশ-বাতাস সবকিছু ভাল লাগল। আমরা স্মান্তামরা থেকে চললাম গ্রীসের অন্তরে। কোথায় যাব? ওলিম্পাসের চূড়ায় উঠব, দেখব দেবতাদের আবাস, ডায়নোসিয়াসের রঙ্গালয়ে নাচব, উচ্ছৃঙ্খল দেবতা বেকাসকে আবাহন করব।

তাইতো একখানা নৌকা ভাড়া করে চললাম।

প্রচণ্ড জুলাই দিন! আমাদের নৌকো নীল আয়োনিয়ান সাগরের বুকের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

জেলে ডিঙি, মাঝি দুজন। তাদের বললাম,

চল, ইউলিসিসের মতো পাড়ি জমাই। আসে আসুক ঝড়, ভয় কি!

ওরা ইউলিসিসের নাম জানে না, কিন্তু জানে আয়োনিয়ান সাগরের ঝড়-তুফান, ওরা ইঙ্গিতে জানালে, দরিয়া বড় পাজি। এই বেশ হাসিখুশি, এই আবার অজগরের মতো ফুলে ফুলে উঠছে।

অমনি মনে পড়ল হোমারের সেই ছত্র—

ঘন মেঘদল, বিধূনিত, বিক্ষুব্ধ সাগর।

ঝঞ্ঝাকে আহ্বান জানালে, পৃথিবী আর সাগর

মসীকৃষ্ণতায় ছেয়ে গেল, নিশিথিনী আকাশ থেকে

ঝরে পড়ল কৃষ্ণতা নিয়ে।

সত্যই আয়োনিয়ান সাগর বড় বিশ্বাসঘাতক। আমরা বহু কষ্টে এসে পৌছলাম তুরস্কের শহর প্রেভানায়। সেখান থেকে মাংস, জলপাই, শুঁটকি মাছ কিনে আবার নৌকোয় চেপে বসলাম। নৌকোয় ছই নেই। সারাদিন প্রচণ্ড রোদ মাথার উপর দিয়ে গেল। তাছাড়া আছে নৌকোর দুলুনি। হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে ছুটল নৌকা। কিন্তু হাওয়া তো যেন নাগরী মেয়ে। এই আসে, এই আবার পালিয়ে যায়। যখন পালিয়ে যায়, তখন স্তব্ধ হয়ে যায় পাল। নৌকো আর ছোটে না। আমরা ভাই-বোনেরা মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে দাঁড় টানি। এমনি করেই সন্ধ্যেয় এসে পৌছলাম কারভাসারাস-এ।

এখানে হোটেল নেই, রেল-সড়ক নেই, আছে মাত্র একটা সরাইখানা। সেখানে একখানা ঘর নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ঘুম হ'ল না। রেমণ্ড সারারাত ধরে সক্রেটিস আর প্লেটোর কথা বলে গেল। তাছাড়া খাট একখানা তক্তায় তৈরী, সেটা বারবার মড়মড় করে উঠছিল। আবার সেখানে রক্ত-লোলুপ জীবের অভাবও ছিল না।

যাহোক রাত কেটে গেল। ভোরে উঠেই আমরা রওনা হ'লাম। একখানা ঘোড়ার গাড়ি মিলে গেল। মা আমাদের লটবহর নিয়ে সেখানে চেপে বসলেন, আমরা লরেল গাছের ডাল কেটে লাঠি তৈরী করে নিলাম। সেই লাঠি নিয়ে চলতে লাগলাম গ্রীসের পথে। এই সেই পথ, এই পথে দু'হাজার বছর আগে একদিন সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে ছিলেন ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ।

কারভাসারাস থেকে এগ্রিনিয়ন। পাহাড়ি পথ, দুর্গম। ভোরের আলোয় তবু ভাল লাগল। হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুর করে। আমরা চলেছি তারুণ্যের পাখায় ভর করে। কখনো লাফিয়ে চলেছি, কখনো বা দুল্‌কি চালে। চলার তালে তালে গাইছি গান। একটা নদী পড়ল পথে। রেমণ্ড আর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীতে।

ঝিরঝিরে নদী, টলটলে জল, তার যে এত স্রোত কে জানত! আমরা দুজনেই হাবু-ডুবু খেতে লাগলাম। শেষে তো স্রোতের টানে অজানার উদ্দেশ্যে ভেসেই চললাম। ভাগ্যিস, গাড়ির গাড়োয়ানরা ছিল! ওরাই আমাদের উদ্ধার করলে। আমরা আবার সুস্থ হয়ে পথ চলতে লাগলাম।

আবার এক বিপদ। এক খামারবাড়ি থেকে দুটো কুকুর আমাদের তাড়া করলে।

ওরা নেকড়ে বাঘেরই মতো ভয়ঙ্কর। এবারেও গাড়োয়ান চাবুক মেরে ওদের তাড়িয়ে দিলে।

দুপুর হয়ে এল। পথের পাশে এক সরাইখানায় খেতে বসে গেলাম।

খাওয়া শেষ হতে এল সুরা। রেমণ্ড বললে, এই সেই পুরাকালের গ্রীক সুরা। শুয়োরের চামড়ার মশকে কিসমিস ছড়িয়ে রাখা হয়। এ সুরার কথা আছে হোমারের মহাকাব্যে, আছে কত কবির গানে।

আমরা পানপাত্র ভরে নিলাম সুরায়, কিন্তু পান করতে গিয়ে গন্ধে অস্থির। আসবাব পত্রের তেল-রঙের মতো স্বাদ, তেমনি উগ্র গন্ধ। কিন্তু রেমণ্ড নির্বিকার। সে পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করে ফেললে। আর বলতে লাগল, আহা এই তো সেই আঙুরিনা, যার এক ফোঁটা পেলে দেবতা আর মানুষ কৃতার্থ হয়।

হেসে বললাম, দেবতার পানীয় মানুষের সইবে কেন?

রেমণ্ড তর্ক জুড়ে দিতে যাবে, এমন সময় গাড়োয়ান তাড়া লাগালে।

এবার এসে পৌঁছলাম তিন পাহাড়ের উপরে তৈরী অতীতের নগর স্রাদোস-এ। এখন আর নগর নেই, এক ছোট গ্রাম ছড়িয়ে আছে, বুকে তার অতীতের ভগ্নস্তূপ। সেই ভগ্নস্তূপের ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। রেমণ্ড আমাদের কাছে বলতে লাগল, এখানে ছিল স্বর্গরাজ জুপিটারের মন্দির। সে-মন্দিরে হোত উৎসব। অভিনেতারা নাচত গাইত গান। আমরা তন্ময় হয়ে শুনলাম। মনে হ'ল ভগ্নস্তূপ থেকে মহিমময় অতীত বেরিয়ে এসেছে, আমরা যেন মন্দির-প্রাঙ্গণে বসে দেখছি নাচ—শুনছি গান।

এগ্রিনিয়নে এসে পৌঁছলাম রাতে। সরাইখানায় রাতটা কাটল। ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়লাম। এবার আমরা যাব মিসোলঙ্গি।

মিসোলঙ্গি!

তুমি কি জানবা গ্রীসের মানচিত্রের কোথায় আছে ঐ শহর বিন্দুর মতো লুকিয়ে? তুমি কি শুধু জান আথেন্সের নাম, জান কি শুধু গ্রীসের গরিমাময় অতীত কথা? মিসোলঙ্গি যে সেই অতীতের সঙ্গে মিশে আছে। যদিও সে তো উনিশ শতকের ঘটনা।

মিসোলঙ্গি! এখানেই কবি বায়রন শুয়ে আছেন নির্জনে। সেই বায়রন, যিনি গ্রীসের গরিমা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, যিনি তুর্কদের বিরুদ্ধে গ্রীসের পক্ষ হয়ে লড়েছিলেন। সেই বায়রন!

আজও নির্জন শহরে বিদ্রোহী কবির স্মৃতি জীইয়ে রেখেছে কবরখানা।

আমরা দেখতে গেলাম সেই স্মৃতি।

পথের একধারে, ছায়াঘন কোণে করবখানা, বিদ্রোহী কবি এখানে সমাহিত।

কবির কবরের উপর লুটিয়ে পড়লাম। কবি না বলেছিলেন অন্তিমশয্যায়,

আমি মরব, তা অনুভব করছি। তাব জন্যে দুঃখ নেই। তাইত এলাম গ্রীসে। আমার ধনসম্পদ, আমার প্রতিভা তারই জন্য ঢেলে দিলাম। আমার জীবন সঁপে দিলাম……

আমিও তো কবির সঙ্গে একাত্ম। আমিও তো আজ গ্রীসে এসেছি, আমার বুকেও জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন।

অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম, সমাধি জড়িয়ে ধরে কাঁদলাম। কবির শেষ কথা বার বার কানে বেজে উঠল।

আমার গ্রীস, বেচারী গ্রীস—দুঃখিনী গ্রীস·· আমার সময় তো হয়ে এল। মৃত্যুকে আমি ভয় পাইনে।···

তারপর সন্ধ্যে হয়ে এল। মিসোলঙ্গির নীল সাগরের জলে ছায়া নেমে এল ধূসর সন্ধ্যার। কবির জীবন-দীপ নিবে এল। কবি বলে উঠলেন,

আমি এখন ঘুমোব···

পাশ ফিরে শুলেন কবি। আর জাগলেন না।

সমাধিমন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। আর আনন্দ নেই বুকে। শুধু বিষাদের অনুরণন উঠছে। শহরের পথ ধরে চলেছি। এখানেও বিষাদের ছায়া। ছন্নছাড়া শহর। কবির মৃত্যুর দু'বছর পরে তুর্কীরা এসে এ-শহর অধিকার করে। সেদিন রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল শহরে, ধ্বংসের নর্তন শুরু হয়েছিল। আজও শহর সেই ধ্বংস বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে, আজও তার পথের পাথরে পাথরে বুঝি রক্তের দাগ। শহীদের স্মৃতির সঙ্গে মিশে গেছে বিদ্রোহী কবির স্মৃতি। ওরা তো কবির মতোই গ্রীসকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিল, মুক্তি দিতে চেয়েছিল গ্রীসের সাধনাকে বন্দী শিলাস্তূপ থেকে। পারে নি, তাইত আমার চোখে জল, রেমণ্ডের চোখে জল।

আমরা মিসোলঙ্গির কাছে বিদায় নিলাম গোধূলির আলোয়। যাব আথেন্সে। জ্ঞানদেবী আথেনার পুরী আথেন্স।

আথেন্স-এ এসে পৌঁছিলাম রাতে। সকালে উঠে মনে হ'ল, আমি নবজন্ম পেয়েছি। সূর্য উঠছে পেন্তেলিকাস পর্বতের আড়াল থেকে, তার আলো ছড়িয়ে পড়ছে অতীতের আথেন্সের উপর। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম মন্দির আর মিনার। সৌন্দর্য চুনিয়ে চুনিয়ে উপভোগ করলাম। তারপর আথেন্স থেকে শুরু হ'ল সন্ধান! কলালক্ষ্মীর মন্দির গড়তে হবে, তার স্থান চাই। সারা গ্রীস ঘুরলাম, কিন্তু কোথাও তো কলালক্ষ্মীর ঠাঁই মেলে না। একদিন হাইমেতাস-এর পথে চলছিলাম। এই সেই অঞ্চল, এখানকার মধু বিখ্যাত। পথের পাশে পাশে মৌমাছির চাষ। মৌচাক বাঁধা, গুনগুন করছে মধুপেয় দল। ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। আমরা মৌ-বাগিচা ছাড়িয়ে চলে এলাম, এক উঁচু জায়গায় এসে রেমণ্ড হঠাৎ তার হাতের লাঠিটা পুঁতে দিয়ে বললে,

পেয়েছি আমাদের কলালক্ষ্মীর ঠাঁই। এইখানেই গড়ে উঠবে মন্দির।

কিন্তু এ তো অতীত নয়, দণ্ড পুঁতলেই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় না। আশেপাশে মানুষের বসতি নেই। শুধু মেষপালকরা আসে ছাগল আর ভেড়া চরাতে। তারা বলতে পারলে না জমি কার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল, পাঁচটি চাষী-পরিবার এ জমির মালিক। তাদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তারা তো শুনে অবাক, এই পাথুরে জমিও মানুষ কিনতে চায়। তাও ক'জন বিদেশী। আথেন্স থেকে বহুদূরে এ অঞ্চল, তাছাড়া জমিতে কাঁটাঝোপ ছাড়া কোনো ফসল ফলে না। আশেপাশে কোথাও জলের রেখাটি পর্যন্ত নেই। মৌ-বাগিচার পরেই এ অঞ্চলের দুধমধুর দেশ শেষ, শুধু ধূ ধূ করছে পাথর আর কাঁটাঝোপ। কিন্তু চাষীরা বোকা নয়, মালিকানা স্বত্ব যখন তাদের, অমন জমির জন্য পাঁচ মাথা এক সঙ্গে বসে দর ঠিক করল। দর বেশ চড়া, কিন্তু ডানকান বংশ তখন দৃঢ় সংকল্প। চাষীদের কাছ থেকে চড়া দামেই জমি কেনা হ'ল। অতীতের কোপানস টীলা, আজ ডানকানকুলের সম্পত্তি হ'ল।

রেমণ্ড বসে গেল মন্দির পরিকল্পনায়। ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এ-পরিকল্পনা চলে না। হোমারের মহাকাব্যে আছে এর নির্দেশ। বিখ্যাত গ্রীকবীর আগামেমনের প্রাসাদের পরিকল্পনাটি রেমণ্ড কাগজে ছকে তুললে। পাথর বইবার জন্য কুলি

রাখা হ'ল, আর এল দলে দলে কারিগর। পাথর আসবে পেন্তেলিকাসের মর্মর পর্বত থেকে, রেমণ্ডের তাই মত। কিন্তু আমি বললাম,

সে তো অনেক দূরে ভাই।

রেমণ্ড উত্তর দিলে, মিশরের পীরামিডের পাথরও তো বহুদূর থেকে এসেছিল।

বললাম, সে দাসদের দান, সেই মহাদানের কথা ফারাওদের নামের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। এটা সে-যুগ নয়, এখানে শ্রমের দাম আছে। পেন্তেলিকাস থেকেই পাথর আসুক, তবে উপরের মর্মর পাথর নয়, নিচের লাল পাথর।

তাই-ই ঠিক হ'ল। গাড়ি গাড়ি পাথর পেন্তেলিকাস থেকে কোপানসের দুর্গম পথ বেয়ে আসতে লাগল। একদিন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হ'ল। সেদিন উৎসব হ'ল অতীতের গ্রীসের বিধান অনুসারে। কালো মোরগ এনে বলি দেওয়া হ'ল, পুরোহিত পড়লেন দুর্বোধ্য মন্ত্র। মাঝে মাঝে মন্ত্রের ভিতরে শুনছিলাম ডানকান কথাটা। পূজা শেষে পাহাড়ের উপর অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল, পিপে পিপে মদ এল—আমরা আমাদের চাষী পড়শীদের সঙ্গে সারারাত নাচে, গানে হৈ-হল্লায় কাটিয়ে দিলাম।

রেমণ্ডের খাটুনির আর বিরাম নেই। মন্দির গড়া দেখে, কুলিদের কাজের হিসেব রাখে, আবার ডানকানকুলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিকল্পনা ছকতে বসে যায়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে উঠতে হবে। আলোকের দেবতা আপলোকে আবাহন করতে হবে সঙ্গীতে, নৃত্যে। তারপরে ছাগ দুগ্ধ পান। আশেপাশের মানুষদের জড়ো করে এবার শেখাতে হবে নাচগান। তারপরে দুপুরে শাকসব্জী আহার। মাংস ছেড়ে দিতে হবে। বিকেলে প্রার্থনা। রাতে শুরু হবে আদিম যুগের উৎসব, আদিম সঙ্গীতের তালে তালে চলবে নাচ।

মন্দির গড়া শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন খেয়াল হ'ল, এখানে তো আশে-পাশে একফোঁটা জল নেই। হাইমেতাসের দিকে তাকালাম। সেখানে পাহাড়ের উপর মৌ বাগান, সেখানে আছে ঝরণা আর ছোট ছোট নদী। পেন্তেলিকাসের দিকে তাকালাম। সেখানে তুষারধারা গলে গলে ঝরে পড়ছে। কিন্তু কোপানস তো ঊষর মরুভূমি। এখানে শুধু পাষাণ—পাষাণ—হৃদয়ে তার জলের রেখা নেই। কিন্তু রেমণ্ড তাতেও দমল না। সে এক কূপ খনন করাবে ঠিক করল। কূপ খুঁড়তে খুঁড়তে দেখা গেল—নীচেও জল নেই—শুধু পাথর। আমরা কি করব, আথেন্সে ফিরে এলাম। সেখানে মন্দিরে মন্দিরে হত্যা দেব, চাইব দেববাণী। যদি বাণী পাই আমার মন্দিরের চূড়া উঠবে, আকাশ ছুঁয়ে যাবে। জলরেখা পাথরের বুক চিরে বয়ে যাবে। ঊষর মরুভূমি হয়ে উঠবে শ্যামল।

চোদ্দ

রোজই ডায়নোসিয়াসের ভাঙা মন্দিরে যাই, রাত হয়ে আসে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে। আর নাচি। নয়তো বসে থাকি চুপটি করে আমরা ক'জন। সেদিনও রাতে বসেছিলাম, এমন সময় শুনলাম, কে যেন কিশোর কণ্ঠে গাইছে গান, রাতের বুকে স্বর উঠছে। এবার আর একটি স্বর গেয়ে উঠল স্বরে স্বর মিলিয়ে। তারপর আর একটি স্বর। গ্রীসের এক প্রাচীন গাথা গাইছে তারা।

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ রেমণ্ড বলে উঠল, এই তো গ্রীক থিয়েটারের সেই ঐক্যতান গীতি! চল, ওদের খুঁজে বার করি।

খুঁজে বার করলাম। চাঁদের আলোয় কয়েকটি কিশোর বসে গাইছে গান। পুরানো দিনের গ্রীসকে জাগিয়ে তুলছে।

ঠিক করলাম, ওদের নিয়ে গড়ে তুলব এক দল। আমি নাচব, ওরা গাইবে। যেকথা সেই কাজ। বাছাই করা শুরু হয়ে গেল। অনেক বাছাইয়ের পর দশটি কিশোরকে নিয়ে দল গড়লাম। ওরা যেন দেবশিশু, যেমনি ওদের রূপ, তেমনি ওদের স্বর। ওদের নিয়ে বসে গেলাম। ওদের শেখাই গ্রীক নাট্যকার এস্‌কাইলাস সোফোক্লিসের রচনা থেকে ঐক্যতান গীতি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজে নাচি।

বেশ কাটছিল দিন, এদিকে রেমণ্ডের মন্দির গড়ার কাজও চলছে—কোপানসে এমন সময় এল বিপর্যয়। আথেন্সে তখন বিপর্যয়েরই পালা চলছে। রাজনীতির ঘূর্ণায় সে টলমল। রোজই দেখা দিচ্ছে বিপ্লব। একদিন কোপানস থেকে আথেন্সে ফিরছি, আমাদের গাড়ি ঘিরে ফেলল ছাত্রদের মিছিল। কি ব্যাপার?

থিয়েটারে আধুনিক না প্রাচীন গ্রীক ভাষা চলবে এই নিয়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন। ছাত্ররা প্রাচীন গ্রীক ভাষা চালাবার পক্ষে, আর সরকার আধুনিক গ্রীকভাষা। তাই বার হয়েছে বিক্ষোভ মিছিল। ওরা আমাদের বললে, তোমাদেরও আমাদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিতে হবে।

আমরা তো তখুনি রাজী। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মিছিলে চললাম। তারপর মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারে সভা। সেখানে আমার গ্রীক কিশোররা প্রাচীন গ্রীসের

মহাকবি ও নাট্যকারদের রচিত গান গাইলে। আর আমি তারই তালে তালে নাচলাম।

গ্রীসের রাজা জর্জের কানে এ খবর পৌঁছে গেল, তিনি আমাকে রয়াল থিয়েটারে নাচ দেখাতে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সেদিনকার উৎসব আর তেমন জমল না। দস্তানা-মোড়া হাতের হাততালি পড়ল ঘন ঘন, রাজা নিজে এলেন সাজঘরে, রাণীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারে ঘন জনতার উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা যাকে জন্ম দিয়েছিল; এখানে তার সেই মহিমা তো অনুভব করলাম না। মনে হ'ল, এ কাদের জন্য নাচছি, কাদের জন্য সোফোক্লিস, ইউরিপিদাসকে মূর্ত করে তুলছে আমার কিশোর দল, এরা তো সেদিনকার সে-গ্রীসকে ভালবাসে না; ঐতিহ্যকে এরা তো জীর্ণ বেশের মতোই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাইত গ্রীসের মহিমা অস্তমিত, গ্রীস এখন শুধু নামে গ্রীস।

এদিকে আর এক বিপদ। এর মধ্যে টের পেলাম ব্যাঙ্কের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে। তার উপরে রয়াল থিয়েটারে এই ঘটনা। থিয়েটার থেকে এসে সারা রাত ঘুম হল না। ভোর না হতেই ছুটলাম ডায়নোসিয়াসের ভাঙা মন্দিরে। সেখানে একা-একা নাচলাম। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। উপরে উঠে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ মনে হ'ল, আমার স্বপ্ন যেন বুদ্‌বুদের মতো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। মন বলে উঠল, না, না, পুরানো গ্রীসের আত্মাকে তুমি আর জাগাতে পারবে না, যুগ-যুগের ভস্মস্তূপের আড়ালে সে চাপা পড়ে গেছে, তাকে জাগিয়ে তুলতে হলে চাই পুরানো দিনের অনুভূতি। তুমি আধুনিকা—তুমি সে অনুভূতি কোথায় পাবে? একদিন এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলে, তুমি গ্রীসের আত্মাকে খুঁজে পাবে—নিজেকে তুমি গর্বভরে প্রাচীন গ্রীসের অনুভূতির অধিকারিণী বলে মনে করেছিলে—কিন্তু আজ তো ভুল ভাঙল! অতীত তো আজকের যুগের উপর পিলপেগাড়ি করতে পারে না—তুমি হেলেনের কেউ নও, ইফিজিনিয়ার কেউ নও, তুমি আজকের কিটি-লিসিদেরই একজন।

একদিন গ্রীস থেকে মন্দির অসমাপ্ত রেখেই বিদায় নিলাম। সেদিন মনে হচ্ছিল,

ভুল, বড় ভুল হয়ে গেছে! গ্রীস! তোমার রহস্যের অঙ্গনতলে বড় দেরীতে এসেছিলাম; তাই তোমার বেদীমূলে শুধু উৎসর্গ করে গেলাম নিজের অনুতাপের

ব্যথা। তোমাকে আমি বহু দুঃখে পেয়েছি। তোমাকে আমি ধ্যানে লাভ করেছি, কিন্তু সে ধ্যানের ফল তো সবাইকে বিলিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, যুগটা যে আধুনিক।

আবার ভিয়েনা, বার্লিন, লাইপজিগ ··

গ্রীক নৃত্যে, গ্রীক ঐক্যতান গীতিতে হৃদয় জয় করে নিলাম।

কিন্তু বেশিদিন তো চলল না, গ্রীসের কোল থেকে বিচ্যুত হয়ে গ্রীক কিশোরেরা হারিয়ে ফেলল তাদের গানের মাধুর্য। তাই তাদের বিদায় দিতে হ'ল। একাই গ্রীসের আত্মাকে ফুটিয়ে তুলতে লাগলাম। রসিকমহল আমাকে বরণ করে নিলেন, জনতার পূজা পেলাম। ব্যাঙ্কের পুঁজি আবার বেড়ে চলল। রেমণ্ড চলে গেল গ্রীসে, কোপনসের কলালক্ষ্মীর মন্দির গড়ার কাজে। আর আমি বেরলাম য়ুরোপ বিজয়ে।

এই সময়ে এল এক নিমন্ত্রণ। বেরুথ যেতে হবে। বিখ্যাত সুরকার ভাগ্‌নারের জন্ম বার্ষিকীতে আমাকে নাচতে হবে। আর সে-নিমন্ত্রণ করলেন কোসিমা—ভাগ্‌নারের জীবনসঙ্গিনী।

কোসিমাকে তুমি চেননা—তাহলে ভাগ্‌নারকেই বা চিনবে কি করে?

ভাগ্‌নার সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর সুর য়ুরোপের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে ঝংকার তুলেছিল কত বিচিত্র সুরের। কখনো বা সেখানে বিষাদ ঝরে পড়ে, কখনো বা প্রেমের ধারা বয়ে যায়, অথচ ভাগ্‌নার উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট। সেই ভাগ্‌নারকে ভালবাসলেন কোসিমা। ভাগ্‌নারও ভালবাসলেন। তিনি কোসিমার আরক্ত অধরের চুম্বনে যেন মুক্তি দেখতে পেলেন তাঁর প্রতিভার। তিনি বলে উঠলেন, তুমি আমাকে মহান করেছ কোসিমা, তুমি আমাকে মুক্তি এনে দিয়েছ, তুমি আমার গর্ব, আমার সুখ, আমার দুঃখ। কিন্তু কোসিমা বিবাহিতা, তাঁর আছে স্বামী, ছেলেমেয়ে। তাই নিন্দার ঝড় বয়ে গেল।

কিন্তু নিন্দা তুচ্ছ করলেন কোসিমা, বিদ্রোহিনী নারী প্রেমিককে বরণ করে নিলেন। কোসিমা হলেন তাঁর অনুপ্রেরণা। ভাগ্‌নার বলে উঠলেন, তোমায় যদি না পেতাম, আমি তো আর সুর সৃষ্টি করতে পারতাম না। আমার সুরের উৎস যে শুকিয়ে গিয়েছিল, তুমি আমার সুরের দেবী, আবার তাকে ভরে দিলে সুরের ঝরণা ধারায়।

কোসিমাও ভালবাসলেন দুরন্ত, উচ্ছৃঙ্খল সুরকারকে। তাঁর রোজনামচায় লিখলেন, ওকে বহুবার বলতে গেছি, ওকে ভালবাসি, কিন্তু বলতে পারিনি। মৃত্যুর দিনে সেকথা বলতে পারব, তার আগে তো নয়।

ভাগ্‌নার চলে গেছেন, কোসিমা এখনো আছেন। ভাগ্‌নারের স্মৃতি, আর প্রতিভার পূজা করছেন।

সেই কোসিমার নিমন্ত্রণ পেলাম।

কোসিমার মতো এমন মহিলা আমি দেখিনি। এখনো তিনি সুন্দরী, আয়ত তার দুটি চোখ, নাক বুঝি মেয়েদের চেয়ে একটু বেশি চোখা—কি দীপ্ত তাঁর মুখখানি। প্রথম দর্শনেই তাঁকে ভালবেসে ফেললাম, তিনি বললেন,

ইসাডোরা, তুমি আমার স্বামীর স্বপ্ন মূর্ত করে তুলেছ, তিনি তো এই চাইতেন। তুমি আমার স্বামীর মানস-কন্যা।

ভাগ্‌নারের সুরকে জাগিয়ে তুলালম নৃত্যে। আমি যেন স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে কাটিয়ে দিলাম দিনগুলি। রিচার্ড ভাগ্‌নার আমার স্বপ্নের দেবতা। ঘুমোতে যাই, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, দেখি—আপন মনে ভাগ্‌নারের সুর ভাঁজছি। এখন আমার সব কিছুই ভাগ্‌নারে সমর্পিত।

কিন্তু তবু একদিন এরই মধ্যে প্রেম এসে দেখা দিল। তবে এবার তার রূপ ভিন্ন। সেই কামনার দেবতাই এলেন, কিন্তু মুখোশ বুঝি তার ভিন্ন।

একা আছি এক বাড়িতে। সঙ্গে বান্ধবী মেরী। চাকর আর রাঁধুনী রাতে চলে যায়। শুধু আমি আর মেরী বাড়িতে। একদিন মেরা আমাকে বললে, ইসাডোরা একবার জানলায় এসে দেখ! জানালায় ছুটে এলাম।

মেরী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ঐ দেখ, ঐ যে গাছটা, ওরই তলায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। রোজ দেখি দুপুর রাতে ও তোমার জানালার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতদিন তোমাকে বলিনি, তুমি ভয় পাবে বলে। আমার তো মনে হয় লোকটা চোর-বদমাস হবে।

আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। সত্যি, একটি মানুষ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। আঁধারে ওর মুখ ভাল করে দেখা যায় না। আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা, হঠাৎ মেঘমুক্ত হয়ে চাঁদ বেরিয়ে এল। এবার ওর মুখখানি দেখলাম। দেখে চমকে উঠলাম। এতো চোর-বদমাসের মুখ নয়, এ যে প্রতিভার দীপ্তিভরা মুখ। জানালা থেকে সরে এলাম।

মেরী ফিসফিসিয়ে বললে, এক হপ্তা ধরে রোজ দেখছি, অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

দাঁড়াও, দেখে আসি লোকটি কে ?

মেরী বাধা দিলে, না, না যেয়ো না! তার চেয়ে পুলিশে কাল খবর দেওয়া ভাল।

ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে বললাম, কালকের কথা কাল, আজ তো চোরকে দেখি আসি, মোলাকাৎ করে জেনে আসি ওর কি মতলব।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

শীত এখনো কাটেনি। পথে কুয়াশা রচনা করেছে আলো-আঁধারি মায়া। আর সেই মায়ায় গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোর।

কাছে গিয়ে বললাম। বন্ধু, আপনি কে ?

লোকটি অবাক, অপ্রতিভ, থতমতো খেয়ে বললে, আমি…আমি আমি ‥

আমার বন্ধু বলে, আপনি চোর-বদমাস, রোজ রাতে এসে এখানে দাঁড়ান, আমার জানলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আপনি কে বলুন তো ?

আমি—আমি!

হেসে বললাম, অমন করছেন কেন? তাতে তো চোর বলেই মনে হবে। কি—চোর নাকি ?

লোকটি বললে, আমি চোর নই ফ্রয়েলিন (জার্মান ভাষায় কুমারী), আমি লেখক। সন্ত ফ্রান্সিসের জীবনী লিখছি। আপনাকে আমার সান্তাক্লারা বলে মনে হয়। তাই আমি এইখানে দাঁ ড়য়ে দাঁড়িয়ে দেখি—গিয়ে আবার লিখতে বসি।

হেসে বললাম, তাহলে তো আপনি পাকা চোর! চুরি করে অনুপ্রেরণার উৎস আবিষ্কার করেছেন, অথচ যে উৎস সে টের পায় নি। আপনার নামটি কি ?

গম্ভীর স্বরে বললেন, আমার নাম হাইনিরিক থোড্।

আপনিই বিখ্যাত থোড্? চমকে উঠলাম।

হাঁ, আমিই সেই।

তাহলে তো বন্ধুর দরবারে আপনাকে পেশ করতেই হবে, দেখি তিনি কি রায় দেন।

তাঁকে টানতে-টানতে নিয়ে এলাম বাড়িতে। যেন স্বপ্নমান তিনি। কিন্তু চোখে তাঁর কি দীপ্ত। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, যেন, আমি কোথায় চলে গেছি। যেন আকাশের ছায়াপথে ঘুরছি। আমার রূপ বদলে গেছে। ভাবলাম একি প্রেম! আবার কি প্রেমের আবির্ভাব হ'ল আমার জীবনে! আমার

ইন্দ্রিয় যেন মূর্চ্ছাহত। মাথা ঘুরছে। ওঁরই কোলের উপর ঢলে পড়লাম। জেগে দেখি, উনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে আবৃত্তি করছেন কবিতা :

তোমাকে দেখলাম, তোমাকে পেলাম।
তোমার আলো, আমার আলোয়
মিশে গেল।

থোড্ এবার ঝুঁকে পড়ে আমার চোখ দুটি চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন। কিন্তু এতো জৈবিক কামনা নয়। তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি। রাতের পর রাত তাঁর ভুজবন্ধে কেটে গেল, সে তো স্বর্গের, মর্ত্যের তো নয়। থোড্ মর্ত্যকে স্বর্গ করে তুললেন। তাকে নামিয়ে আনলেন না ইন্দ্রিয়-বিলাসে। আমিও যেন চলে গেলাম কোন্ স্বর্গলোকে—আমার সে যেন সূক্ষ্ম দেহ। আমার ইন্দ্রিয়গুলি ঘুমিয়ে ছিল, তারা আবার জেগে উঠল। ওঁর প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গ কেঁদে উঠল—কিন্তু সে তো স্বর্গ—নরক নয়, তার অনুভূতি তো চরম লজ্জা নয়, পরম আনন্দ।

মহলা দিই ভাগ্নারের, স্তিমিত আলো রঙ্গমঞ্চে থোড্ বসে থাকেন। আমার শিরায় শিরায় আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। সে আনন্দ আমাকে ব্যথায় বিবশ করে দেয়, আমাকে দংশন করে, আমাকে মূর্চ্ছাহত করে। একি বেদনার্ত পুলক আমার—একি ব্যথা! আমার মগজে আলোর ঘূর্ণা তোলে। আলোর নাচন চলে। আমি কাঁদতে চাই। মাঝে মাঝে তিনি আমার হাত ধরেন। আনন্দ যেন আরো দুঃসহ হয়ে ওঠে।

রোজ রাতে প্রেমিক আসেন বাড়িতে। আর-আর প্রেমিকের মতো তো নন। আমার পোষাকের বন্ধনী খুলতে চান না, আমার স্তনের উপর হাত নেমে আসে না; দেহের স্পর্শের জন্য লোলুপ হয়ে ওঠেন না। তিনি তো জানেন, এ দেহ তাঁর, একান্ত তাঁর—এর প্রতিটি শিরা তাঁর—তাঁর। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আবেগ ফুটে ওঠে, সে-আবেগ যেন আমাকে হত্যা করতে চায়, আমি বিবশ হয়ে পড়ি। আবার সেই চোখের দৃষ্টিই আমাকে জাগিয়ে তোলে। ঐ দৃষ্টি যেন আমার জীয়নকাঠি, মরণকাঠি। আমার আত্মার তিনি বিধাতা। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে মরতে সাধ যায়।

খিদে কমে গেল, ঘুম নেই চোখে। ত্ৰ্যান্নাৎসিয়োর মতোই তিনি প্রেমিক। আর কারো সঙ্গে তো তুলনা চলে না।

তিনি রোজ আসেন, আমাকে তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনান। দান্তে পড়েন পড়তে পড়তে ভোর হয়ে যায়। মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে যান। অথচ তিনি তো সুরা স্পর্শও করেন নি, পড়ার সময় শুধু খেয়েছেন জল। আর হয়তো আমার ঠোটের মধু। কিন্তু তবু মাতাল। একদিন অমনি ভোরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, বিদায় দিতে দোর-অবধি এগিয়ে এলাম। হঠাৎ ভয় পেয়ে বললেন, ঐ যে ফ্রাউ কোসিমা আসছেন, আমি পালাই!

বললাম, ভয় কি!

হেসে বললেন, প্রেমেই তো সবচেয়ে বেশি ভয় ইসাডোরা। এই বলে চলে গেলেন।

সত্যিই ফ্রাউ কোসিমা এসে হাজির হলেন। ম্লান তাঁর মুখখানি। ভ্রূতে কুঞ্চন রেখা। কাল রাতে একটা নাচ নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক হয়ে গেছে। আজ ভোরে হয়তো তারই জের টানতে এসে হাজির হয়েছেন।

আমার ভ্রূও কুঁচকে উঠল! আমি ভাগ্‌নারকে যেমন বুঝি তেমনি নাচব, নয়তো নাচব না।

কোসিমা এসেই বললেন, জান ইসাডোরা, কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি। আমি আমার স্বামীর চিঠিপত্র আর লেখা, বার করে বসেছিলাম। দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক। তুমি কি করে তাঁকে এমন করে বুঝলে? তিনি তাঁর উদ্দাম দেবতার আবাহনের সুরের যে অর্থ করেছিলেন, কি করে তুমি তা খুঁজে পেলে? আর তো আমি তোমায় বাধা দেব না, তোমার যা মনে হবে তাই তুমি নাচবে। আর একটা কথা। আমার বড় সাধ, আমার ছেলে সিগফ্রিডকে তুমি বিয়ে কর! তারপর এস, দুজনে মিলে আমার স্বামীর স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলি। আমার সাধ যদি পূর্ণ হয়, তাহলে যুগ যুগ চলে যাবে, ভাগনারের নাম তবু কেউ ভুলতে পারবে না।

আমি নীরব রইলাম। তখন আমি থোড্‌কে নিয়ে বিভোর, আমার সমস্ত সত্তা তাঁর জন্যে কাঁদছে; তাই বুঝলাম না, কোসিমা কি বলছেন!

কোসিমা আর কিছু বললেন না, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন শুধু।

আর্নষ্ট হেকেলের ইংরেজী অনুবাদ পড়েছিলাম লণ্ডনে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য তিনি আমার চোখের সুমুখে তুলে ধরেছিলেন

সেই হেকেল তাঁর নির্ভীক উক্তির জন্য বার্লিন থেকে নির্বাসিত। তিনি থাকেন বেরুথের কাছে! তাঁকে চিঠি লিখলাম, তিনি যদি বেরুথে আসেন, তাঁর সঙ্গে তাহলে দেখা হয়।

হেকেল লিখলেন, তিনি আসছেন।

বৃষ্টি ঝরছে সকাল থেকে। গাড়ি নিয়ে নিজেই স্টেশনে গেলাম। জার্মানীর সেরা জ্ঞানী হেকেল, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা হেকেল, তাঁকে বরণ করে আনতে হবে। ট্রেন থেকে নামলেন সেরা জ্ঞানী। ষাট বছরের উপরে বয়েস, কিন্তু কি স্বাস্থ্য। তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন। তার পর জড়িয়ে ধরলেন বুকে। নাকে এসে লাগল তাঁর দেহের আর শক্তির সুগন্ধ, তাঁর বুদ্ধির সুগন্ধ আমার মন ভরে দিলে।

বাড়ি নিয়ে এলাম। ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিলাম তাঁর ঘর। তারপর ছুটলাম ফ্রাউ কোসিমাকে খবর দিতে। গিয়ে বললাম,

জানেন ফ্রাউ কোসিমা, আমার অতিথি হয়েছেন হেকেল। তিনি উৎসবে হাজির থাকবেন।

কোসিমা নীরব। শেষে বললেন, উনি তো ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন।

বললাম, উনি নাস্তিক বলেই তো ভাগনারের এ উৎসব সার্থক হয়ে উঠবে।

কোসিমা শিউরে উঠলেন, না, না! আমার স্বামী নাস্তিক ছিলেন না। তিনি দেয়ালে ঝোলানো ক্রুশখানির দিকে তাকালেন।

হেকেল আমার অতিথি। তাঁকে নিয়ে এলাম উৎসবে। তিনি আমার নাচ দেখলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি বিজ্ঞানী, উপকথায় তাঁর মন উঠবে কেন?

হোন তিনি সেরা জ্ঞানী, জার্মান সম্রাট কাইসারের আদেশে তিনি নির্বাসিত। তাই কেউ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে না। শেষে নিজেই তাঁর সম্মানে এক ভোজ দিলাম। সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন বুলগেরিয়ার রাজা ফার্দিনান্দ। হেকেল সেখানে বললেন আমার নাচের কথা। তাঁর মতে ক্রমিক উন্নতির যে উৎস জগত সৃষ্টি করেছে, আমার নাচের উৎসও সেইখানে।

ভোজ শেষ হ'ল শেষ রাতে। কিন্তু ভোর না হতেই ওঠা হেকেলের অভ্যেস। তিনি আমাকে এসে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, চল, ঐ পাহাড়ের উপর বেড়াতে যাই!

পথে বেরিয়ে বলতে লাগলেন প্রতিটি পাথর আর গাছপালার কথা। অবাক হয়ে গেলাম। সব কিছুই কি জানেন হেকেল?

হেকেল চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে এসে নিজেকে অনেক বড় বলে মনে হ'ল। নিজের নাচের আধ্যাত্মিক দিকটাই এতদিন দেখেছি, এবার দেখতে পেলাম তাঁর বিজ্ঞানের দিকটা। আত্মার অনুভূতির সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলন হ'ল।

উৎসবে ভাগ্‌নারকে মূর্ত করে তুললাম। রসিকমহল খুশী। রাজা ফার্দিনান্দ তো বলে বসলেন, তোমার যা খুশি আমার কাছে চাইতে পার—আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব।

বললাম, আমার মনের সাধ, জনগণের ছেলেমেয়েদের জন্য খুলব এক নৃত্য প্রতিষ্ঠান।

তিনি বলে উঠলেন, তুমি চলে এস বুলগেরিয়ায়, আমি আমার কৃষ্ণ-সাগরের তীরের প্রাসাদ তোমাকে ছেড়ে দেব।

বললাম, মনে রইল আপনার কথা।

বেরুথের উপকথার স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এল। থোড্ চলে গেছেন। আমি এবার সারা জার্মানী ঘুরব। বেরুথ ছেড়ে চললাম। কিন্তু বিষ নিয়ে চললাম রক্তে। কিসের বিষ? অন্ধ কামনার বিষ, অনুতাপ। ভালবাসা মৃত্যুকে বরণ করে—এই অনুভূতির বিষ। আনন্দ আমার জীবন থেকে বুঝি মুছে গেল—কোথায় সেই আদিম অনাবিল আনন্দ!

হাইডেলবুর্গে থোডের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর ছাত্রদের কাছে বললেন আমার নৃত্যকলার কথা। আমি তাদের এক মজলিসে নাচলাম।

ফ্রাউ থোডও আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। চমৎকার মহিলা, কিন্তু বার বার মনে হ'ল থোডের যোগ্যা সঙ্গিনী নন। বড় বেশি সংসারী, স্বপ্নের ঘোর নেই চোখে। তাই তো থোড্ তাঁকে নিয়ে খুশি নন। শেষজীবনে তাই এক বেহালা-বাজিয়ে মেয়ের প্রেমে পড়ে তাঁকে ছেড়ে চলে যান।

যা'হোক, আমার প্রতি মহিলাকে সদয় বলেই মনে হ'ল। ঈর্ষা থাকলেও, সেটা দেখালেন না।

থোড্‌কে যে ভালবেসেছে, সে-ই জানে ঈর্ষা কি। কত তার তীব্রতা! থোড্ এমনি পুরুষ যাকে দেখলে সবাই ভালবাসবে। তিনি যেন চুম্বক, সবাইকে টেনে কাছে আনছেন। কিন্তু থোড্‌কে পেলাম বটে, তাকে তো দেহে এনে বসাতে পারলাম না। শুধু তাঁর ঠোঁটের স্পর্শ পেলাম, চোখে, মুখে, ঠোঁটে—কিন্তু তবু তিনি আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ভালবাসার রাগিনীর ঝংকার তুলে দিলেন। স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলাম। খিদে চলে গেল, দেহ যেন সব সময়েই মূর্চ্ছা-বিবশ, নৃত্যে

যেন রহস্যের আমেজ লাগ । আর তো সে উদ্দীপনা নেই, নেই আনন্দের নির্ঝর ধারা। উপকথার বিষ আমাকে কুরে খেতে লাগল।

এমন দশা হ'ল, রাতে একা শুয়ে আছি বিছানায়, এমন সময় তাঁর ডাক যেন শুনতে পেতাম। আর ভাবতাম, কাল তাঁর চিঠি আসবে। ঠিক চিঠি এসেও হাজির হোত। বিরহে নীল হয়ে গেলাম, শুকিয়ে গেলাম। ঘুমোতে পারিনা, খাইনা—দাইনা, শুধু তাঁর স্বর শুনি। তঁর চোখ দুটো আঁধারে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, ইসাডোরা, কাছে এস, এস! অমনি ছুটে যাই। এমনি করে চলল দিনের পর দিন। এমন সময় আমার ম্যানেজার নিয়ে এল খবর। রাশিয়া যেতে হবে।

তবু যেতে ইচ্ছে করে না। শেষে রাজী হলাম। মন ভারি, শুধু শুনছি হাইনিরিকের স্বর—ইসাডোরা, ফিরে এস, ফিরে এস! আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। শেষে গাড়ি জার্মানীর সীমারেখা পার হ'ল। এখন শুধু তুষারময় প্রান্তর, অরণ্য। সূর্যের আলোয় জ্বলছে তুষার, হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। আমার উত্তপ্ত মগজ শীতল হয়ে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

স্বপ্নে দেখি, ট্রেনের জানালা গলিয়ে লাফিয়ে পড়েছি তুষারের উপর। নগ্ন আমার দেহ, তুষারের আলিঙ্গনে আমি আবদ্ধ। তুষারের ঢেউ আমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, মন অনেক সুস্থ, হাইনিরিকের স্বর আর কানে আসে না।

জানি না, ফ্রয়েড এ স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা করবেন?

পনেরো

কথা ছিল, বিকেল চারটেয় গিয়ে পৌছব সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, কিন্তু তা হ'ল না। পথে তুষার-ঝড় শুরু হয়ে গেল। পরদিন ভোর চারটেয় এসে ট্রেন পৌছল।

স্টেশনে কেউ আসেনি।

ভোরের তুষারে স্তব্ধ, জনবিরল স্টেশন।

ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। আবহাওয়া এখন শূন্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে দশ ডিগ্রি। কি ঠাণ্ডা! রুশ গাড়োয়ানরা কোচ বাক্সে বসে বসে দস্তানা-মোড়া হাত ঘসছে। নইলে হাত অসাড় হয়ে যাবে, ঐ তুষারের মতো জমে যাবে রক্ত।

কোটটা চাপিয়ে লটবহর নামালাম কুলি দিয়ে। আমার সঙ্গে আছে পরিচারিকা। তাকে মালপত্রের পাহারায় রেখে একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে বসলাম। বললাম—হোটেল ইউরোপায় চল!

আঁধার উষা। কালো আকাশ, তুষারময় পথঘাট। কালো রাত্রির যেন ঢল নেমেছে পিটার্সবুর্গের উপর। আমি চলেছি জনবিরল পথে একা। ঘোড়াগুলি ছুটতে পারছে না, আস্তে আস্তে চলেছে। হঠাৎ কি দেখলাম!

এক লম্বা মিছিল এগিয়ে আসছে। কালো পোষাক-পরা মানুষের সার নিঃশব্দে চলেছে। যেন ছায়াময় তারা। এ যেন কোন্ অলোকের ছায়া এডগার এলান্‌পোর গল্প থেকে বেরিয়ে এল। নীরবতা আরো ঘন হয়ে উঠল, কালো উষা আরো কালো হয়ে গেল।

কফিনের সার নিয়ে চলেছে মিছিল, নুয়ে পড়ছে মানুষগুলি। মুখে শব্দ নেই। নীরবতা দুলে দুলে উঠছে। ঝরছে তুষার।

গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে দিলে। নুয়ে পড়ে হাত দিয়ে বুকের উপর ক্রুশের চিহ্ন আঁকলো। আমি তাকিয়ে আছি। আবছা উষার আঁধারি-আলো যেন ভীতিময় হয়ে উঠেছে।

ওকে শুধালাম, কি ব্যাপার?

রুশ ভাষা জানি নে, তবুও ও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে।

কাল গেছে ১৯০৫ সালের পাঁচই জানুয়ারী। মজুরের দল মহামান্য জারের শীত প্রাসাদে তাদের দুখ-দুর্দশার কথা জানাতে যায়। তারা চেয়েছিল জরু আর

ছেলেপিলের জন্য রুটি। রুটির বদলে জারের পুলিশ সেই নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী চালায়। কত লোক মরে যায়। আজ চলেছে তাদের শবযাত্রা।

গাড়োয়ানকে বললাম, গাড়ি রাখ, দেখি—দেখি—চোখ ভরে দেখি এই দুঃখের নগ্নরূপ—দেখি জারতন্ত্রের এই বর্বর অত্যাচার!

চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। জল তুষার হয়ে গেল তুহিন হাওয়ায়।

তাকিয়ে রইলাম।

দীর্ঘ—দীর্ঘ মিছিল আমার পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে চলে গেল। কালো বেশধারী মজুরের দল, নুয়ে পড়েছে কফিনের ভারে। কিন্তু মুখ তুলে ওরা তাকালে না। তবু যেন শত শতাব্দীর ম্লানিমার ভিতরে ওদের চোখে কিসের ঝিলিক দেখতে পেলাম! সে ঝিলিক আমি চিনি—আমি বিপ্লবী ইসাডোরা—চিনবো না?

কেন ওরা আঁধারে চুপি চুপি নিয়ে চলেছে শহীদদের?

কেন?

জারতন্ত্রের হুকুম।

নইলে যে বিপ্লব বজ্রনির্ঘোষে গর্জন করে উঠবে। দিনের আলো তাই ওদের জন্য বিধি-নিষেধের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কালো ঊষায় ওরা চলেছে শবযাত্রায়।

গলা বুজে এল।

ক্রোধে জ্বলে উঠলাম। এই তো রাশিয়া—এই তো—এই তো তার মানুষের হাল! জার, ওদের খুদে ভগবান জার। সেই খুদে ভগবানের স্বেচ্ছাচার ওরা মাথা পেতে নেয়, জীবন দেয়। কিন্তু তবু তো সেই ভগবানের আসন টলিয়ে দেয় জনতার দীর্ঘশ্বাস, তাদের আবেদন। আজ যা আছে আবেদন-নিবেদন—কাল হয়তো সে-আবেদন-নিবেদনের পালা ফুরোবে, দেখা দেবে অমোঘ দাবী।

দেখলাম, চোখ ভরে দেখলাম। যদি দেরী করে না আসতো গাড়ি, ইউরোপা হোটেলে, কি অভিজাত নৃত্যশালায় বসে শুনতাম ফিসফিসানি, দেখতে তো পেতাম না এই শহীদ-বীরদের শবযাত্রা!

আঁধার রাত্রি, শোকের রাত্রি
ঊষার উদয়ের আভাস তো নেই;
শোকের যাত্রা চলেছে।
সজল চোখ, শ্রমে কড়া-পড়া হাত

চেপে ধরছে বার বার ছেঁড়া কালো র‍্যাপারে
নিজেদের ফোঁপানি, গোঙানি। তাদের সাথীদের
মৃতদেহের পাশে পাশে নিঃশব্দে তারা চলেছে।
আর দু'পাশে চলেছে রক্ষীদল।

যদি না দেখতাম, জীবন তো অন্য খাতে বয়ে যেত। এই দীর্ঘ শোকযাত্রার দিকে তাকিয়ে রইলাম, মনে মনে শপথ করলাম, আমার সমস্ত শক্তি ঢেলে দেব এই পদদলিত মানুষের জন্য, নিজেকে আমি উৎসর্গ করব। যদি আমার শিল্পকলা তা না পারে, কি হবে তাকে দিয়ে!

শেষ মানুষটি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, শেষ শবাধারটি। গাড়োয়ান আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল! সে আবার ক্রুশের চিহ্ন আঁকলো বুকে, অসীম ধৈর্যের দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে। এবার ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল, গাড়ি ছুটে চলল হোটেলের পথে।

হোটেলে এসে নির্জন কামরায় বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেদিন কৃষ্ণ উষা যে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল, তা তো ঘুমিয়ে পড়ল না। সে তো রইল আমার জীবনে বহ্নিমান হয়ে।

জেগে উঠে দেখি, আমার ঘর ফুলে ফুলে ভরে গেছে! ফুল দেখে ভাল লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, এ ফুল দিয়েছে নীল রক্তের দল। জনতা দেয় নি। মনমরা হয়ে পড়লাম।

তবু নাচের আসর বসল। শ্যপাঁর দেশাত্মবোধক সুর পলেনেইয়স্ মূর্ত করে তুললাম নাচে। পিটার্সবুর্গের নীলারক্তরা দেখেছেন, জাঁকজমকভরা পরিবেশে ব্যালে নৃত্য, এই প্রথম দেখলেন এক সাদাসিদে নীল পর্দার সুমুখে দাঁড়িয়ে নাচছে একটি মেয়ে। পরনে তার রামধনু রঙের বেশ নেই, শুধু এক সামান্য গাত্রাবরণ। আমি শ্যপাঁর সুরে নিজেকে মিলিয়ে দিলাম, আমার আত্মা কেঁদে উঠল দুঃখে, কৃষ্ণ উষার আঁধারে শহীদদের শবযাত্রার কথা মনে পড়ল। তাইত আত্মা বজ্র-গর্জন করে উঠল। অভিজাত সমাজ সেই বিপ্লবের তূর্যধ্বনি শুনে হাততালি দিলে, হর্ষধ্বনি করে উঠল। সত্যিই অদ্ভুত!

পরের দিন দেখা করতে এলেন বিখ্যাত ব্যালে নর্তকী কিচিনস্কী। আমি ব্যালে পছন্দ করিনে, তবু তাঁর আহ্বান তুচ্ছ করতে পারলাম না। অপেরায় হাজির হলাম।

ব্যালের আমি শত্রু, আমি তাকে নাচ মনে করিনে, নাচের ছলনামাত্র বলে মনে করি। কিন্তু তবুও বিচিত্র পটভূমিকার সুমুখে বিচিত্র বেশে কিচিনস্কীকে দেখে ভাল লাগল। তিনি যেন মঞ্চে মানুষ নন, এক বহুবর্ণী প্রজাপতি।

ব্যালের পরে কিচিনস্কীর ভবনে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে গ্র্যাণ্ডডিউক মিকায়েলের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাঁকে বললাম,

আমি তো জাঁকজমক চাইনে। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, জনগণের জন্য এক কলালক্ষ্মীর কেন্দ্র খুলব।

মিকায়েল হয়তো ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু তাঁর আভিজাত্যের আড়ালে ঢাকা পড়ল সে-ক্ষুব্ধতা। তিনি আমার সঙ্গে তবু আলাপ করে চললেন।

এমনি পার্টি চলল রোজ। রোজ ব্যালে দেখা। আবার কখনো বা আমার নাচ।

সুন্দরী প্যাবলোভার সঙ্গে দেখা হল। ইম্পিরিয়াল ব্যালে স্কুল লালন-পালন করেছিল এক সামান্যা মেয়েকে—সে আজ অসামান্যা—জগতের সেরা ব্যালেরিনা। তাঁকে দেখলাম, মনে হ'ল ইস্পাতের মতোই মজবুত তার দেহ। আবার ইস্পাতের মতোই নমনীয়। না, না, ইস্পাত বুঝি নয়, স্প্রিঙের মতোই নিজেকে সে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে একাকার করে দিতে পারে। নাচ দেখে হাততালি না দিয়ে পারিনি, কিন্তু তবু এতো কসরৎ। এখানে আত্মার বিকাশ কোথায়?

নাচের পরে আমার তো ক্লান্তি আসে না, মন আনন্দে ভরে যায়, অথচ প্যাবলোভাকে দেখলাম, মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে। খিদে চলে গেছে।

পরের দিন গেলাম ইম্পিরিয়াল ব্যালে স্কুলে। সারি সারি মেয়ে সেই ভোরে দাঁড়িয়ে কসরৎ করছে। বিরাট নৃত্যশালা, সাদা দেয়াল, কোথাও শ্রী নেই। শুধু জারের মস্তবড় একখানা ছবি টাঙানো। আর সেখানে চলছে কসরৎ। এ যেন বন্দীশালা। বার বার মনে হ'ল, এইখানে এমনি করে কসরৎ করেছেন একদিন কিচিনস্কী, প্যাবলোভা—তাঁদের প্রতিভা কসরতে-কসরতে শেষ হয়ে গেছে। যদি এই স্কুল না থাকতো, কতবড় হতে পারতেন তাঁরা—নৃত্যে আনতে পারতেন জীবনের ছন্দ, অনুশাসনে ঘেরা জীবন থেকে মুক্তির স্বপ্নে জাগিয়ে তুলতে পারতেন মানুষকে! হায়, তা তো হল না। তাঁদের প্রতিভাকে তিলে তিলে হত্যা করল এই স্কুল। জারতন্ত্র যেমন জনগণের শত্রু, তেমনি প্রকৃতি এবং শিল্পকলার শত্রু এই জারতন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত ইস্কুল।

সেণ্টপিটার্সবুর্গ থেকে এলাম মস্কৌয়ে। আমাকে বরণ করে নিলে না মস্কৌ। সন্দেহ-সংশয় নিয়ে প্রতীক্ষায় রইল। সেদিনের কথা লিখেছেন বিখ্যাত প্রযোজক স্তানিস্লাভস্কী।

তারিখটা ঠিক মনে নেই। আমার সঙ্গে মহিমময়ী ইসাডোরার পরিচয় হ'ল। তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, কোনোদিন নামও শুনিনি। হঠাৎ গিয়ে নাচের আসরে হাজির হয়েছিলাম।

এসে দেখলাম দর্শক কম, কিন্তু বাছাই করা। যত বড় বড় শিল্পী আর সাহিত্যিক এসে জড়ো হয়েছেন। ভাস্কর মামন্তভ তাঁদের দলপতি।

ইসাডোরা এসে এবার মঞ্চে দাঁড়ালেন। অর্ধনগ্ন মেয়ে, এমন তো কখনো দেখিনি। এ আবার কি নাচ ?

প্রথম নাচ হয়ে গেল। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষীণ সাড়া জাগল। কেউ বা সিটি মারতে চেষ্টা করলে। তারপরে আরো কয়েকটা নাচ হ'ল। আস্তে আস্তে মনে হল, উদাসীন থাকতে দেবে না এ মেয়ে। ওর পায়ের তালে তালে আমার আত্মায় যেন ছন্দ জাগছে! একি জীবনের ছন্দ ? হর্ষধ্বনি করে উঠলাম!

বিরতির সময় এল, তখনো আমি ইসাডোরার ভক্ত। পাদপ্রদীপের সুমুখে ছুটে গেলাম। ওকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে। দেখি আমার পাশে মামন্তভ আর একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক।

দর্শকরা তো অবাক! গুঞ্জনধ্বনি স্তব্ধ হ'ল। এবার সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ তাকে বরণ করে নিল।

তারপর থেকে ইসাডোরা যে ক'দিন ছিলেন, একটা নাচের আসরও বাদ দিইনি।

ওঁর নাচের উৎস আবিষ্কার করলাম, আমার নাটক প্রযোজনার উৎস তো এক এবং অভিন্ন।

প্রথম বারে ওঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল না। দ্বিতীয় বারে উনি এলেন আমাদের থিয়েটারে।

ইসাডোরার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি তাঁর নাচের আদর্শের কথা বললেন। কিন্তু অসংলগ্ন সে-কথা। হঠাৎ পেয়ে গেছেন তাঁর নাচের ভাবধারা, তাই বলতে পারেন না। আমি তাঁকে শুধালাম,

আপনাকে কে নাচ শেখালেন ?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি যেদিন থেকে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছি, সেদিন থেকেই নাচছি। সারা জীবন আমি নেচেছি! মানুষকে তো নাচতেই

হবে। এইতো নিয়ম। কিন্তু মানুষ তা বোঝেনা, এই জৈব প্রয়োজনকে অস্বীকার করে।

এর পরে আর কোনো প্রশ্ন চলে কি ?

আর একবার নাচের পরে সাজঘরে গেছেন দর্শকেরা, তখন তিনি বললেন,

আমার প্রস্তুতিতে আপনারা বাধা দিতেই এসেছেন। আমি তো ওভাবে নাচতে পারিনে। মঞ্চে ঢোকার আগে আমার আত্মায় আমি একটা মোটর বসিয়ে নিই। যখন মোটরটা চলে, অমনি আমার হাত-পা, সমস্ত দেহ আপনা থেকেই চলতে থাকে। কিন্তু যদি মোটর বসাতে সময় না পাই, তাহলে তো নাচতেই পারিনে।

আমিও তখন সৃষ্টির ঐ মোটর বা ইঞ্জিনটার খোঁজ করছিলাম। মঞ্চে ঢোকার আগে অভিনেতাকে ওটি বসিয়ে নিতে হবে। তাই ইসাডোরাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম। ওঁর নাচেব সময় ওঁকে লক্ষ্য করলাম। ভাবাবেগ মুখখানাকে বদলে দেয়, দীপ্ত হয়ে ওঠে চোখ দুটি—অভিব্যক্তি ওঁর আত্মায় রূপ পায়। আমার সব দেখেশুনে মনে হ'ল, আমরা একই জিনিস খুঁজছি—যদিও শিল্পের শাখা আলাদা।

ব্যালে দেখে যত ভয় পেয়েছিলাম, স্তানিস্লাভস্কীর থিয়েটারে এসে সে ভয় চলে গেল, মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, থিয়েটারে আমার নৃত্যধারা প্রবর্তন করবেন এই তাঁর ইচ্ছা।

সারাদিন তিনি থিয়েটারে মহলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, সন্ধ্যের সময় আসতেন আমার কাছে। তিনি প্রশ্নে প্রশ্নে আমাকে ব্যস্ত করে তুলতেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রশ্নে কখনো ক্লান্তি আসে নি! আমার আদর্শ আমি তো সবাইকে বোঝাতে চাই—আবার যদি শ্রোতা হয় স্তানিস্লাভস্কীর মতো মানুষ, তাহলে তো কথাই নেই।

রাশিয়ার প্রচুর খাবার, তুষার হাওয়া আমার শীর্ণতা দূর করে দিলে। থোড্‌কে ভুলে গেলাম না, কিন্তু বিরহের জ্বালা দূর হ'ল। এবার মন চাইলে এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে। স্তানিস্লাভস্কী সেই মানুষ।

একদিন রাতের কথা বলি। তিনি এসেছেন, আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সুন্দর পুরুষ, চওড়া কাঁধ, সুঠাম দেহ, কালো চুল, কপালের কাছে

পাক ধরেছে। আমার ভিতরে হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। রোজ যাঁকে দেখি, তাঁকে আজ নতুন চোখে দেখলাম। তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাঁধে হাত রাখলাম! তারপরে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম গলা, মাথাটা কাছে টেনে এনে ঠোঁটের উপর এঁকে দিলাম চুমু। তিনি সস্নেহে আমাকে চুমু খেলেন। কিন্তু চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়। তাঁকে এবার আরো কাছে টেনে আনতে গেলাম, তিনি চমকে উঠে আমার বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। বলে উঠলেন,

কি করছ ইসাডোরা—যদি সন্তান আসে, তখন কি হবে?

অবাক হয়ে বললাম, সন্তান—সন্তানের কথা কি বলছেন?

আমাদের সন্তান—তোমার আর আমার সন্তান। সে সন্তান নিয়ে আমরা কি করব?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

স্তানিস্লাভস্কী বলতে লাগলেন, আমার সন্তান, আমার পরিবারের বাইরে মানুষ হবে, তা আমি সইতে পারিনে ইসাডোরা। আবার তাকে আমার পরিবারেও তো ঠাঁই দেওয়া চলবে না।

অদ্ভুত মানুষ! আমি তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছি, আর তিনি অমনি নিজেকে সন্তানের কথা ভেবে মুক্ত করে নিলেন! গম্ভীর মুখে সেই কথাই আমাকে বোঝাচ্ছেন? হাসি আর চাপতে পারলাম না। হেসে উঠলাম, তিনি আরো অপ্রতিভ হলেন। আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। দেখলাম বারান্দা ধরে ছুটে চলেছেন।

হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লাম সোফায়। আবার রাগও হ'ল। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মোলাকাতের পর মানুষ অনেক সময় কু-পল্লীতে ছোটে কেন তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি মেয়ে, রাতটা ছটফট করে কাটিয়ে দিলাম। ভোরে উঠেই ছুটলাম এক হামামে। সেখানে ঠাণ্ডা আর গরম জলের ধারায় দেহ আর মন আমার সুস্থ হ'ল।

স্তানিস্লাভস্কীকে ধরা গেলনা, কিন্তু মস্কোর বহু অন্তঃসার শূন্য তরুণ এসে ধরা দিতে চাইলে। তাদের সঙ্গ তো আমাকে বিরক্ত করে তুলল, আমার কামনাকে তুষারের মতো জমিয়ে দিলে। হালি আর থোডের ভালবাসা আমি পেয়েছি, স্তানিস্লাভস্কীই তারপরে আমার প্রেমিক হতে পারেন, এরা তো নয়। বহু বছর পরে স্তানিস্লাভস্কীর স্ত্রীর কাছে গল্পটা করি। তিনি অমনি বলে

উঠলেন, ঠিক ওঁর মতো কাজই করেছেন! ইনি জীবনটাকে তুচ্ছ করতে পারেন না।

তারপর স্তানিস্লাভস্কী আর একা কখনো রাতে আমার ঘরে আসতেন না। কিন্তু দিনের বেলা দেখা হোত। দু-একটা চুমু খেতাম, তারপরেই সেই দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ। একদিন কি জানি কি হ'ল। এসে বললেন,

চল ইসাডোরা, আজ বেড়াতে যাই।

একখানা খোলা গাড়িতে দু'জনে উঠে বসলাম। শহরের বাইরে এক রেস্তরাঁয় গিয়ে উঠলাম। সেখানে এক নির্জন কামরায় দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হ'ল। ভোদ্‌কা আর শাম্পেনের গোলাপী নেশায় মশগুল হয়ে দুজনে শিল্প সম্বন্ধে কত কথাই হ'ল। কতবার ওঁকে আমার কামনা জানালাম। কিন্তু স্তানিস্লাভস্কী চুমুর বেশি এগুতে চান না। ওঁর এই পবিত্রতা কে ভাঙতে পারে কে জানে!

মস্কো থেকে কিয়েভ-এ এলাম। থিয়েটার থেকে নাচের পরে বেরুচ্ছি, একদল ছাত্র এসে আমার পথ জুড়ে দাঁড়াল। শুধালাম,

কি চাও তোমরা?

ওরা জানালে, তোমার নাচের টিকিটের চড়া দাম, অভিজাতরাই তা দেখে, আমরা দেখতে পাইনে। তুমি যদি আমাদের জন্য নাচতে চাও, তাহলে আমরা তোমার পথ ছেড়ে দেব। নয়তো এই বসে রইলাম।

আমি গাড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, রুশ ছাত্র-ছাত্রীরা শিল্পকলার সাধক-সাধিকা। তাঁরা যে দাবি জানিয়েছেন, সে দাবি আমি রাখব। আমি নাচব তাঁদেরই জন্য। চড়া দামের টিকিট আর কাল থেকে রইল না। এসো, তোমরা এসো—জনতাকে নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য নাচব! তোমরাই তো আমার আসল সমঝদার। আমি তো তোমাদেরই একজন।

ওরা হাততালি দিলে।

ওদের দেখালাম নাচ, ওরা খুশি হ'ল। আমার মন খুশিতে ভরে উঠল।

কিয়েভ থেকেই এবার রাশিয়ার কাছে বিদায় নিতে হ'ল। বার্লিনে ডাক পড়েছে, সেখানে যেতে হবে।

ষোলো

বার্লিনে এলাম, আমার চিরদিনের সাধ এবার পূর্ণ হ'ল। নাচের ইস্কুল খুলে বসলাম। ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কাগজে দিলাম বিজ্ঞাপন। আমার ম্যানেজার চটে উঠলেন। তিনি তখন আমার দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখছেন। বললেন, তুমি তোমার ভবিষ্যত মাটি করছ ইসাডোরা। একবার গ্রীসে এক বছর গেছে, এবার আবার ক'বছর যায় কে জানে!

এদিকে কোপানসে কলালক্ষ্মীর মন্দির উঠছে, রেমণ্ড সপ্তাহে সপ্তাহে খবর পাঠাচ্ছে—আরো টাকা চাই। কুয়োয় জল উঠছে না, তাছাড়া মন্দির গড়ার খরচা বাড়ছে। শেষে আমি লিখলাম, মন্দির থাক, তুমি চলে এস।

রেমণ্ড চলে এল। মন্দির আর গড়া হ'ল না। আজও তেমনি অসমাপ্ত মন্দির পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। শুনেছি বিপ্লবীদের নাকি ওটি সাময়িক ডেরা। ভবিষ্যতের আশায় দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। ডানকান-বংশ গড়তে পারল না, তাঁদের আবদ্ধ কাজ হাতে তুলে নেবে জনগণ—তারা গড়ে তুলবে অভ্রভেঙ্গী কলালক্ষ্মীর মিনার।

কোপানস গেছে যাক, বার্লিনের ইস্কুলই হবে আমার কলালক্ষ্মীর কেন্দ্র। আমি জগতকে শেখাব নৃত্য—এই তো আমার পণ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর দলে দলে ছেলেমেয়ে নিয়ে আসতে লাগল বাপ-মার দল।

একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, আমাদের বাড়ির সমুখের পথ ভরে গেছে।

এত ছেলেমেয়ে বাছাই করি কি করে! চল্লিশটি ছেলেমেয়ে আমার চাই। সুন্দর দুটি চোখ বা মিষ্টি হাসি দেখে বাছাই করতে লেগে গেলাম। ওরা নাচতে পারবে কিনা সেকথা একবারও ভেবে দেখলাম না।

পরদিন হামবুর্গে গেছি, সেখানে আমার হোটেলে একটি লোক এসে হাজির হ'ল। সে এসে আমার টেবিলের ওপর একটি বাণ্ডিল রাখলে। আমি বাণ্ডিলটি খুলতেই দেখলাম, চার বছরের একটি শিশু—দুটি ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

শিশুটির মুখে রা নেই।

লোকটি বললে, আপনি কি ওকে আপনার ইস্কুলে ভর্তি করে নেবেন ?

বড় তার তাড়া, দাঁড়াতে চায় না। শিশুটির মুখে লোকটির যেন আদল দেখতে পেলাম। কি ভেবে বললাম, হাঁ, ওকে আমি রাখব।

লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকে আর কখনো দেখিনি।

হামবুর্গ থেকে বার্লিনে রওনা হলাম, পথে টের পেলাম শিশুটির খুব অসুখ। ডাক্তার হোফা আমাদের বন্ধু, তিনি তো অনেক করে তাকে সারিয়ে তুললেন। শুধু এই একটি নয়, বহু রুগ্ন শিশুই এসে আমাদের ইস্কুলে হাজির হ'ল। তাদের নাচ শেখাব কি, রোগের সেবা করেই অস্থির। হোফা তো একদিন বলেই বসলেন,

তোমার এটা তো স্কুল নয়, হাসপাতাল। এই সব ছেলেমেয়েরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছে রোগ, ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই যথেষ্ট সেবা আর যত্ন। এই করেই তো দিন কাটবে, নাচ শেখাবে কখন ?

হেসে বললাম, আপনি যখন আছেন, তখন ভয় নেই। দেখবেন ওরা শীগ্গীরই সুস্থ, সবল হয়ে উঠবে।

সত্যিই ওরা শীগ্গীরই সুস্থ সবল হয়ে উঠল ডাক্তার হোফার সেবায়, ওদের তিনি নিরামিষ খাবার বরাদ্দ করলেন।

এদিকে বার্লিনে রটে গেল, আমি নাকি দৈবশক্তির বলে রোগ সারাতে পারি ! দলে দলে রোগী আসতে লাগল আমার কাছে। আমি একজন সাধুসন্ত হয়ে উঠলাম।

একদিন নাচের পরে বাড়ি ফিরছি, দেখি পথ ভরে গেছে ছাত্রের দলে। তারা আমার গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরা টেনে নিয়ে চলল। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললাম,

কলালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে। কিন্তু এই বার্লিনের দিকে তাকিয়ে দেখ। দেখ—সেই স্থাপত্যের নামে চারিদিকে কি কদর্যতা ! চেয়ে দেখ ভাস্কর্যের নামে কত সব কুশ্রী মূর্তি দিয়ে সাজিয়েছেন তোমাদের নেতারা ! তোমরা ছাত্র, তোমরা কি পার না এই অসুন্দর, এই কুৎসিতকে ধ্বংস করতে। এ তো জনগণের সৌন্দর্যবোধের নিদর্শন নয়, কাইসারের বিকৃত মানসের নীচ বীভৎস উদাহরণ।

ছেলেরা ক্ষেপে উঠল, তারা ভেঙে-চুরে দেবে এই নগর, সেখানে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু পুলিশ এসে বাধা দিলে। কাইসারের পুলিশ, কাইসারের বীভৎসতাকে বাঁচিয়ে রাখলে।

বার্লিনেই আছি। স্কুল চলছে। নাচও চলছে।

নাচের সময় আমি তো প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের দেখতে পাইনে, আমার মনে হয় গণদেবতা বসে আছেন আমার বিচারক হিসেবে, আমার আত্মা তাই পরম বিকাশের কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

সেদিন রাতেও নাচছিলাম গণদেবতার সুমুখে, মনে হল সামনের সারে একজন বিশেষ কেউ যেন বসে আছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আমাকে টানছে। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু মনে সাড়া জাগল। নাচ শেষ হ'ল, বাড়ি ফিরে এলাম। এসে সবেমাত্র বসেছি এমন সময় ঘন্টি বেজে উঠল।

তিনি এসে হাজির হলেন। সুন্দর পুরুষ, কিন্তু রোষরক্তিম তাঁর মুখ, দুই চোখ।

এসেই পুরুষটি বললেন, চমৎকার তুমি—তুমি তো পরম বিস্ময়! কিন্তু এ তোমার নিজের নয়, আমার কাছ থেকে চুরি করেছ ভাবধারা। আমার এই দৃশ্য-পরিকল্পনার রীতি তুমি কোথায় পেলে?

বললাম, এ আপনি কি বলছেন? আমার নিজের পরিকল্পনা মতোই আমি এসব করেছি। আমার এই নীল পর্দা, আমারই মৌলিক চিন্তার ফল। আমার যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন এই নীল পর্দা আমি আবিষ্কার করি, তখন থেকেই এর সুমুখে আমি নাচছি।

না, না, ঐ নীল যবনিকা আমার সৃষ্টি, আমি মনে মনে কল্পনা করেছি। তুমি কি আমার স্বপ্নকে রূপ দিতে এলে? তবে কি তাই? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি আমার মূর্তিমতী স্বপ্ন।

আপনি কে, বললেন না তো? শুধু জিজ্ঞেস করলাম।

আমি এলেন টেরীর ছেলে গর্ডন ক্রেইগ।

এলেন টেরী! নাম শুনে চমকে উঠলাম। য়ুরোপের মানসসুন্দরী টেরী, বিশ্বের কামনার ধন!

মা বললেন, আপনি যখন ইসাডোরার শিল্পের অনুরাগী, আমাদের এখানে আজ খেয়ে যেতে হবে।

ক্রেইগ তখনি রাজী হয়ে গেলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। মা আর ভাই-বোনেরা শুতে চলে গেল ক্রেইগ তখনো মঞ্চ-শিল্পের কথা বলছেন। হাত নাড়ছেন, মুখে নানা ভাবের খেলা।

হঠাৎ বলে উঠলেন,

তুমি মহান শিল্পী, এখানে এই পরিবারের মধ্যে পড়ে আছ কেন? এখানে তো তোমার ঠাঁই নয়। তোমাকে তো আমি সৃষ্টি করেছি ইসাডোরা, তুমি আমারই তৈরী দৃশ্যাবলীর আত্মা। তোমার তো এখানে স্থান নয়!

হেসে বললাম, তবে স্থান কোথায়?

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ক্রেইগ, কলালক্ষ্মীর যে-বিহার আমি সৃষ্টি করেছি। সেখানে—এখানে তো নয়।

ক্রেইগ দীর্ঘদেহ, সুন্দর পুরুষ, তনু দেহ তাঁর উইলো শাখার মতোই নমনীয়—তাঁর দেহ দেখলে তাঁর মার কথাই মনে পড়ে। মার চেয়েও তিনি বুঝি সুকুমার। মুখে যেন কোথায় আছে নারীত্বের ইঙ্গিত, বোধ হয় ঠোঁটের চারিপাশে। ঠোঁট দুটি পাতলা, স্পর্শকামনায় উন্মুখ। আর মাথায় একরাশ সোনালি চুল। চোখে পুরু চশমা, কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে ইস্পাতের নীল জ্যোতির ঝিলিক দেখা যায়। দেখলেই মনে হয় সুকুমার পুরুষ, নারীসুলভ, কিন্তু নারীর দাস নয়, তার প্রভু। হাতের আঙুলে আছে সেই প্রভুত্বের ইঙ্গিত, শক্তির পরিচিতি। হাতের আঙুল দেখিয়ে তাই তো হাসেন আর বলেন, এই তো আমার হত্যাকারীর আঙুল, তোমাকে টুঁটি টিপে মারতে পারি এই আঙুল দিয়ে।

কথা আর থামে না ক্রেইগের, আমি সম্মোহিতের মত শুনছি। হঠাৎ বলে উঠলেন, চল না, এই রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ি। বার্লিন এখন ঘুমে, এখন শুধু জাগে পাপ, জাগে উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ, আর জাগে কলালক্ষ্মীর দুই পূজারী। এস ঐ উচ্ছৃঙ্খল নগরীর অন্ধকারে আমরা নেমে যাই! যাবে?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে ক্রেইগ কোটটা পরিয়ে দিলেন, তারপর হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চললেন। পথে এসে ট্যাক্সি ডাকতে লাগলেন।

দু'একটা ট্যাক্সী ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল। শেষে একটা পেয়ে গেলাম। চেপে বসলাম দুজনে। পটস্‌ডামের এক ছোট্ট হোটেলে গিয়ে যখন হাজির হলাম, তখন সবে ভোর হয়েছে। হোটেলের দরজা খুলছে। দুজনে কাফি পান করলাম, কত কথা হল। আবার বার্লিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

বার্লিনে পৌছতে বেলা নটা বেজে গেল।

ক্রেইগ বললেন, এবার কি বাড়ি যাবে?

বললাম, না।

তবে ?

তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি, যেখানে খুশি নিয়ে চল !

ক্রেইগ বললেন, বহুৎ আচ্ছা।

আমাকে নিয়ে এলেন এক বান্ধবীর কাছে। বান্ধবীটিও উদ্দাম প্রকৃতির মহিলা। আমাদের সাদরেই বরণ করে নিলেন। ছোট হাজিরি এল সঙ্গে সঙ্গে। ডিম, কাফি। তারপরে আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সন্ধ্যের আগে আর ঘুম ভাঙলো না।

ক্রেইগ এবার আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্টুডিয়োতে। বার্লিনের এক বিরাট বাড়ির সবচেয়ে উঁচুতলায় তাঁর স্টুডিয়ো। মেঝেয় কালো বার্নিস। তার উপরে নকল গোলাপের পাঁপড়ি ছড়ানো।

ক্রেইগকে এবার তাঁর নিজস্ব পরিবেশে দেখলাম। তিনি এতক্ষণ ছিলেন সুন্দর, তরুণ, এবার দেখলাম প্রতিভাদীপ্ত ক্রেইগকে। আমার কি যে হ'ল জানি না—এতক্ষণ তাঁকে ভাল লাগছিল—এবার তাঁকে ভালবাসলাম। আকস্মিক কামনায় ছুটে গেলাম ওঁর কাছে, দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। আমার কামনা তো দু'বছর ধরে বিদেহী প্রেমে মশগুল ছিল, আজ সে যেন দেহের কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠল। ক্রেইগও আমারই মতো কামনাময় পুরুষ। মনে হ'ল আমি আমার যোগ্য সঙ্গী পেয়েছি। আমার দেহের মিতাকে পেয়েছি, আত্মার পরম আত্মীয়কে পেয়েছি। আমার দেহ তাঁর দেহ এক হয়ে যাবে, আমার রক্তধারায় মিশবে তাঁর রক্তধারা—দুজনের সত্তা লুপ্ত হয়ে যাবে—আমরা মিলেমিশে যাব।

ক্রেইগ এমনি প্রেমিক ; তাই তো তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, ইসাডোরা, তুমি আমার প্রিয়া, আমার ভগ্নী—আমার আত্মার আত্মীয়া।

ভগ্নী কেন ?

ভ্রাতা-ভগ্নীর যেমন একই রক্ত থেকে জন্ম, তেমনি একই ভাবধারা থেকে আমাদের জন্ম। তাইতো আমরা প্রেমিক-প্রেমিকার চেয়েও বেশি, তাইত আমরা ভ্রাতা-ভগ্নী। শেলী একদিন এমিলি ভিভিয়ানিকে এমনি করেই সম্বোধন করেছিলেন। আজ আমি তোমাকে করছি।

হেসে বললাম, তাহলে কথাটা মৌলিক নয় ?

ক্রেইগ হেসে বললেন, কথাটা মৌলিক, তবে শেলী আমার আগে ভেবেছিলেন বটে। এমিলিকে দেখে তাঁর আত্মায় যে দোলা লেগেছিল, তেমনি দোলা লেগেছে আমার মনে।

মেয়েদের জীবনে আসে প্রেমিক, চলে যায়। মেয়েরা তাদের কথা ভুলে যায় না, থাকে স্মৃতি। সে-স্মৃতি মুখের, নয়তো কাঁধ আর হাতের, নয়তো পোষাকের। টুকরো-টাকরা স্মৃতি। কিন্তু ক্রেইগের স্মৃতি তো আমার কাছে টুকরো-টাকরা নয়, জীবন্ত। আজও যেন সেই রাত আমার চোখের সুমুখে ভাসছে। ক্রেইগ এল আমার স্টুডিয়োতে, ভেসে এল যেন এক তরুণ দেবতা, দীপ্ত তার চোখ, শাণিত তলোয়ারের মতো তার দেহ—আর অপরূপ তার বেশ। আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে।

কে তুমি? তুমি কি এণ্ডাইমিয়ন—চন্দ্রের দেবী ডায়ানার দীপ্ত চোখে কি এমনি করে ছায়া ফেলেছিলে? তুমি কি নার্সিসাসের মতো সুন্দর? তুমি কি হায়াসিন্থাস? তুমি কি সেই মেডুসা-জয়ী পার্সিউস? তুমি কি কবি ব্লেকের সেই দেবদূত? তুমি বুঝি আমার কাছে সব—সব! তোমাকে খুঁজে পাই গ্রীক উপকথার পুঁথির পাতায়, তোমাকে খুঁজে পাই কবির গাথায়, কাব্যে।

চোখে চোখ পড়তেই কি হ'ল! দৃষ্টির চুম্বকের টানে চলে এলাম, মিশে গেলাম, মিলে গেলাম। অগ্নিশিখা যেন অগ্নিশিখায় এসে মিলল, এক লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হ'ল। এই তো আমার সাথী, আমার প্রেমিক—আমার আত্মার আত্মীয়! আমরা আর দু'জন নই—আমি আর তুমি নই—আমরা নামপুরুষের রসলোকে উত্তীর্ণ। আমি আর তুমি লুপ্ত হয়ে গেছে - এখন আমরা এক—অভিন্ন। প্লেটো একেই বলেছেন এক আত্মার দু'অংশ।

তরুণ-তরুণীর দেখা হ'ল, তারা ভালবাসল—তা তো নয়। এ তো দুই আত্মার মিলন। রক্তমাংসের যে হাল্কা আবরণ, সে তো এক পরম মুহূর্তে কখন খসে গেল, যৌন কামনা তো স্বর্গীয় আলিঙ্গন হয়ে দেখা দিল। এ-আলিঙ্গন তো অগ্নিশিখার মহা মিলন।

এ আনন্দ তো অতৃপ্তির রেশ রাখে না, এখানে আছে পরম তৃপ্তি, পরম নির্বাণ। এরপরে আর তো বাঁচতে সাধ যায় না। আমার লেলিহ বহ্নিমান আত্মা সে-রাতে চিরবিদায় নিলে না কেন, উড়ে গেল না কেন মহাশূন্যে, মিলিয়ে গেল না কেন কবির দেবদূতের মতো? পৃথিবীর মেঘ ছাড়িয়ে আর এক মেঘে লীন হয়ে গেল না কেন?

আমার প্রেমিক—তরুণ সে, সে শক্তিমান—সে নিতুই নতুন। কামনা তার আছে, কিন্তু সে-কামনা নিবৃত্তি জানে, সে-কামনা শিল্পের পরম বিকাশ হয়ে দেখা

দেয়। কলালক্ষ্মীর জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে সে তাকে চিরসুন্দরের রূপ দেয়। এমন প্রেমিক কি তোমরা কেউ পেয়েছ? গর্ডন আমার এমনি প্রেমিক!

তার স্টুডিয়োতে নেই কাউচ, নেই আরাম কেদারা। ভোজের আসর সেখানে বসে না। আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা সে রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম মেঝেয়। আমার প্রেমিক তো তখন নিঃস্ব, আমিও টাকা নিয়ে আসিনি। টাকা আনতে বাড়ি যাবারও ইচ্ছে নেই। দু'সপ্তাহ কেটে গেল। ধারে খাবার আসে পাশের এক হোটেল থেকে। পরিচারক যখন খাবার দিতে আসে, লুকিয়ে থাকি। তারপর সে চলে যেতে দু'জনে মিলে খাই। টাকা আমাদের কারো নেই, অভাবও নেই। সব অভাব পূর্ণ করে দিয়েছে প্রেম। বলি—

ভালবাসা তো একেই বলে। এখানে টাকা, আনা, পাই এসে বাধার দেয়াল খাড়া করে দেয় না। এই তো নরনারীর প্রেম! এ প্রেম দেহ দিয়ে শুরু হয়, আত্মায় দেখা দেয় এর পরম বিকাশ। গর্ডন, এই প্রেম তুমি আমাকে দিলে, আমাকে পূর্ণ করলে!

গর্ডন হাসে আর বলে, তুমিও আমাকে পূর্ণ করলে ইসাডোরা। আমরা ধন্য হলাম।

দু' সপ্তাহ এমনি করে কেটে গেল। পকেটে নেই টাকা, আধপেটা খাই— তবু ভালবাসার নীড় গড়ে তুললাম গর্ডনের ঘরে। আকাশের কোলে, টলমল মেঘের সীমানায়। হৃদয় কানায়-কানায় ভরা, তবু এল ক্লান্তি। মেঝেয় শুয়ে শুয়ে পিঠে ব্যথা, খিদের জ্বালায় ছটফট করি। হোটেলের ধারে-পাওয়া খাবারে পেট ভরে না। তাই দু'জনে রাতের আঁধারে বেরুই পথে। গর্ডন কোনো বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে কিছু আনে, কোন নগণ্য পান্থশালায় পেটপুরে খেয়ে নিই। আর এমনি করেই কাটে দিন। শেষে একদিন গর্ডনকে বললাম,

প্রেমের নীড় ভাঙার এবার পালা এল গর্ডন! প্রেম দেখছি খালিপেটে আর মেঝেয় শুয়ে ভাল জমে না।

গর্ডন হেসে বললে, না, সে জমত আদিযুগে। তাই কবি বলেন, নিছে জল আর রুটি খেয়ে প্রেম—সে কি প্রেম নাকি? কবির প্রশ্ন তো আমাদেরও প্রশ্ন। চল, চল! ভেঙে পড়ুক দু'দিনের এই নীড়!

দু'জনে বেরিয়ে পথে এসে ট্যাক্সি চেপে বসলাম।

এদিকে আমাদের উধাও হবার পর মা তো এক কাণ্ড বাঁধিয়েই বসে আছেন। তিনি পুলিশে তো জানিয়েছেনই, রাষ্ট্রদূত আবাসগুলিও বাদ যায়নি। তাঁর

নালিশ, তাঁর মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে এক লম্পট। আমার ম্যানেজারেরও অবস্থা কাহিল। আমার হঠাৎ অন্তর্ধানে নাচ বন্ধ। এদিকে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে তিনি বসে পড়লেন। শেষে বুদ্ধি করে এক বিজ্ঞাপন দিলেন :—ইসাডোরা ডানকান অসুস্থা। বার্লিনবাসীর কলরব কিছুটা শান্ত হ'ল।

আমি যে এসব ভাবিনি তা নয়, কিন্তু প্রেমে তখন আমি বিভোর। তাই তার গুরুত্ব বুঝিনি।

ট্যাক্সি থেকে আমরা দুজন নামতেই মা ছুটে এসে গর্ডনের মুখোমুখী দাঁড়ালেন, চিৎকার করে উঠলেন—

লম্পট, এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই হবে না! যাও বেরিয়ে যাও!

গর্ডন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা আবার গর্জন করে উঠলেন, যাও, বেরিয়ে যাও!

গর্ডন আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, আসি ইসাডোরা! আবার দেখা হবে!

আমিও মিষ্টি হেসে উত্তর দিলাম, এসো।

মার তর্জন-গর্জন এমনি করেই উপেক্ষা করলাম।

গর্ডন আমার প্রেমিক, কিন্তু এই তো তার একমাত্র পরিচয় নয়। সে আমাদের এই যুগের এক প্রতিভা। কবি শেলীর মতো সে, আগুন আর বিদ্যুতে গড়া। আজকের দিনের রঙ্গমঞ্চকে সে জুগিয়েছে অনুপ্রেরণা। সে মঞ্চে এসে নিজেকে তার জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়নি। সে মঞ্চ থেকে দূরে থেকে দেখেছে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন আজকের থিয়েটারকে সুন্দর করে তুলেছে। সে যদি না থাকত, কোথায় পেতাম আমরা মঞ্চের জাদুকর স্তানিস্লাভস্কীকে, কোথায় পেতাম রাইনহার্ডকে? এখনো তাহলে মঞ্চে চলত সেই বাস্তবের অনুকরণ, তেমনি বাস্তবের নকলে বাড়ীঘর তৈরী হোত, তেমনি দরজা খোলা আর বন্ধ হোত। কেউ ভাবত না প্রতীকের কথা। তাই গর্ডন সেরা মঞ্চশিল্পী, নতুন মঞ্চসজ্জার সে জন্মদাতা।

শুধু কি তাই? গর্ডন সাথী হিসেবেও চমৎকার। এমন তো কাউকে দেখিনি, যে সকাল থেকে রাত অবধি অনুপ্রেরণা নিয়েই বেঁচে থাকে। প্রথম পেয়ালা কাফির সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনায় আগুন ধরে যায়, তারপরে তো দিনভোর চলে তারই রোশনাই। ওর সঙ্গে যখন পথে চলি, মনে হয় পুরানো দিনের মিশরের পথে চলেছি কোন পুরোহিতের সঙ্গে। পথ চলতে চলতে ও

থমকে দাঁড়ায়, পকেট থেকে বেরিয়ে আসে খাতা আর পেন্সিল। জার্মান স্থাপত্যের এক কুশ্রী নিদর্শন দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, বলে,

দেখ, দেখ, কুশ্রীতার আবরণের নিচে ঐ মিনারের সৌন্দর্য!

আঁকতে স্বরু করে দেয়। যখন আঁকা হয়ে যায়, তাকিয়ে দেখি, সত্যিই এক সুন্দর মিনার রেখাময় হয়ে ফুটে উঠেছে। এমনি মিনার তো ছিল প্রাচীন মিশরে, প্রাচীন গ্রীসে।

একটা গাছ, একটা পাখী দেখলেও ও সমান খুশি। আবার কখনো বা আসে ওর বিষাদের পালা। মনে হয় খুশী মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে। রুদ্ধশ্বাস হয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষা করছে।

যতই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, ততোই দেখলাম, গর্ডনের খুশির চেয়ে বিষাদের পালাই বেশী। তাই একদিন শুধালাম,

গর্ডন, তোমার খুশী কেন হঠাৎ উবে যায়? কেন আসে বিষাদ?

গর্ডন গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে, ইসাডোরা, আমার কাজ আমাকে খুশি এনে দেয়, আবার সে আমার মনে বিষাদ ঘনিয়ে তোলে।

বললাম, কিন্তু কাজ তো আমারও আছে। আমি আত্মার ছন্দ মূর্ত করে তুলছি আমার নৃত্যালয়ে, কিন্তু তবু তো তোমার কাছে যখন আসি, সব ভুলে যাই। শুধু তখন তুমি আর আমি।

গর্ডন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারিনে।

কেন পার না? তুমি পটভূমিকা সৃষ্টি কর, আমি সেই পটভূমিকার সুমুখে আত্মার বিকাশ দেখাই। আমার কারবার জড় পটভূমি নিয়ে নয়, জীবন্ত মানুষ নিয়ে।

তার মানে—তোমার ঐ জীবন্ত মানুষ আমার পটভূমির চেয়ে বড়?

নিশ্চয়ই বড়। আমি আত্মাকে জাগাব আমার নাচে, তুমি তার বিকাশের যোগ্য পটভূমি সৃষ্টি করবে।

অমনি চিৎকার করে উঠল গর্ডন, না না, ভুল! ভুল!

বললাম, তোমাকে কি ব্যথা দিলাম গর্ডন?

ব্যথা? না, না! মেয়েরা এমনিই হয়। তারা কাজে বাধা দেয়। আমার কাজে তুমি বাধা দিচ্ছ ইসাডোরা!

দরজা খুলে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল গর্ডন। সারারাত তার দেখা পেলাম না। কেঁদে কেঁদে কাটালাম রাত।

দুদিন পরে আবার ফিরে এল।

প্রায়ই এমনি হয়। গর্ডন ঝগড়া করে, চলে যায়, আবার ফিরে আসে। আমাদের প্রেমের নীড়ে লাগে ঝড়ের দোলা।

আমার ভাগ্য আমাকে জুড়ে দিলে গর্ডনের সঙ্গে। তার প্রেমিকা হলাম, তাকে অনুপ্রেরণা জোগালাম। একদিকে ওর প্রতিভাকে ভালবাসার স্পর্শে বিকশিত করাই হ'ল আমার কাজ, অন্যদিকে নিজের প্রতিভাকে তার সঙ্গে মেলাতে চাইলাম। কিন্তু এ মিল যে হয় না। এ যে গরমিলের মিল! কয়েক সপ্তাহ পরে কামনার ঝড় শান্ত হ'ল, এবার উঠল আর এক ঝড়। এ-ঝড় তুলল গর্ডনের প্রতিভা আর আমার সৃষ্টির প্রেরণা।

গর্ডন বলে, ইসাডোরা, কেন এখনো তুমি তোমার নাচের জগত থেকে বিদায় নিচ্ছ না? কি হবে তোমার নাচে? জগতের কি তুমি উপকার করবে?

উত্তর দিই, মানুষের আত্মার বিকাশ আমার কামনা—আমি তো আমার নাচ ছাড়তে পারব না গর্ডন!

আত্মার বিকাশ দেখাবে নাচে? গর্ডন হেসে উঠল। এ যুগের আত্মা কোথায়? সোনার চাপে আত্মা মরে গেছে। তার চেয়ে ওসব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাক। আমার পেন্সিলের শীসটা চোখা করে দাও! আমি আঁকি, তুমি দেখ!

গর্ডনের কথায় হাসি। ওকে আমি চিনি। আমার নৃত্য কলার প্রতি ওর আছে শ্রদ্ধা, কিন্তু ঈর্ষায় ও অন্ধ। তাই অমন বলে।

একদিন তো বলেই ফেললে, মেয়েরা শিল্পী হতে পারে না!

কেন? শুধালাম।

পারে না—ওদের আত্মা নেই। ওরা শুধুই দেহ।

হেসে বললাম, ইসাডোরা তাহলে আর সব মেয়ের চেয়ে আলাদা।

কিসে আলাদা?

আলাদা নয়? ইসাডোরার আত্মা আছে, একথা বলেন দুনিয়ার রসিকমহল—সে-আত্মা নৃত্যছন্দে বিকশিতও হয়ে ওঠে।

রসিকমহল জানে না, তারা অরসিক—ভণ্ড!

তাহলে তুমিও ভণ্ড!

কি আমি ভণ্ড! খাতা আর পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিলে গর্ডন।

হাঁ, তুমিও তো নিজের কল্পনাকে মূর্ত হতে দেখেছ আমার নাচে। বল—দেখ নি?

গর্ডন চুপ করে থাকে।

শুধু চটুল প্রেমের কলহ্ এ নয়। এ নারী আর পুরুষের মিলনের বাধা। তাদের স্বাধীন সত্তার বিরোধ। মতের অমিল। এই অমিলই তো মেলায় সংঘর্ষে-সংঘর্ষে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে দুই হৃদয়কে। আমরাও এমনি করে মিললাম।

বার্লিনে আমাদের নাচের স্কুল বেশ জমে উঠেছে। নামী মহিলারা এখনকার মুরুব্বী। গর্ডনের সঙ্গে আমার প্রেম তখন বার্লিনের অজানা নয়। নীলরক্তদের টেবিলের আলোচনার সে বিষয়। চারিদিকে গুঞ্জন উঠছে। কানে এসে পৌছয় সে-গুঞ্জন, তাতে ধিক্কারের আমেজ যে নেই তা নয়। শুনে হাসি। নীল রক্তের দল এ-প্রেমকে তো সহ্য করতে পারবেন না! তাঁদের বাইরেটা অনুশাসনে মোড়া, তাই প্রেমের গোপনতারই তাঁরা কারবারী, তাকে লোকের সুমুখে দেখাতে চান না। তাই তো দেখি অভিজাত রক্তে যে শিশুর জন্ম হ'ল, সে শিশু নামগোত্রহীন হয়ে পালিত হয় অনাথ আশ্রমে। নয়তো তার জীবন দীপ জ্বলে ওঠার আগেই গর্ভের অন্ধকারে নিবে যায়। গর্ডন আর আমার প্রেমকে তাই তারা সইতে পারলেন না!

বিখ্যাত ব্যাঙ্কার মেণ্ডেলসনের স্ত্রী এক দীর্ঘ পত্র নিয়ে এসে একদিন হাজির। তিনি এসেই চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন।

কেঁদে কেঁদে বললেন, ইসাডোরা, আমি এ চিঠিতে সই করি নি, করেছেন আর সবাই। তাঁরা লিখেছেন, প্রতিষ্ঠানের নেত্রী যখন এমনি উচ্ছৃঙ্খল, তাঁরা আর স্কুলের মুরুব্বী থাকতে রাজি নন। শুধু তোমার বোনকে তাঁরা এখনো বিশ্বাস করেন। তুমি যদি স্কুলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেল, তাহলেই তাঁরা এতে থাকবেন, নইলে নয়।

রেগে উঠে বললাম, তাঁরা নাম কাটিয়ে নিয়েছেন ভালই হয়েছে! আমার স্কুল জনগণের, সেখানে নীলরক্তের সামান্যতম সংস্পর্শও আমি চাইনে।

ফ্রাউ মেণ্ডেলসন আমাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি খেপে গেছি।—বললাম, যদি আড়ালে-আবডালে আমরা প্রেম করতাম, ওঁরা সহ্য করতে পারতেন, কারণ ওঁরাও যে সেই কারবারের কারবারী। কিন্তু দল থেকে যখন কেউ ছিটকে পড়ে, তখন তো তাকে খারাপ বলে মনে হবেই। ওঁদের

জানিয়ে দেবেন, ইসাডোরা উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে, কিন্তু প্রেমকে সে পাপ বলে মনে করে না। তাই তাঁর প্রেম এমন অবাধ, এমন স্বাধীন।

ফ্রাউ মেণ্ডেলসন চলে গেলেন, আমি হল ভাড়া করতে ছুটলাম। সেখানে বলব নারীর মুক্তির কথা, ভালবাসার মুক্তির কথা।

নাচিয়ে থেকে একেবারে বক্তা।

হল ভাড়া হ'ল, শ্রোতাও জুটল। বক্তা বিজয়িনী ইসাডোরা, শ্রোতা জুটবে না?

আত্মার মুক্তির কথা বললাম, নরনারীর মিলনের কথা বললাম, তারপর এল সন্তানের কথা। আমি বলে উঠলাম,

এই যে সমাজ যাকে নিষিদ্ধ মিলন বলে, সেখানে সন্তানের আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন? সামন্ত সমাজ এমনি সন্তানকে ঠাঁই দিত সমাজে, তাই আমরা পেয়েছি বহু জ্ঞানীগুণীকে। সে-কথা না হয় বাদই দিলাম, আজকে যে বিবাহ-প্রথা চলছে, সেখানেও তো ঘোর অসঙ্গতি। বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে সন্তানকে স্বামী পালন করতে চায় না।

সেখানে হাকিমের রায়ের উপর বসে থাকে। এমন মানুষকে কি করে মেয়েরা ভালবাসে? আমার তো মনে হয়, ভালবাসার প্রথম কথা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। আমি শ্রমিক, আমি যদি কখনো শিশুকে আমাব গর্ভের অন্ধকারে আমার দেহমন ঢেলে দিয়ে সৃষ্টি করি, তাহলে কারো দাবী তো আমি মানব না। আমার সন্তানকে আমার স্বামী আইন দেখিয়ে আমার কাচ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। বছরে তিন বার, কি হপ্তায় একবার তাকে দেখতে হবে—আদালতের সে-রায় আমি মানব না!

আপনাদের কাছে আমি একটা সত্যি ঘটনা বলছি। এক সাহিত্যিক একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। মেয়েটি সন্তান-সম্ভবা হ'ল। সে বললে,

বিয়ে না করলে আমাদের সন্তান বড় হয়ে আমাদের সম্পর্কে কি ভাববে বল তো?

সাহিত্যিক হেসে উত্তর দিলেন, আমার আর তোমার সন্তান যদি আর পাঁচ জনের মতো হয়, তাহলে সে কি ভাববে, না ভাববে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না!… …

বক্তৃতা চলল। শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা তরুণ, তাঁরা আমাকে অভিনন্দন জানালেন; আর যাঁরা গোঁড়া, তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন। হাতের কাছে

যা কিছু পেলেন আমাকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারলেন। শেষে দু-দলে শুরু হ'ল খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু তরুণদের কাছে প্রবীণদের পরাজয় হ'ল। তারা হল ছেড়ে চলে গেলেন। এবার বসল বিতর্ক বৈঠক। সেখানে নারীর অধিকার নিয়ে চলল আলোচনা। আজকের দিনে নারীর দাবির কথা চারিদিকে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিন সে তো ছিল রূপকথারই সামিল। সেই রূপকথাকে প্রথম বাস্তবে এনে দিয়েছিল ইসাডোরা। নারী আন্দোলনের প্রথম পিল্‌পে সে-ই গেঁথেছিল। আজকে কি নারীরা তাঁকে সেই অগ্রণী সম্মনাটুকু দেবেন না?

বক্তৃতা শেষ হ'ল, সমাজ নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। ঘরেও তার স্রোত বয়ে গেল।

ইস্কুলটি বাঁচাবার জন্য এলিজাবেথ চলে গেল আমাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে। মাও যেন দোমনা। কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। ক'দিন আমার কাছে ক'দিন এলিজাবেথের কাছে গিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে সুখ নেই। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। অভাবেও তো তাঁকে এমন দেখিনি। মনে হয়, প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি হাঁফিয়ে উঠছেন। মাঝে মাঝেই বলেন,

তোরা আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দে, সেখানে আমি শান্তিতে থাকব। এখানে কি আছে? এমন মানুষ নেই যে দুটো কথা কই, এমন খাবার নেই যে খেয়ে তৃপ্তি পাই!

বলি, চল না মা, বার্লিনের সবচেয়ে সেরা রেস্তরাঁয়! সেখানে খাবার চেখে-চেখে দেখ, ভাল লাগে কিনা?

মাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাই। খাবারের তালিকা সামনে ফেলে দিয়ে বলি—কি খাবে, ফরমায়েস দাও!

মা চোখ বুলিয়ে বলেন, কোথায়, চিঙড়ি মাছ তো দেখছিনে?

বলি, এটা চিঙড়ি মাছের পক্ষে অকাল। এখন কোথায় পাবে?

মা উত্তর দেন, এই সময় তো মার্কিন মুলুকে পাওয়া যেত। এখানে সবেরই আকাল। এমন পোড়া দেশে কেউ থাকে! আমি এসব ছোঁবওনা!

মা অমনি উঠে পড়েন।

আবার কোথাও যদি বা অকালের চিঙড়ি মাছ মিলে যায়, মা অমনি বলে ওঠেন,

এই কি চিঙড়ি মাছ না কি? সানফ্রান্সিসকোর চিঙড়ি মাছের কথা একবার ভাবতো? না, না, এ পোড়া দেশে আর নয়!

মার কি হ'ল ভাবতে বসি।

মা ছিলেন সন্তানদের নিয়ে। তারাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। আজ সেই সন্তানরা তাঁর কাছ থেকে একে-একে খসে পড়ছে। তাই তাঁর এমনি দশা! যাদের জন্য সমস্ত জীবনটা তিনি উৎসর্গ করলেন, নিজের দিকে তাকালেন না—আজ তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মার মনে তাই ত এ বিতৃষ্ণা, এ বিরূপতা! এমনিধারাই তো হয়। একে কি মার ঈর্ষা বলব? না বলব, মার স্নেহের গভীরতা? যদি ঈর্ষাই হয়, সে ঈর্ষা তো মহান, মাতৃস্নেহকে সেই ঈর্ষাই তো গরিমাময় করে তোলে।

যত দিন যায়, মা আরো অস্থির হয়ে ওঠেন। শেষে তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম আমেরিকায়।

আমাদের সকলের গড়া নীড় ভেঙে গিছল বহু আগে, মা শুধু তাকে জোড়াতালি দিয়ে রেখেছিলেন। এবার একেবারে ধসে পড়ল।

গর্ডনকে নিয়েই আমার দিন কাটে। মনে হয় আমি পূর্ণ, আমার ভিতরে আর কোনো দৈন্য নেই। আমার ইস্কুল তুচ্ছ হয়ে গেল আমার কাছে। গর্ডনকে যদি আগে পেতাম, তাহলে তো কিছুরই দরকার ছিল না। এখন তো সবকিছু বাহুল্য বলেই মনে হয়। শুধু গর্ডন আর আমি—আর কেউ নয়, কিছু নয়।

একদিন এরই মধ্যে আবিষ্কার করলাম আমি সন্তান-সম্ভবা। স্বপ্ন দেখলাম, এলেন টেরী এসেছেন, তাঁর কোলে একটি শিশু। ঠিক তাঁর মতোই দেখতে। আমাকে ডেকে বললেন, ইসাডোরা, ভালবাসো···ভালবাসো···ভালবাসা তো নিয়ে আসে সন্তান, পূর্ণতা ··

ঘুম ভেঙে গেল, এলেন মিলিয়ে গেলেন। স্বপ্নের জগত আমাকে ঘিরে ধরল। সন্তান-সম্ভবের আগে এ-জগত তো মাকে ঘিরে ধরে। সন্তান গর্ভের আধারে বেড়ে ওঠে, আর মন কল্পনার জাল বোনে। স্বপ্নে মেদুর হয়ে আসে চোখ, বাস্তব শূন্যময় মনে হয়। সন্তান এসেছে আমার বুকে, সে-সন্তান আনবে সুখ আর দুঃখ। জন্ম আর মৃত্যু এসে দেখা দেবে। জীবনের ছন্দ রূপায়িত হয়ে উঠবে।

সেই সুর বেজে উঠছে আমার দেহে, আমার মনে। তাইত আমার দেহ ছন্দে আকুল, চঞ্চল।

বেচারী গর্ডন! অধীর, অস্থির সে। শুধু নখ দাঁত দিয়ে কামড়ায় আর বলে, আমার কাজ—আমার কাজ!

সে তো জড়িয়ে পড়তে চায় না। সে যে তার কাজে আত্মনিবেদিত। শুধু বলে,

এ কি হোল ইসাডোরা? আমি তো এ চাইনি।

আমি হাসি, চুপ করে থাকি। আমার মন তো এলেনের সেই স্বপ্নে ভরা।

সে স্বপ্ন আমার রাতের ঘুমে কারুকাজ করে দেয়, আমার দিনের অলস প্রহরে দিবাস্বপ্ন এনে দেয়।

এরই মধ্যে ডাক আসে ডেনমার্ক, সুঈডেন থেকে। ছুটে যাই, আবার নাচের ঘূর্ণা তুলে অবাক করে দিই। চলে আসি বার্লিনে।

বার্লিনে এলেই গর্ডেন ছুটে আসে। বলে,

এ আমার কি হ'ল ইসাডোরা? কাজে মন বসে না। শুধু চোখে ভেসে ওঠে সন্তানের মুখ:

বলি, ও তো ওর দাবি জানাবেই গর্ডন—ওর দাবি কে অস্বীকার করবে?

কিন্তু আমার কাজ—কি হবে তার?

এ যে তার চেয়ে বড় দাবি—সৃষ্টির দাবি গর্ডন।

কিন্তু সেও তো সৃষ্টি?

হেসে বলি, সে-সৃষ্টি কাগজের উপরে, আর এ-সৃষ্টি তো রক্তমাংসে। এর দাবি তো ঢের ঢের বড়!

গর্ডন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, তারপর তাকিয়ে থাকে আমার দেহের দিকে। আমার দেহ যেন মর্মর পাথরে তৈরি। কিন্তু সে-মর্মর পাথর যেন কোমল হয়ে এসেছে, ভেঙেচুরে যাচ্ছে। কেমন যেন শিথিল হয়ে গেছে, দেহের সে আঁটোসাটো ভাব আর নেই। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। স্নায়ু বুঝি এখন আরো সূক্ষ্ম, মগজ বুঝি আরো চেতনায় তীক্ষ্ণ—কিন্তু সে চেতনা তো ব্যথার।

বিনিদ্র রাত আর ব্যথাভরা দিন। তবু তারই ভিতরে ঘন আনন্দ উথলে ওঠে।

বার্লিন থেকে এবার চলে এলাম, হল্যাণ্ডের এক গ্রামে সমুদ্রের ধারে এক বাড়ি নিলাম। সমুদ্রের ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। দেখি, ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে নির্জন সৈকতে। হাওয়া বয়ে যায়, রাতে সে-হাওয়া যেন আরো উন্মাদ হয়ে ওঠে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে বিক্ষুব্ধ, বিধূনিত। সময় কেটে

যায়। অন্ধকারে ফসফরাসের নীল জ্বালা ঢেউয়ের ফণায় ফণায় ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামখানি যেন এক জাহাজ, সাগর দোলায় দুলতে থাকে।

এখানে কারো সঙ্গে মিশি না। চুপ করে নিজের বাড়িতে বসে থাকি। আর সমুদ্রের ধারে বেড়াই। মাঝে মাঝে শহর থেকে এক বন্ধু আসেন সাইকেলে, নিয়ে আসেন গাদা গাদা বই আর মাসিকপত্র। এসে নানা গল্প করেন যেদিন আসবার কথা, সেদিন ঝড়-জলও মানেন না। তা ছাড়া একাই থাকি। সাগর, বালিয়াড়ী আর আমার সন্তানের স্বপ্ন নিয়েই দিন কাটে। সে কি শুধু স্বপ্ন? না, না, সন্তান গর্ভের অন্ধকারে নড়ে ওঠে, সে বুঝি পৃথিবীতে আসার জন্যে অধীর, অস্থির।

সমুদ্রের ধারে বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, আমার দেহ চুরমার হয়ে গেছে, কিন্তু তবু শক্তি ফুরোয় নি। ভিতরে যেন এক অদ্ভুত শক্তি জেগে উঠেছে। এই যে সন্তান, এ তো আমার—আমার—আর কারো নয়। কিন্তু আবার এক-একদিন আকাশ ঘিরে আসে মেঘে, সাগর গর্জে ওঠে—সেদিন শক্তি কোথায় উবে যায়। মনে হয়, এক দুর্দম জন্তু আমি, ফাঁদে ধরা পড়ে গেছি। এখন মুক্তি চাই। কোথায়? ঐ যে গর্জমান হিংস্র ঢেউ লক্ষ ফণা নিয়ে এগিয়ে আসছে, ওখানে যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তাও স্বীকার। এমনি সংঘাত চলে মনে।

সবাই যেন দূরে সরে যাচ্ছে। মা তো দূরেই আছেন, গর্ডনও যেন দূরে। সে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমারও তো কাজ আছে—কিন্তু সব ভুলে গেছি। এখন একমাত্র কাজে দেহমন ঢেলে দিয়েছি। সে এক ভীষণ কাজ, আমার উপর পড়েছে তার ভার। আনন্দ আর ব্যথায় খান খান্ হয়ে যাচ্ছে দেহ—তবু সেই রহস্যময় কাজের ভার নিতে হয়েছে। রহস্যের অন্ধকারে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে এবার জগৎটাকে উপহার দিতে হবে।

প্রহরগুলি যেন আর কাটে না। দিন, সপ্তাহ, মাস যেন মন্থর গতিতে চলেছে। এই আশা এসে দেখা দেয়, এই আসে হতাশা। আমার সব কিছু যেন কুয়াশায় ঘেরা। আমার ছেলেবেলা, আমার শিল্প সাধনা—সবকিছু যেন এরই প্রস্তাবনা। সন্তান আসছে। অথচ সন্তান তো আসে—সকলেরই আসে। ঐ যে চাষী মেয়ে, ঐ যে মজুর মেয়ে, ঐ যে ভিখারিণী—ওরা সবাই তো জন্ম দিয়েছে আর এক নতুনকে—ওরা কি ভেবেছে একথা? হয়তো ভেবেছে, নিজেদের অজ্ঞানিতে ভেবেছে।

মাকে জানালাম না। তিনি আমাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন। নিজে যে-বন্ধনে জীবনে জ্বলে-পুড়ে মরেছেন, যে-বন্ধন ছিন্ন করেও সুখ পাননি—সেই ফাঁস আমার গলায় পরাতে চেয়েছিলেন। আমি রাজী হইনি। মা তাই চলে গেছেন। কিন্তু বিয়ে করব কি, ওতে আমার বিশ্বাস নেই। ওটা দাসপ্রথা। শিল্পীদের বিবাহ তো চিরদিনই আদালতে গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু দাগ থেকে যায় মনে।

আগষ্ট মাসে একজন দাই রাখলাম। তারপরে আগষ্ট চলে গেল, সেপ্টেম্বর এল। আমার দেহ ভারি হয়ে এল। মাঝে মাঝে, মনে হয় সন্তান নড়ে উঠছে। ভাবি, জীবনের এই যে আশ্চর্য—এর কাছে সবকিছু তুচ্ছ।

আমার দেহ শিথিল। আমার স্তন এখন ঝুলে পড়েছে, আর সে কঠোরতা তার নেই, কেমন কোমল হয়ে গেছে। আমার হাল্‌কা দু'খানি পায়ে আর চঞ্চলতা নেই; কেমন যেন মন্থর হয়ে এসেছে তার গতি। হাঁটু ফুলে উঠেছে, নিতম্বে ব্যথা। কোথায় সেই যৌবনায়িত তনু দেহ? কোথায় সেই ছন্দের হিল্লোল? কোথায় গেল আমার নাচ? মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ি। জীবনের খেলা বড় ভীষণ। এ-খেলায় কেন নামলাম! আবার সন্তানের কথা মনে হয়—সমস্ত ব্যথা ভুলে যাই।

রাতে তারই প্রতীক্ষায় থাকি; বাঁ পাশ ফিরে শুই, মনে হয় ব্যথা বুঝি কমবে, কিন্তু কমে না! ডান পাশ ফিরেও সুখ নেই। শেষে চিতিয়ে শুই। প্রতীক্ষায় রাত কেটে যায়। রাতের পর রাত কেটে যায়। মাতৃত্বের এমনি করে মূল্য দিই আমরা মেয়েরা।

একদিন পারী থেকে ক্যাথলিন নামে আমার এক বান্ধবী এলেন। তিনি বললেন, আমার কাছে কিছুদিন থাকবেন। তাঁকে পেয়ে খুশি হলাম। ভয় অনেকখানি দূর হ'ল।

সেদিন বিকেলে বসেছি চায়ের টেবিলে, হঠাৎ মনে হ'ল শিরদাঁড়া যেন টনটনিয়ে উঠছে, বুঝি চুরমার হয়ে গেল! এবার শুরু হ'ল ব্যথা। এক জহ্লাদের হাতে যেন পড়েছি, সে মৃত্যুর আগে আমাকে অসহ্য নির্যাতন করছে। ব্যথা একটু কমে যায়, আবার বেশি করে দেখা দেয়। কিন্তু সন্তানের জন্ম দিতে হলে এ ব্যথা তো সইতেই হবে। তাই সইতে হ'ল, কিন্তু মনে হ'ল হাড় চুরমার হয়ে যাচ্ছে, শিরায় শিরায় ব্যথার সাগর উত্তাল হয়ে উঠছে। ওরা বলে, এ ব্যথা থাকে না। কিন্তু আমি তো মরছি! চীৎকার করে উঠছি বার বার।

বিজ্ঞান আজ উন্নতির চরম শীর্ষে, কিন্তু মাতৃত্বের এই নির্যাতন—এতো এখনো থামল না। এখনো যন্ত্রণাহীন জন্মের হদিশ তো দিতে পারলে না বিজ্ঞান।

দু'দিন দু'রাত কেটে গেল এমনি করে। এবার ডাক্তার এক বিরাট ফরসেপ বার করে তাঁর কষাইয়ের কাজ করলেন। নারীর স্বাধীনতা, নারীর প্রগতির কথা আমাকে বোলো না! সে প্রগতির প্রথম দাবি হবে—ব্যথাহীন সন্তান-প্রসব। বিজ্ঞান যেদিন সে-দাবি মেটাবে, সেদিন সার্থক হবে নারী-প্রগতি আন্দোলন।

আমি মরলাম না। ব্যথা জন্ম দিলে আনন্দের। সন্তান এল। তাকে দেখে ব্যথা ভুলে গেলাম। কিন্তু তবু সেই নির্যাতনের স্মৃতি তো রইল।

সন্তান—সন্তান! সে তো এক আশ্চর্য। যেন প্রেমের দেবতা কিউপিড শিশু হয়ে এসেছেন। নীল চোখ, বাদামী রঙের চুল। আর কি আশ্চর্য—চুকচুক করে আমার স্তনের বোঁটা চোষে, দাঁত নেই—তবু কামড়ায়। ক্ষীরের মতো দুধ ঝরে-ঝরে পড়ে স্তন থেকে। কি করে বুকে এল এই দুধ—তাই ভাবি আর অবাক হয়ে যাই। ওরই জন্য এল মাতৃত্বের তরলধারা। শিশুর অমন নিষ্ঠুর কামড়ে পুলক-ব্যথা জেগে ওঠে। এমন প্রেমিকের মতো ও নিষ্ঠুরতা পেল কোথায়?

হায় নারী, তুমি আইনজীবী হতে চাও! ভাস্কর, চিত্রশিল্পী হতে চাও! কেন?

সৃষ্টির আনন্দে?

কিন্তু এর চেয়ে মহান সৃষ্টি আর কি আছে?

সন্তান—সন্তান! সে যে ভালবাসা নিয়ে আসে, সে-ভালবাসা তো প্রেমিক দিতে পারে না। সে ভালবাসায় যেন নবজন্ম বিকশিত হয়ে ওঠে নারীর। নারী তা চায়, উন্মুখ হয়ে থাকে।

তার মনে হয়, প্রেমিকের ভালবাসা যে নবজন্ম এনে দিয়েছিল, এ তার চেয়েও ঢের ঢের মহান। আমার কলালক্ষ্মী—আমার আত্মার ছন্দের বিকাশ—তোমায় তো আমি চাইনে—চাইনে! আমি তো তোমার চেয়ে এখন বড়। তুমি যে সৃষ্টি করেছ, সে সৃষ্টির চেয়ে মহত্তর সৃষ্টি আমি করলাম। আমি তো এখন সৃষ্টির দেবী।

সন্তানকে বুকে নিয়ে শুয়ে থাকি, সন্তান ঘুমিয়ে পড়ে। ও যখন জেগে ওঠে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি, অনুভব করি জীবনের অভিজ্ঞান। জীবনের মানে তো এইখানে—এইখানে! কি করে তার বর্ণনা করব! আমি তো কবি নই, সাহিত্যিক নই। আমি তো পারব না তাকে ভাষায় রূপ দিতে।

বার্লিনে ফিরে এলাম সন্তান নিয়ে। আমার ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা ওকে দেখে খুব খুশি। এলিজাবেথকে বললাম, তোমার নাচের ইস্কুলে এবার আর-একটি ছাত্রী জুটলো!

এলিজাবেথ হেসে উত্তর দিলে, ও আমার সেরা ছাত্রী!

গর্ডন খবর পেয়েই ছুটে এল!

তাকিয়ে রইল ওর দিকে বহুক্ষণ। তারপর বললে,

এমন মেয়ে তুমি কোথায় পেলে ইসাডোরা?

হেসে বললাম, তোমার মনে নেই, তুমিই তো দিয়েছ।

ও অবাক হয়ে বললে, আমি? আমি দিয়েছি?

হ্যাঁ, তুমি দিয়েছ! আমি ওকে রূপ দিয়েছি। ও কিন্তু তাই বলে তোমার নয়, আমার—একান্ত আমার!

গর্ডন বললে, আমি তো ওকে কেড়ে নেব না। ও তোমারই থাক। কিন্তু একবার তুলে এনে আমার বুকে দাও।

মেয়েকে তুলে এনে ওর বুকে দিলাম। শিশুর মুখ গর্ডন চুমোয় চুমোয় ভরে দিলে।

বললে, কি নাম রাখলে ওর?

নাম? নাম তো রাখি নি। কোনো নামই তো পছন্দ হয় না।

গর্ডন ওকে চুম খেয়ে বললে, ওর নাম দিলাম ডেইড্রী। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রিয়া ডেইড্রী। তার প্রান্তর, তার হ্রদ, তার স্বপ্ন—সব এ নামে মূর্ত হয়ে ওঠে। নাম তোমার পছন্দ হয়েছে?

মেয়েকে ওর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গালে চুমু খেয়ে বললাম,

ডেইড্রী—ওগো মেয়ে—নাম তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

ডেইড্রীর মুখে বুঝি হাসি ফুটে উঠল।

সতেরো

এলিনোরা ডিউস—আমার স্বপ্নের এলিনোরা এলেন বার্লিনে

এলিনোরাকে তুমি চেন না?

সেই যে কবি দান্নাৎসিয়োর প্রেমিকা এলিনোরা! যাঁকে নিজের ছকে ঢেলে সাজতে পারেন নি কবি, যার ব্যক্তিত্বের কাছে কবি লুটিয়ে দিয়েছেন নিজের গর্ব।

শ্যামলা ইতালীর মেয়ে এলিনোরা, সেই শ্যামল রূপ নিয়ে তিনি য়ুরোপ বিজয় করলেন, তিনি হলেন য়ুরোপের সেরা অভিনেত্রী। য়ুরোপ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

সেই এলিনোরার জীবনে একদিন এসে দেখা দিলেন কবি দান্নাৎসিয়ো। কি করে তাঁদের আলাপ হ'ল?

এলিনোরা তখন ভেনিসে।

সেদিন রাতে ঘুম নেই চোখে। এলিনোরা বেরিয়ে পড়লেন।

ভিনিসের পথ তো নয়, জলের রেখা। সে পথে গাড়ি চলে না, ভেসে বেড়ায় গণ্ডোলা। এলিনোরা একখানা গণ্ডোলা ডাকলেন।

একা চলেছেন, সময় কেটে যাচ্ছে। জলের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে স্বপ্ন।

কে জানে কার কথা ভাবছেন এলিনোরা!

দূরে ম্যাণ্ডোলিনের সুর ভেসে আসছে, স্বপ্ন বুঝি আরো ঘন হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে ভোর হয়ে এল। কালো জলে আলোর রেখা এখনো পড়েনি, শুধু ধূসর আকাশের ছায়া টলটল করে উঠল। বাজারে উঠছে কর্মের গুঞ্জন। এলিনোরা মাঝিকে বলে উঠলেন, স্বপ্ন শেষ! এবার ফিরে যাই।

ফিরে চললেন। এমন সময় প্রদোষের আলো আঁধারি মায়ায় আর এক স্বপ্ন এসে দেখা দিল। একখানা গণ্ডোলা ছুটে এল, সেই গণ্ডোলায় এক পুরুষ।

এমন কিছু নয় তাঁর চেহারা। বেঁটে, এক মাথা লাল চুল, কিন্তু চোখে যেন বহ্নিমান সূর্যের দীপ্তি। এলিনোরা তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দুটি আয়ত কালো চোখের ছায়া পড়ল পুরুষের চোখে। পুরুষ অমনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

সুন্দরের পূজারী সুন্দরের দেখা পেল আজ, প্রেমিক পেল প্রেমের সন্ধান।

এলিনোরা হাসলেন।

পুরুষটি কবি দান্নাৎসিয়ো।

দুজনে প্রেমের নীড় বাঁধলেন ফ্লোরেন্সের এক পাহাড়ের উপরে। এলিনোরা ভালবাসেন সাদা গোলাপ, কবি লাল। তাঁদের বাগান ছেয়ে গেল লাল আর সাদা গোলাপে। এলিনোরা জীবনে প্রথম বুঝি প্রেমে পড়লেন। বিগত প্রেমের স্মৃতি মুছে গেল।

কবিও তাই। তিনি লিখলেন এলিনোরার অনুপ্রেরণায় কত কবিতা, কত নাটক। 'জীবনের শিখা' উপন্যাসখানি তো তাঁকে উৎসর্গই করলেন।

কিন্তু জীবনে তো প্রেম চিরস্থায়ী নয়। আরো দান্নাৎসিয়োর প্রেম। চল্লিশ বছর তাঁর বয়েস, কিন্তু এখনো তিনি নাগর, এখনো তিনি উদ্দাম। এলিনোরা বুঝতে পারলেন, শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে। লিখলেন নিজের রোজনামচায়—ছাই · ছাই···শুধু ছাই—আমার চোখের সুমুখে শুধু ছাইয়ের গাদা। ছাই এসে উড়ে পড়ছে ঠোঁটে, আমার শূন্য হাতে...

এলিনোরা আর কবি দুজনেই শিল্পী।

কবি একদিন বললেন, এলিনোরা, মানুষ তার স্বাধীনতা চায়, এমন কি নেশার ঘোরেও সে-স্বাধীনতা সে বিকিয়ে দিতে রাজী নয়।

এলিনোরা উত্তর দিলেন, তা জানি কবি। তাইত আমাদের বিদায়ের পালা এল।

সত্যিই বিদায়ের পালা এল। কিন্তু চোখের জলের প্লাবনে নয়। দুই শিল্পী মিলে বিদায়ের এক অপূর্ব নাটকের অভিনয় করলেন।

ভোজের টেবিলে দুজনে বসলেন! টেবিলে যবের শীষ গোছা গোছা ফুলদানীতে সাজানো। ঘরের এখানে-ওখানে টবে যবের চারা! ভোজ শেষ হয়ে গেল সেই শ্যামল পরিবেশে। দুজনে বেরিয়ে এলেন, এলিনোরা দরজায় চাবী এঁটে দিলেন, তারপরে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে।

কবি চলে গেলেন। দরজা একদিন ভেঙে ফেলা হ'ল। দেখা গেল ঘরে শুধু যবের ক্ষেত। যব পড়ে-পড়ে এখানে-ওখানে চারা গজিয়েছে।

প্রেম শেষ হ'ল বটে, কিন্তু এলিনোরা এখনো কবির নাটককে রূপ দিচ্ছেন, এখনো কবির কথা ভাবেন। কিন্তু কবি কি ভাবেন?

সেই এলিনোরার সঙ্গে পরিচয় হ'ল। পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্রাউ মেণ্ডেলসন। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় রূপ নিলে। তাঁরই আমন্ত্রণে আমি আর গর্ডন, আমাদের সন্তান নয়ে চলে এলাম ফ্লোরেন্সে।

ফ্লোরেন্সে এলিনোরা অভিনয় করবেন বিখ্যাত বাস্তববাদী নাট্যকার ইবসেনের নাটক, গর্ডন নেবে তাতে মঞ্চসজ্জার ভার।

গর্ডন ইংরেজী ছাড়া কিছু জানে না, আবার এলিনোরা ইংরেজী জানেন না। তাই আমি হ'লাম তাঁদের দোভাষী। দুজনেই প্রতিভা তাই প্রথম থেকেই সংঘাত শুরু হয়ে গেল। এলিনোরা ক্ষিপ্ত, গর্ডন ক্ষিপ্ত। দুজনে দুজনের দিকে ছুঁড়ে মারলেন কটুক্তি। কিন্তু দোভাষী তার ব্যাখ্যা করলে না বলেই কাজ এগিয়ে চলল।

রোসমারসলম্ নাটকটির নাম। প্রথম দৃশ্য শুরু হয়েছে এক বাড়ির পুরানো কেতায় সাজানো বসবার ঘরে। এলিনোরা ইবসেনের বর্ণনা অনুসারে অমনি একখানি বসবার ঘরই চান, কিন্তু গর্ডন তা চায় না। তার স্বপ্নময় চোখ সেই বসবার ঘরে আবিষ্কার করেছে মিশরের প্রাচীন মন্দিরের অভ্যন্তরের রহস্যময়তা। শুধু আধুনিক যুগের প্রতীক থাকবে সেখানে—একটিমাত্র জানালা। সেই জানালা দিয়ে দেখা যাবে এক গাছের সার। আর তার পটভূমি হবে লাল, হলুদ আর সবুজে মেশানো—যেন মরোক্কোর দৃশ্য।

এলিনোরার ঘোর আপত্তি।

গর্ডনও নাছোড়, বলে বসল, ইসাডোরা, তুমি ঐ স্ত্রীলোকটাকে জানিয়ে দাও, আমার কাজে বাধা দিলে চলবে না।

আমি দোভাষী হয়ে সে কথা কেমন করে শোনাই! তাই বললাম, গর্ডন বলছেন, আপনার কথা-মতোই কাজ হবে।

আবার গর্ডনকে বলি,

এলিনোরা বলছেন, তুমি এক বিরাট প্রতিভা, তোমার উপরে তিনি কথা বলবেন না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে এমনি আলোচনা। বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার সময় পার হয়ে যায়। ক্লান্তি লাগে। তবু বসে থাকি, দুজনকে শান্ত করি।

গর্ডন এবার দৃশ্যপট আঁকায় লেগে গেল। রঙের বিরাট পাত্র আর তুলি তার সুমুখে। মিস্ত্রীরা এখানে ওখানে কাজ করছে। ক্যানভাসের অভাব। তাই চট সেলাই করে নেওয়া হয়েছে। বসে বসে আঁকছে মঞ্চের উপর গর্ডন, হুকুম করছে মিস্ত্রীদের। সারাদিন থিয়েটারেই সে কাটায়। দুপুরে খেতেও আসে না। আমি দুপুরে খাবার নিয়ে যাই।

সে শুধু আমাকে বলে, তুমি এলিনোরাকে এখানে আসতে দিয়ো না। ঐ

বুড়ি আমার কাজের মর্ম কি বুঝবে? ও যদি আসে, আমি অমনি টিকিট কেটে রওনা হব।

এলিনোরা দৃশ্যপট দেখার জন্যে উন্মুখ। আমি তাঁকে ভুলিয়ে রাখি। এ আমার এক দায়।

এলিনোরাকে নিয়ে বেড়াতে যাই। পথে মানুষ তাকিয়ে থাকে। এলিনোরা জনতার অভিনন্দন পেয়েছেন, কিন্তু তাদের দেখতে পারেন না। তিনি তাদের শ্বাপদ বলেই মনে করেন। জনগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই। তিনি ভাবেন, ওরা চিরদিনই তাঁকে সমালোচনা করেছে, টিটকারি দিয়েছে।

এলিনোরাকে নিয়ে বেড়াই, কখনো বা কোন বাগানে ঢুকে পড়ি। পপলার গাছ ঘন ছায়া ফেলেছে বাগানে। তিনি আমার হাত ধরে চলেছেন। তাঁর গোছা গোছা চুল এসে পড়েছে মুখে চোখে। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। অমন অতল-স্পর্শী চোখ কোথায় পেলেন? ও চোখে আছে কবির কাব্য, আছে শিল্পীর সাধনা, আছে যা কিছু সুন্দর—সব।

এদিকে গর্ডন এঁকে চলেছে। কখনো বা সে উল্লসিত; বলে, এমন দৃশ্য সৃষ্টি করব, সকলের তাক্ লেগে যাবে।

আবার কখনো বা ম্লান হয়ে যায় মুখ; বলে ওঠে, এ এক দেশ বটে! ক্যানভাস পাওয়া যায় না, রং পাওয়া যায় না—ভাল মিস্ত্রীরও অভাব। এখানে কি করে আমার স্বপ্নকে রূপ দেব?

এবার এল সেই ক্ষণ, যখন এলিনোরা দেখতে আসবেন মঞ্চসজ্জা।

এতদিন তাঁকে ঠেকিয়ে রেখেছি, আর তো ঠেকানো যায় না।

দিন এসে গেল। আমি তাঁর কাছে গেলাম। থিয়েটারে নিয়ে যাব।

তিনি উত্তেজিত। মনে হয় যে-কোন মুহূর্তে ফেটে পড়বেন। ঝড়ের আগেকার আকাশের মতো তাঁর চেহারা। ঝড় এল বলে।

হোটেলের বারান্দায় দেখা হয়ে গেল। গায়ে ধূসর রঙের লম্বা ঝুল কোট, মাথায় কসাকদের টুপি। এলিনোরা দামী পোষাক পরেন বটে, কিন্তু সে-পোষাক পরতে জানেন না। দুমড়ে-কুঁচকে থাকে পোষাক গায়ে, টুপীটা চোখের উপর নেমে আসে। কিন্তু ঐ তাঁর স্টাইল, বৈশিষ্ট্য।

দুজনে গাড়িতে উঠে বসলাম, থিয়েটারের দিকে চললাম। পথে কোন কথা হ'ল না। এলিনোরা থিয়েটারে এসে ঢুকলেন, সোজা মঞ্চে গিয়ে ঢোকা তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমি তাঁকে মঞ্চে না নিয়ে উপরে একটা বক্সে নিয়ে গিয়ে

বসিয়ে দিলাম। এবার প্রতীক্ষা। উদ্বেগে সারা হয়ে যাচ্ছি। এবার তিনি বললেন,

কোথায় আমার সেই জানালা? সেই ছোট্ট জানালাটা?

আমি তাঁর হাত ধরে আছি, বললাম, পাবেন, দেখতে পাবেন!

আমার কি উদ্বেগ! ছোট্ট জানালাতো আর নেই, গডনের স্বপ্ন তাকে রূপ দিয়েছে বিরাট করে।

নিচে মঞ্চ থেকে ভেসে আসছে গডনের স্বর, মিস্ত্রীকে হাঁকাচ্ছে, এসব কি করেছ? সব ভণ্ডুল করে দিলে!

আবার থমথমে নীরবতা।

এবার যবনিকা উঠল ধীরে ধীরে।

আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল দৃশ্য। মিশরের প্রাচীন মন্দিরের কথা বলেছিলাম না? কিন্তু এমন সৌন্দর্য তো তার ছিল না। মিশরী কারিগর এমন মন্দির তো তৈরি করতে পারে নি। এর সঙ্গে গ্রীক স্থাপত্যেরও তুলনা হয় না। বিরাট নীলিম শূন্যতা, তারই পটভূমিতে কোন অজ্ঞাত স্থপতি রূপ দিয়েছেন এই মন্দিরের। জানালাটিও আছে, কিন্তু সে-জানালা দিয়ে এক গাছের সারই শুধু দেখা যায় না, দেখা যায় বিরাট বিশ্ব। এখানে তো মিশে আছে মানুষের সাধনা, মানুষের আদিম দুঃখ—তার পরপারে আছে বুঝি উজ্জ্বল সুখ। ইবসেন কি ভেবেছিলেন এই দৃশ্য নিয়ে জানি না, কিন্তু গডন তাকে যে রূপ দিয়েছে—সে রূপের তুলনা নেই।

এলিনোরা আমার হাত চেপে ধরলেন, চোখে তার জল। আমরা চুপ করে বসে রইলাম। এবার তিনি আমার হাত ধরে বক্স থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপরে আমাকে টেনে নিয়ে ছুটে গেলেন মঞ্চে। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর অননুকরণীয় স্বরে ডাকলেন,

গর্ডন ক্রেইগ, আমার কাছে এস!

উইংগস্-এর পাশে ছিল গডন। ছুটে এল। কোথায় তার সেই গর্ব! যেন লাজুক ছেলেটি। এলিনোরা তাকে জড়িয়ে ধরে ইতালীয় ভাষায় অভিনন্দন জানালেন। ঝরণার ধারার মতো ঝরে পড়তে লাগল তাঁর প্রশংসা-বাণী।

গর্ডন আমাদের মতো আবেগে চোখের জল ফেললে না, শুধু চুপ করে রইল।

এলিনোরা এবার তাঁর দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ডেকে বললেন, আমার ভাগ্য ভাল যে, গর্ডন ক্রেইগের মতো মহান প্রতিভাকে আমি খুঁজে পেয়েছি।

এখন থেকে আমার কাজই হবে তাঁর এই প্রতিভার বিকাশ। তিনি গর্ডনের হাত ধরে বললেন,

কলালক্ষ্মীর বরপুত্র তুমি, রঙ্গমঞ্চে নবজন্ম এনে দিলে তোমার দৃশ্যপটের অভিনব পরিকল্পনায়। তোমার উদয়ে আমরা মঞ্চের এই বিকৃত বাস্তবতা থেকে মুক্তি পেলাম—গর্ডন ক্রেইগ, তুমি ধন্য—ধন্য!

আমার কি আনন্দ! স্বপ্ন দেখছি, এলিনোরা আর গর্ডনের প্রতিভা মঞ্চে এনেছে নবযুগ—আর সেই নবযুগ এনে দিয়েছি আমি। কিন্তু স্বপ্ন যে ভেঙে যায়, তা তো তখন জানতাম না।

যাক সে কথা, রোসমারসলম্-এর অভিনয় হ'ল। যবনিকা উঠতেই দর্শক পেলেন গর্ডনের প্রতিভার পরিচয়।

উত্তেজনার উত্তুঙ্গে দিন কাটছে, স্বপ্নমান আমরা। রঙ্গমঞ্চের বিরাট সম্ভাবনায় বিভোর। এরই মধ্যে একদিন ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখলাম, পুঁজি শেষ। এখন আবার টাকার ধান্ধায় ঘুরতে হবে। এমন সময় এল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে নিমন্ত্রণ।

ফ্লোরেন্স থেকে বিদায় নিলাম। গর্ডন পড়ে রইল; আমার সন্তানের ভার সঁপে দিয়ে এলাম মেরীর হাতে।

ট্রেন ছুটে চলল। আঙুর বাগিচা মিলিয়ে গেল, সুইটজারল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে ছুটে চললাম বার্লিনে, বার্লিন থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। পথে শুধু তুষারময় উপত্যকা আর বন আর পাহাড়। মন ভারী, তাই জানালা দিয়ে আনমনে তাকিয়ে আছি। স্বপ্ন রয়েছে আমার দূরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফ্লোরেন্সে। আমার সন্তান আর প্রেমিক সেখানে—তাইত আমার মন ভারী, তাইত আমার বুকে ব্যথার সমুদ্র দুলে উঠছে, বিরহে আমি নীল—নীল হয়ে গেছি।

রাশিয়া আবার আমাকে বরণ করে নিলে। নাচলাম। কিন্তু রাশিয়ার সেবারকার স্মৃতি তো কিছু মনে নেই। শুধু নাচতে-নাচতে একদিন বুকের দুধে ভিজে উঠেছিল আমার কাঁচল—সেই স্মৃতিটুকুই মনে আছে। ফ্লোরেন্স তখন আমাকে ঘিরে রেখেছে। তার আঙুর বাগিচার স্বপ্ন দেখছি রাশিয়ার তুষার পরিবেশে। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সন্তান—ডাকছে গর্ডন।

হল্যাণ্ডে এক নিমন্ত্রণ পেয়ে রাশিয়া থেকে চলে এলাম।

আমস্টারডামে সেদিন নাচ। হঠাৎ এক অদ্ভুত রোগ আমাকে পেয়ে বসল। আমি নাচের শেষে মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। সবাই ধরাধরি করে আমাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। অন্ধকার ঘরে আইস-ব্যাগ মাথায় দিয়ে শুয়ে

রইলাম। ডাক্তাররা রায় দিলেন, এ এক অদ্ভুত রোগ, এর নাম নিউরাইটিস। এর নিদান চিকিৎসা-শাস্ত্রে নেই।

মুখে রুচি নেই। শুধু একটু আফিম-মেশানো দুধ খাই, আর প্রলাপ বকি। তারপরে ঘুম।

গর্ডন খবর পেয়ে ছুটে এল ফ্লোরেন্স থেকে। আমার শিয়রে বসে বসে সে কাটায় রাত আর দিন। এরই মধ্যে তার এল এলিনোরার কাছ থেকে—

গর্ডন ক্রেইগ, চলে এস! নিস-এ রোসামারস্‌লম-এর অভিনয় হবে।

গর্ডন চলে গেল। আমি আবার একা। হতচেতন দশায় দিন কাটে।

ক'দিন পরে একটু সুস্থ হয়ে উঠলাম। ছুটলাম ইতালীর পথে।

নিস-এ এসে পৌঁছুতেই গর্ডনের কাছে সব কথা শুনলাম।

এলিনোরার তার পেয়ে গর্ডন ছুটে এসে দেখে, তার চমৎকার দৃশ্যটি দুভাগ করে কেটে ফেলা হয়েছে। গর্ডন ক্ষেপে গেল। এলিনোরাকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ছুটে গিয়ে বললে

কি করেছ তুমি? আমার জীবনের সাধনা এমনি করে ধ্বংস করে দিলে? তোমার কাছে যে আমি অনেকখানি আশা করেছিলাম।

তারপরে আর ভদ্রতার বালাই রইল না, নিষ্ঠুর আক্রমণ শুরু হয়ে গেল।

এলিনোরাও ক্ষেপে উঠলেন। আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, যাও, আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যাও!

গর্ডন-এলিনোরার মিলনে এইখানেই ছেদ পড়লো।

গর্ডনের কাছে সব কথা শুনলাম।

এলিনোরাও বললেন,

অমন মানুষ আমি দেখিনি! ও কিনা আমাকে গাল দিলে! আমি তাই ওকে দরজা দেখিয়ে দিলাম।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, কিন্তু দুজনের মিলনে মঞ্চের যে নবজন্ম হয়েছিল, সে তো অংকুরেই ধ্বংস হয়ে গেল!

এলিনোরা চুপ করে রইলেন।

নিস-এ মা এলেন, মেরী সন্তানকে নিয়ে এল। আবার সংসার পেতে বসলাম।

কিন্তু সংসার পেতে বসলেই তো হয় না তার চাকাটা তো চালাতে হবে। তাই আবার একটু সুস্থ হয়েই ছুটলাম হল্যাণ্ডে।

হল্যাণ্ডে ঘুরছি। নাচছি। রাতে যখন গা এলিয়ে দিই বিছানায়, ভাবি আমার ডেইড্রীর কথা, আমার সন্তান—সে বড় হয়ে উঠছে। আবার কখন সন্তানের মুখ মিলিয়ে যায়, গর্ডন এসে দেখা দেয়। গর্ডন—তাকে তো আমার দেহ মন সঁপে দিয়েছি—কিন্তু তবু যেন মনে হয়, বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে এল। কেন?

ওর সঙ্গ পেতে আমার ভাল লাগে, সঙ্গকামনায় আমি উন্মুখ, ওকে না হলে আমার চলবে না। আবার ওর সঙ্গে পেয়েও তো সুখ নেই। ওকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় মন, আবার ঘরবাঁধার ভয়ে শিউরে ওঠে। ওকে যদি রাখি, আমার কলালক্ষ্মীকে ছাড়তে হবে—আমার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে হবে। আমার সব কিছুই অতলে তলিয়ে যাবে। আর সেই সব কিছুর বিনিময়ে পাব ওকে। আবার যদি ওকে ত্যাগ করি, হতাশা এসে আমাকে ঘিরে ধরবে। কত বিনিদ্র রাত কেটে যাবে, শুধু ভাবব—গর্ডন এখন অন্য নারীর আলিঙ্গনে শয়ান—আমার কথা তো তার মনে নেই। সে সেই অপরাকে বলছে শিল্পের কথা, হাসছে, এলেন টেরীর সেই বিমোহন হাসি; সোহাগ ঝরে পড়ছে অপরার দেহে। গর্ডন হাসছে আর বলছে, এই নারী আমাকে আনন্দ দিতে জানে, আনন্দ পেতে জানে। ইসাডোরা তো আনাড়ি। তখন ক্ষেপে যাই, নাচতে ইচ্ছে করে না, কোন কাজে মন বসে না।

কিন্তু এ তো চলে না। হয় গর্ডন, নয়ত কলালক্ষ্মীর সাধনা—দুকূল রাখা তো চলে না। তাহলে যে মরে যাব, তাইত চাই ওষুধ। হোমিওপ্যাথি বলে, রোগ দিয়েই রোগের চিকিৎসা। সেই হোমিওপ্যাথির নিদানই খুঁজতে লাগলাম।

মানুষ যা চায়, তা অনেক সময় পেয়েও যায়। দাওয়াই এসে হাজির হ'ল।

সেদিন বিকেলে এসে গেল এক তরুণ দেবতা। নিখুঁত তার চেহারা, নিখুঁত বেশভূষা। এসেই পরিচয় দিলে,

আমি এলাম।

কে তুমি?

বন্ধুরা আমাকে পিম বলে ডাকে। সেই আমার পরিচয়।

পিম! হেসে উঠলাম। অদ্ভুত নাম তো তোমার! তুমি শিল্পী না কি?

না, না, যেন আঁতকে উঠল। শিল্পী হওয়াটাই যেন মস্ত পাপ।

তাহলে তুমি কি? তোমার কি কাছে? কোন্ মহান আদর্শে তুমি উদ্বুদ্ধ?

ও উত্তর দিলে, আমার আদর্শের বালাই নেই।

জীবনের একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে '

না, নেই।

তাহলে কি কর তুমি ?

কিছুই না।

কিন্তু কিছু একটা করতে হবে তো।

একটু ভেবে বললে, হাঁ, একটা কাজ আছে বটে, অষ্টাদশ শতকের নস্যিদানি সংগ্রহ আমার কাজ।

ভাবলাম, এই তো আমার নিদান। রাশিয়া যাবার চুক্তি করেছি, কিন্তু যেতে মন চাইছে না। এবার আমি যেতে পারব।

ওকে বললাম, পিম, আমার সঙ্গে রাশিয়ায় যাবে ?

সে উত্তর দিলে, যেতে তো খুব ইচ্ছে। দাঁড়াও, মাকে জিজ্ঞেস করি। মা আমাকে তাঁর সত্তা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস না করে কি করে বলি।

কিন্তু ওভাবে তো যাওয়া চলবে না, হেসে বললাম। যেতে হবে পালিয়ে।

পিম তাতেই রাজী। তবে বললে, মা ক্ষেপে যাবেন। খবর পেলে, এক কাণ্ডই হবে।

ঠিক হ'ল, আমস্টারডামে শেষ দিনের নাচের পর দুজনে উধাও হব।

থিয়েটারের দরজায় থাকবে গাড়ি। দুজনে উঠে বসব। আমার পরিচারিকা মালপত্র নিয়ে পরের স্টেশনে অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে আমরা ট্রেনে চাপব। যাব রাশিয়ায়।

কুয়াশা-ঘেরা রাত। দুরন্ত শীত। প্রান্তরের উপর ঝুলে আছে কুয়াশার ভারি পর্দা। মোটর চলেছে। পাশেই খাল; তাই গাড়ি ছুটতে পারছে না জোরে।

পিম বলে উঠল, জোরে চালাও !

চালক বললে, কিন্তু বিপদ আছে !

পিম এবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে বললে,

হা ঈশ্বর, ঐ যে পিছনে আসছে !

কে ? চমকে উঠলাম।

আমার মা। দেখছ না, ঝড়ের মতো ছুটে আসছে গাড়ি।

আসুন না, ভয় কি ?

ভয় নেই ? যার হাতে আছে পিস্তল !

চালককে ডেকে বললাম, জোরে চালাও !

চালক নিঃশব্দে বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলে। কুয়াশার আবরণের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে জলধারা।

তবুও গাড়ি ছুটল। পিছনের গাড়িখানাও ছুটতে লাগল।

সে বড় রোমান্টিক পরিবেশ।

পিম আশংকায় আকুল, আমি হাসছি। সংঘাতের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। দুর্ঘটনা আছে লুকিয়ে খালের জলে, নয়তো ঐ পেছনের গাড়ির ভিতরে।

চালক গতি বাড়িয়ে দিলে। আরো—আরো !

পিছনের গাড়িখানা আর দেখা যায় না।

রাত তখন দুটো, আমরা এসে এক হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেলের দারোয়ান লণ্ঠন নিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে।

দুজনে দুখানা ঘর পেলাম—মাঝখানে দীর্ঘ বারান্দা। দারোয়ান বারান্দায় আলো নিয়ে সারারাত পাহারা দিলে আমাদের। যখনি দরজা খুলি, অমনি সে নড়ে ওঠে। পিম আর আমি একসঙ্গে রাত কাটালাম বটে, কিন্তু মাঝখানে অবরোধ বসল। রাত কেটে গেল এমনি করে।

পরদিন ভোরের ট্রেন ধরলাম। যাব আবার পিটার্সবুর্গে।

পিটার্সবুর্গে এসে পৌঁছলাম। কুলিরা মালের পর মাল নামালে। আমার মাল তো অল্প, দেখি আঠারোটা বড় বড় ট্রাঙ্ক নেমেছে, সবগুলিতেই পিমের নাম লেখা।

বললাম, পিম--এসব কি ?

ও কিছু না, আমার মালপত্র, পিম বললে। একটা ট্রাঙ্কে আছে নেকটাই, দুটোয় আমার অন্তর্বাস, আর বাকিগুলোতে আমার পোষাক, জুতো। আবার একটা ট্রাঙ্ক বাড়লো। রাশিয়ায় যাচ্ছি, গরম ক'টা ওয়েস্টকোট তৈরী করিয়ে নিতে হ'ল।

আর কিছু বললাম না, বিলাসী প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

ইউরোপা হোটেলে এবারও উঠলাম। চওড়া সিঁড়ি হোটেলের। পিম সেই সিঁড়ি বেয়ে যখনি নামে, দেখি, তার পরনে নতুন পোষাক। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এমন বিলাসী আমি দেখিনি। বিখ্যাত ডাচ্ চিত্রকর ওঁর

একখানা ছবি এঁকেছেন। তার পটভূমিতে শুধু সোনালি, ঈষৎ লাল আর গোলাপী টুলিপ ফুল—ওর মুখখানায়ও তিনি সেই রঙ্ লাগিয়ে দিয়েছেন। চুলে সোনালি, ঠোঁট দুখানিতে গোলাপী রং, আর মুখে লাল রং। ওকে যখন জড়িয়ে ধরি, মনে হয় বসন্ত এসেছে, টুলিপ ফুলে ভরা প্রান্তরে গা ঢেলে দিয়েছি। এমনি আমার বিলাসী প্রেমিক—এমনি মদির তার আলিঙ্গন!

পিম সুন্দর, সোনালি তার চুল, নীল চোখ—শানিত দীপ্তি তার চোখে নেই। ওর ভিতরে তবে কি দেখলাম, ওর ভালবাসায় কি পেলাম?

অস্কার ওয়াইল্ডের একটি ছত্র মনে পড়ছে—

'ক্ষণিকের আনন্দ তো চিরদুঃখের চেয়ে ভাল।'

ও সেই ক্ষণিকের আনন্দই আমাকে দিলে। এতদিন প্রেম আমাকে আবেগ-বিহ্বল করে তুলেছে, দিয়েছে আদর্শ, দুঃখ—কিন্তু নিছক আনন্দ আর তো পাইনি। যদি সেদিন পিমকে না পেতাম, স্নায়ুর রোগ আমাকে বিকল করে ফেলত। পিম আমাকে দিলে আনন্দ, জোগালে শক্তি। আবার নৃত্যে উত্তাল হয়ে উঠল আমার দেহ, উদ্দাম হয়ে উঠল আমার মন।

এই সময়েই আমি 'ক্ষণিকের সঙ্গীত' রচনা করলাম। রাশিয়া সেই ক্ষণিকের সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'ল। আমি সেই সঙ্গীতকে রূপ দিলাম বটে, কিন্তু সে সঙ্গীত তো আমার নয়—আমার বিলাসী প্রেমিকই তো তার উৎস।

আঠারো

মুহূর্তের সঙ্ঘাত মুহূর্তকে ঘন আনন্দে ভরে দিয়ে মিলিয়ে গেল; মিলিয়ে গেল বিলাসী প্রেমিক। মন আর এখন মুহূর্ত নিয়ে মেতে থাকতে চায়না, চায় না নিজের কীর্তি—চায় বহুর ভিতরে তার নৃত্যধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে। আমার সৃষ্টিশক্তি তো প্রোমিথিউসের চেয়ে কম নয়, তাকে তো রূপ দিতে হবে। স্বপ্ন আবার আমাকে ঘিরে ধরল। এই স্বপ্নই তো জীবনে বার বার এনেছে বিপর্যয়। কেন—কেন আমার এই স্বপ্ন? কেন আমি ব্যক্তিগত মহিমায় খুশি নই, কেন বহুর ভিতরে অমর হয়ে থাকবার আমার এই সাধ? হয়তো আমার সৃষ্টি-শক্তিরই এ খেলা। তাই জার্মানীতে ফিরে এলাম। আবার ইস্কুল নিয়ে মেতে উঠলাম।

কিন্তু খরচ তো বাড়ছে। কে চালাবে?

ভাবলাম, ওদের নিয়ে যদি দেশে দেশে ঘুরি, ক্ষতি কি! হয়তো কোনো দেশের সরকার আমার পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে সাহায্য করতে পারেন।

তাই প্রতি নাচের শেষেই আবেদন জানাতে লাগলাম, আমার পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে তাঁরা সাহায্য করুন!

কিন্তু জার্মানী তো আমাকে সাহায্য করলে না। কাইসারিনা বড় গোঁড়া। কোনো স্টুডিয়োতে যেতে চান না। গেলেও আগে সরকারী লোক গিয়ে নগ্ন মূর্তিগুলি ঢেকে রাখে। সরকারও তেমান গোঁড়া। জার্মানীকে তাই বাতিল করে দিলাম। রাশিয়ার কথা মনে পড়ল। ইস্কুলের মেয়েদের নিয়ে চললাম রাশিয়ায়। কিন্তু ব্যর্থতা এল।

রাশিয়া ব্যালের পূজারী, কসরতেই জারের আনন্দ, অভিজাতদের আনন্দ। তখনো রাশিয়ায় আসেনি স্বাধীন নৃত্যকলা চর্চার দিন। আমার ছাত্রীদের দেখাতে নিয়ে গেলাম ইম্পিরিয়াল ব্যালে স্কুল। তারা দেখতে পেলে, ছাত্রী নয়, কতগুলি ক্যানারী পাখী খাঁচায় হাত-পা ছুঁড়ছে।

আমার স্কুলের জন্য একমাত্র সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন স্তানিস্লাভস্কী। কিন্তু তাঁর চেষ্টা বৃথা হ'ল। তাই চললাম ইংলণ্ডে।

ইংলণ্ডের রসিক-সুজন আমাকে বরণ করে নিলেন, কিন্তু আমার স্বপ্ন তো সার্থক হ'ল না। একদিন হতাশ হয়ে ছাত্রীদলকে বিদায় দিলাম। তারা আবার জার্মানীতে ফিরে গেল। আমি একা চেপে বসলাম আমেরিকাগামী জাহাজে।

নিউইয়র্কে চলেছি। আট বছর আগে একদিন এসেছিলাম য়ুরোপে একপাল জীবজন্তুর সঙ্গে। সেদিন কেউ আমাকে চিনত না, কিন্তু আজ আমি য়ুরোপ-খ্যাত নৃত্য-শিল্পী। এক নতুন নৃত্যধারার জন্ম দিয়েছি। এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি—আর আছে আমার সন্তান। কিন্তু এখনো আমার টাকার অভাব।

আমেরিকায় এসে গেলাম — ডলারের দেশ। আমাকে গ্রহণ করতে পারলে না। সমালোচকেরা আমার নিন্দেই করতে লাগলেন। তবু এরই মধ্যে দু-একজন রসিক আমাকে অভিনন্দন জানালেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ভাস্কর বার্ণার্ড একজন। তাঁরই দৌলতে কলা-রসিক মণ্ডল আমার ঠাঁই হ'ল। এঁরা কলা-রসিক হলেও মামুলি পথে চলেন না, এঁদের আদর্শ বিপ্লব। জীবনে আর শিল্পে সেইটেই আমদানী করতে চান। তাই নিউইয়র্ক আমাকে যতই অবহেলা করুক, এঁদের বন্ধুত্ব পেয়ে আমি ধন্য হলাম। বার্ণার্ড আমার এক মূর্তি গড়তে বসে গেলেন।

কবি হুইটম্যান লিখেছিলেন—আমি শুনি আমেরিকার গান। কবির সেই ছত্রটিকে নিয়েই মূর্তির নাম হ'ল—আমেরিকার নৃত্য। এ-নাম আমারই দেওয়া. একদিন বার্ণার্ডের স্টুডিয়োতে বসে দেখছিলাম নিউইয়র্কের রূপ। উচ্চচূড় প্রাসাদ একটার গায়ে আর একটা লুটোপুটি খাচ্ছে। কলের চিমনির চোঙ ছুঁয়েছে আকাশ—তারই মধ্যে বসে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে আমেরিকা। বললাম,

বন্ধু, এই যে নৃত্যছন্দ, একে রূপ দিতে পার?

বার্ণার্ড অমনি বলে উঠল, এ ছন্দ যে তোমার মধ্যে রূপায়িত। তুমি যদি মডেল হও, তাহলে রূপ দিতে পারি

রাজি হলাম।

বার্ণার্ড শ্বেতমর্মরে ছেনি দিয়ে রূপ দিতে বসলেন। কঠিন পাথর যেন প্রাণময় হয়ে উঠল। কিন্তু বার্ণার্ড নিজে তো ঐ পাথরের মতোই শীতল।

আমরা দুজনে কত গল্প করি, সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধ কত কথা হয়, কিন্তু বার্ণার্ডের চোখে ঝলসে ওঠে না কামনার আলো। আমার দেহটাকেও যেন মর্মর পাথরের সামিল মনে করে। তবু ওকে ভাল লাগে। ওর সঙ্গে আমার মুহূর্তগুলি হাল্কা পাখায় উড়ে যায়। আমরা দুজনে মিলে সৃষ্টি করি—অমেরিকার নৃত্য।

বার্ণার্ড এগিয়ে দেয় না ঠোঁট, ঢেলে দেয় না ঠোঁটে সোহাগ, তবু আমি তার সৃষ্টির উৎসধারা। আমার মধ্যে আমেরিকার সেই প্রাণ সে দেখেছে, যে-প্রাণ আছে ইস্পাত আর কংক্রিটের আড়ালে লুকিয়ে—ওয়াশিংটন আর আব্রাহাম লিঙ্কন আর জেফারসন যে-প্রাণকে আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু 'আমেরিকার নৃত্য' শেষ তো হ'ল না। বার্ণার্ড এক মহান বিস্ময় সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতায় তাতে ছেদ পড়ল। তাই ইসাডোরার অনুপ্রেরণা শুধু শ্বেতমর্মরে ছেনির দাগ রেখে গেল, ফুটিয়ে তুলতে পারলে না আমেরিকার আত্মা।

এর মধ্যে আমার ম্যানেজার বললেন, আমেরিকা আমাকে বুঝতে পারবে না। য়ুরোপেই আমার ফিরে যাওয়া উচিত।

কিন্তু বার্ণার্ড এবং শিল্পী বন্ধুরা বাধা দিলেন। আমেরিকা আমাকে এবার চিনলে। আমি আমেরিকা জয় করলাম। ব্যাঙ্কের খাতা ভরে উঠল। মন আর টেঁকে না। অতলান্তিকের ওপার থেকে ক্ষুদে হাত দুখানি হাতছানি দেয়—হাতছানি দেয় আমার প্রতিষ্ঠান একদিন তাই আমেরিকার কাছে বিদায় নিতে হ'ল।

আমেরিকা থেকে ফ্রান্স—নিউইয়র্ক থেকে পারী।

পৌঁছতে না পৌঁছতেই এলিজাবেথ ছুটে এল, সঙ্গে ডিয়েড্রী আর স্কুলের বিশটি ছাত্রী।

রুয়ে দাঁতয় দুখানি বড় বড় ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। উপরের তলার ফ্ল্যাটে থাকি আমি, নিচেরতলার ফ্ল্যাটে আমার ইস্কুলের ছাত্রীরা।

এবার পারী বিজয় শুরু হয়ে গেল।

শিল্পকলার জননী পারী আমাকে বরণ করে নিলেন।

নাম পেলাম, অর্থ পেলাম, কিন্তু সে তো যথেষ্ট নয়।

জার্মানীতে বিশটি ছাত্রী নিয়ে এলিজাবেথ স্কুল চালাচ্ছে, আর পারীতে আমার কাছে আছে বিশটি। এদের খরচ চালাতে প্রাণান্ত হয়ে উঠলাম। তাছাড়া আরো দু-একজনকে সাহায্য করতেও হচ্ছিল। এলিজাবেথ প্রায়ই জার্মানী থেকে পারীতে আসে। ওকে একদিন হাসতে-হাসতেই বললাম,

এমনি করে তো আর চলে না। ব্যাঙ্কের খাতায় জমার অঙ্কটা সব সময়েই শূন্য থাকে, জমার থেকে ঢের বেশি নিয়ে ফেলি। তারই সুদ দিতে দিতে হাঁফিয়ে উঠি। স্কুল যদি চালাতে হয় একজন ক্রোড়পতিকে পাকড়াতে হবে।

কথাটা মনে ধরল। ক্রোড়পতি—ক্রোড়পতি চাই!

দিনে একশোবার ঐ কথায় জপ করি—একজন ক্রোড়পতি চাই—তাকে খুঁজে বার করতে হবে। যা ছিল ঠাট্টা, সেইটেই এখন ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল।

সেদিন সকালে শো ছিল। শোর পরে সাজঘরে আরশীর সুমুখে বসেছিলাম। এমন সময় পরিচারিকা একখানি কার্ড এনে হাতে দিল। কার্ডখানায় জলজল করছে একটি নাম। এ নামটি সাধারণ নয়, নামের পিছনে ঐশ্বর্যের বিভূতি আছে। অমনি মন বলে উঠল, এতদিন পরে তাহলে তাকে পেলে। বললাম, ওঁকে নিয়ে এস!

ঘরে এসে ঢুকলেন ক্রোড়পতি। দীর্ঘ দেহ, সোনালি চুল আর দাড়ি। ইনিই লোহেনগ্রীন। মিষ্টি স্বরে কথা বলেন, কিন্তু বড় লাজুক। মনে হ'ল—দাড়ির আড়ালে আছে এক কিশোর বালক।

এসেই বললেন, আমাকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনার ভক্ত।

এক অদ্ভুত অনুভূতি এসে দেখা দিলে। বার বার মনে হতে লাগল, একে আগে যেন কোথাও দেখেছি। কোথায়?

স্বপ্নের মতো সে স্মৃতি। বন্ধু মৃত। গীর্জায় তাঁর শবাধারের সুমুখে দাঁড়িয়ে কাঁদছি। আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন একজন। লোহেনগ্রীনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—এই তো সেই মানুষ!

গীর্জায় দেখা—শবাধারের সুমুখে—শিউরিয়ে উঠলাম। কিন্তু এই তো আমার ক্রোড়পতি—এঁকে বিদায় দেওয়া তো চলবে না। ইনিই আমার কিসমৎ।

তিনি সব ভার নিয়ে নিলেন। ছাত্রীদের নিয়ে চলে এলাম ফ্রান্সের সমুদ্রের ধারে। রৌদ্রময় বালুবেলায়।

কমলালেবুর গাছের ছায়ায় ওরা নীল পোষাক পরে নাচে, কমলা ফুলের গোছা দোলে হাতে। আমিও ওদের সঙ্গে মিশে যাই। সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে নাচি। মনে পড়ে ছেলেবেলার সেই কথা। সাগরের মেয়ে আমি, আবার সাগর আমাকে নিয়ে এসেছে ডেকে। আমার ভাগ্যের দেবী আফ্রোদিতে আবার হাসছেন।

সেদিন লোহেনগ্রীন এক মুখোস-নাচের মজলিশ বসিয়েছেন তাঁর হোটেলে। আমার সেখানে নিমন্ত্রণ। এমনি পরি সাদা পোষাক, কিন্তু নাচের আসরে ঝলমলে পোষাক পরতেই হবে—এই না কি রীতি। তিনি একপ্রস্থ পোষাকও পাঠিয়ে দিলেন। মখমলের ঝলমলে পোষাক। আমি সেই পোষাক পরে তো

এলাম। এসে দেখি আনন্দের তুফান বয়ে চলেছে। সবার পরনে ঝলমলে পোষাক, মুখে বিচিত্র মুখোস। নিরানন্দের মেঘ কোথাও নেই। কিন্তু আমার জন্যে মেঘরূপে উদয় হলেন একটি মহিলা। হীরে-জহরতে মোড়া মানুষটি, দু-একবার লোহেনগ্রীনের হোটেলে যে না দেখেছি—এমন নয়। দেখেই মনে হয়েছে, ইনি বন্ধু হতে চান না। আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে রইলেন। মুখখানা থমথমে হয়ে উঠল। এবার নাচ শুরু হ'ল। জোড়ায় জোড়ায় চলছে নাচ, আনন্দের ঘূর্ণি উঠছে। এমন সময় ফোন এল। পরিচালক এসে জানালে, ফোন আমাকে কে ডাকছে।

ছুটে গিয়ে ফোন ধরলাম, আমার একটি ছাত্রীর অসুখ—বাঁচে কিনা এমনি দশা।

এই মেয়েটি ভাবি ভোগে। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। ছুটে গিয়ে লোহেন-গ্রীনকে ইসারায় ডাকলাম। তিনি তখন কার সঙ্গে কথা কইছিলেন, ছুটে এলেন। বললাম,

আমাকে এখুনি ফিরতে হবে।

কেন?

আমাদের এরিকার অসুখ। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিনে। কেঁদে ফেললাম।

লোহেনগ্রীন আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট মিলল। এতদিন তিনি কাছে আসেন নি, এবার কাছে এলেন, তাঁকে পেলাম। মোটর দরজায় দাঁড়িয়েছিল। দুজনে চেপে বসলাম। ডাক্তারকে তুলে নিয়ে ছুটে এলাম। এরিকা তখন নেতিয়ে পড়েছে। শিয়রে বসে রইলাম আমরা দুজনে, ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করে দিলেন।

দুজনে বসে আছি। জানালা দিয়ে দেখা যায় ভোরের আভাস। এমন সময় ডাক্তার এসে জানালেন, আর ভয় নেই। চোখের জল আর বাধা মানলো না, ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল। লোহেনগ্রীন আমার কাছে এসে বললেন, এবার চল; আসরে ফিরে যাই।

নিঃশব্দে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস্ করে বললেন,

আজকের রাতের স্মৃতি চিরদিন মনে থাকবে। ইসাডোরা, আজ তোমায় পেলাম।

তখনো আসর পুরোদমে চলছে। দেখা দেয়নি ক্লান্তি। চারিদিক কলরোলে মুখর। তাই আমাদের অনুপস্থিতি কেউ টের পায়নি। আমরা আবার এসে তাদেরই ভিড়ে মিশে গেলাম।

কিন্তু একজন তো টের পেয়েছেন। তিনি হীরে-জরতের স্তূপ মহিলাটি। আমরা যখন বেরিয়ে যাই, তিনি দেখেছেন; আবার আমাদের ফিরে আসাও তাঁর নজর এড়ায়নি। আমরা ঢুকতেই তিনি তাই এক কাণ্ড করে বসলেন। খাবার টেবিল থেকে একখানি ছুরি নিয়ে ছুটে এলেন লোহেনগ্রীনের দিকে। ভাগ্য ভাল, লোহেনগ্রীন বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি তাঁর হাতখানি চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। অতিথিরা ভাবলে, এও মুখোস নাচের আসরের এক অঙ্গ। তারা হাততালি দিলে, হর্ষধ্বনি করে উঠল।

লোহেনগ্রীন মহিলাকে পরিচারিকার হাতে সঁপে দিয়ে ফিরে এলেন। আবার মজলিশ চলতে লাগল। ট্যাঙ্গোর সুর বেজে উঠল, তারই তালে তালে আমরা নাচলাম।

ভোর পাঁচটায় ভাঙল আসর।

মহিলা ফিরে গেলেন তাঁর হোটেলে, আমি আর লোহেনগ্রীন বসে রইলাম।

আবার প্রেম এল জীবনে, প্রেমের দেবতা লোহেনগ্রীন। ক'দিন পরে তাঁরই সঙ্গে তাঁর বকের পালকের মত সাদা বোটে ইতালীর পথে ভেসে চললাম।

উনিশ

টাকা অভিশাপ নিয়ে আসে! যাদের টাকা আছে তারা তো সুখী নয়।

ইতালীর পথে ভেসে চলল বোট, যাত্রী লোহেনগ্রীন আমি আর আমার ডিয়েড্রী।

লোহেনগ্রীন আমার প্রেমিক। জানি সে ক্রোড়পতি, কিন্তু তার জীবনের দুঃখ তো জানি নে। তাই প্লেটো আর কার্লমার্কস্ আউড়ে ধনের অভিশাপের কথা তাকে বললাম। বললাম,

জান, তোমরা তো দুনিয়ার অভিশাপ। তোমরাই তো স্বার্থের বন্যা বইয়ে দিয়েছ। স্নেহ-মমতা সব স্বার্থের বরফ-গলা জলে ডুবে গেছে।

লোহেনগ্রীন শিউরে উঠলে, বললে, তুমি যে বিপ্লবী তা তো জানতাম না ইসাডোরা!

বললাম, আমার জন্ম থেকেই আমি বিপ্লবী।

লোহেনগ্রীন চুপ করে রইল।

একদিন ঘটনা উঠল চরমে।

বোট চলেছে। সন্ধ্যায় বোটের ডেকে বসে আছি দু'জনে। এমন সময় ও বললে, কোন কবিতাটি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে ইসাডোরা?

তখনি ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম হুইটমানের 'লিভস্ অফ্ গ্রাস'—'মুক্ত পথের গান' কবিতাটি ওকে পড়ে শোনালাম।

পড়তে-পড়তে বিভোর হয়ে গেলাম, আমার পরিবেশ হারিয়ে গেল। মুক্তির পাথায় ভর করে মন বিপ্লবী কবির সঙ্গে উধাও হয়ে চলল।

পড়া শেষ হ'ল, তাকিয়ে দেখি আমার প্রেমিকের মুখখানি রোষরক্তিম। সে বলে উঠল, কি বাজে কবিতা পড়লে ইসাডোরা! এই কবি তো কখনো নিজের রুজি-রোজগারও করতে পারে নি।

কিন্তু, চিৎকার করে উঠলাম, তবু রেখে গেছেন আমেরিকার মুক্তিকামনার শিখা জ্বালিয়ে। তাঁর সেই স্বপ্ন তো মহান।

স্বপ্ন চুলোয় যাক!

হঠাৎ মনে হ'ল কবির স্বপ্ন তো আমার প্রেমিকের স্বপ্ন নয়। সে কল-কারখানাময় আমেরিকাকেই চেনে। সেই কারখানার চোঙ দিয়ে যাদের রক্ত

ধোঁয়া হয়ে রোজ উড়ে যায়, তাদের কামনার খবর তো রাখে না। তাই তীব্রস্বরে বললাম,

তোমার স্বপ্ন কবির স্বপ্নের সঙ্গে না মিলতে পারে, কিন্তু সেই স্বপ্নই তো আমেরিকার জনগণের স্বপ্ন।

জনগণ—উচ্ছন্নে যাক তারা! চিৎকার করে উঠল লোহেনগ্রীন।

তোমরাই তো তাদের উচ্ছন্নে দিচ্ছ—তোমরাই তো পৃথিবীর অভিশাপ!

কেঁদে ফেললাম।

এবার লোহেনগ্রীন আমাকে বুকে টেনে নিলে, তার সোহাগ ঝরে পড়তে লাগল। বিপ্লবী ইসাডোরা তারই আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দিলে। নারী ছলনা জানে, কিন্তু তার প্রকৃতি তাকেও ছলনা করে। ভাবলাম, যে-জনগণকে ও চায় না, সেই জনগণের জন্যই ওর ধনভাণ্ডার আমি লুটে নেব। লোহেনগ্রীনের টাকায় ইসাডোরার নৃত্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। সে নৃত্য হুইটমানের মুক্ত পথের গানের ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে আছে। সেদিন হুইটমান—আমার আত্মার নেতা হুইটমানকে পূজা করবে আমার লোহেনগ্রীন। সোনার আঁস ওর চোখ থেকে খসে পড়বে, হলদে ছানি কেটে যাবে।

এরই মধ্যে বোট এসে পৌঁছল ঘন নীল ভূমধ্যসাগরে।

কতদিনের কথা, কিন্তু কাল বলে তো মনে হয়। বিস্তীর্ণ ডেক বোটের, স্ফটিক-মোড়া টেবিল, রূপোর পাত্রে পাত্রে খাবার। ডিয়েড্রী নাচছে আপন মনে। আমিও খুশি। তবু মাঝে মাঝে খালাসীদের উপর চোখ পড়ছে। ইঞ্জিন ঘরে জোগাচ্ছে কয়লা। লস্কর আছে এখানে পঞ্চাশজন। তাছাড়া ক্যাপটেন আর মেট। শুধু এক ধনীর খেয়ালে এই অপব্যয়। আর সেই ধনীরই খেয়াল খুশির ঘূর্ণায় নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আমার ছেলেবেলার সংগ্রামের সঙ্গে এর তো ঘোর অমিল! ওকে এই ধনের জগত থেকে টেনে নামাতে হবে, তবেই তো আমি ইসাডোরা!

পম্পাই-এ এসে ভিড়ল আমাদের বোট। এ সেই পম্পাই—বিসুভিয়াসের ভস্মস্তূপে ঢাকা পড়ে ছিল হাজার বছরেরও বেশি—আবার সন্ধানীর খনিত্র তাকে জাগিয়ে তুলেছে। এ এক মৃতের শহর।

ঘুরে বেড়ালাম দু'জনে শহরের পথে পথে। তারপর ফিরে এলাম। বোট আবার চলল।

ভূমধ্যসাগর যেন অনন্ত—দূরে, দূরে, বিছিয়ে আছে। পুরানো রোম আর গ্রীসের স্মৃতি বহন করে বয়ে চলেছে। প্রেমিকের সাধ, ভূমধ্যসাগরের আর

এক প্রান্তে চলে যায়। কিন্তু আমার চুক্তির কথা মনে পড়ল। রাশিয়ায় যেতে হবে আবার। বললাম,

আর নয়, এবার ফিরে চল!

প্রেমিক রাজী নয়।

তর্কের ঝড় উঠল, মান-অভিমানের পালা চলল। শেষে আমিই জিতলাম। প্রেমিক আর মেয়ের কাছে বিদায় নিয়ে চললাম রাশিয়ায়। আবার পেলাম নাম, আবার মুখর হয়ে উঠল রাশিয়া আমার স্তুতিতে।

সেদিন বসে আছি আনমনে। এমন সময় যে এসে দাঁড়াল। সে লোহেনগ্রীন নয়, পিম নয়। তবে?

আর কে, গর্ডন ক্রেইগ।

ক্রেইগ স্তানিস্‌লাভস্কীর থিয়েটারের মঞ্চ সজ্জার ভার নিয়ে এসেছে।

বললাম, তুমি এলে গর্ডন?

গর্ডন আমার চোখের দিকে চেয়ে বললে, এলাম আমার ইসাডোরাকে দেখতে এলাম।

মনে হ'ল, সবকিছু যেন মিছে হয়ে গেল। ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বললাম, আমাকে নাও গর্ডন!

ওকে আমি এখনও ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসা ঘর বাঁধতে চায় না। পথ যে বন্ধনহীন গ্রন্থি বেঁধে দিলে, সেইটুকুই জিইয়ে রাখতে চায়। তাই পরদিন ওর সঙ্গে দেখা না করেই কিয়েভ্-এ চলে এলাম।

রাশিয়া জয় করে ফিরে এলাম পারীতে। প্রেমিক আর মেয়ে দু'জনেই সেখানে প্রতীক্ষায় আছে।

প্রেমিক এবার আমাকে দস্তুরমতো বিলাসী করে তুলল। নামী দোকানের দামী পোষাক উঠল আমার দেহে, দামী রেঁস্তরায় পান-ভোজন চলতে লাগল। কিন্তু মন তো তবু হাঁফিয়ে ওঠে। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর তো চায় না। আর প্রেমিকও যেন খুশি নয়।

একদিন সকালে আমরা বেড়াচ্ছিলাম পারীর পথে। কত কথাই বলছিলাম। হঠাৎ দেখি ওর মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে। শুধালাম,

কি হ'ল তোমার?

ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, আমাকে ক্ষমা কর ইসাডোরা! আমার মনে তো সুখ নেই। প্রতি মুহূর্তেই শবাধারে-শোয়ানো মার মৃত্যু-ম্লান মুখখানি

মনে পড়ে। তাই ভাবি, বেঁচে থেকে লাভ কি, মৃত্যুই তো জীবনের শেষ কথা।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই তো ধনবাদী সভ্যতার দুঃখ! আত্মাকে সোনা দিয়ে ঢেকে রাখে, তাইত জীবনকে পায় না খুঁজে। মৃত্যুকেই বরণ করে নেয়।

তাই ধনী চায় বিলাসে ডুবে থাকতে, ভুলে থাকতে।

লোহেনগ্রীন হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বললে, যাবে, আবার যাবে সাগরে? ঐ নীল সমুদ্র বুঝি আমার এ দুঃখ ভোলাতে পারবে!

ব্রিটানির উপকূল পার হয়ে চললাম আমরা। অনন্ত সমুদ্রে এখন আমাদের জীবন। শহর-বন্দর বিন্দুর মতো ছড়িয়ে আছে উপকূলে, দেখতে-দেখতে পার হয়ে যাই। এমনি করে ভেনিসে এসে পৌঁছিলাম।

ভেনিসে ক'দিন কেটে গেল।

একদিন সন্ত মার্কোর গীর্জায় বসেছিলাম। আনমনে তাকিয়ে ছিলাম গীর্জার মিনারের দিকে। হঠাৎ মনে হ'ল, মিনারের আড়ালে থেকে একটি ছেলে উঁকি মারছে। দেবদূতের মতো সুন্দর শিশু, নীল তার চোখ, সোনালী তার চুল। স্বপ্ন হঠাৎ মিলিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। শুধু আকাশ-ছোঁয়া মিনার সাদা মেঘে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হ'ল বুকে যেন আবার ক্ষীরধারা উত্তাল হয়ে উঠেছে, দেহ যেন ভেঙে-চুরে যাচ্ছে, শ্রোনী ভারী। ভয়ে শিউরে উঠলাম—সন্তান বুঝি আসছে আবার। পুরুষের ভালবাসার খেয়ালে আবার আমি সন্তানবতী। কিন্তু কি হবে আমার আদর্শের, কি হবে আমার প্রতিষ্ঠানের?

লক্ষণগুলো সবই মিলে গেল। মিলানে আছেন এক ডাক্তার-বন্ধু, তাঁর কাছে ছুটে গেলাম।

তিনি বললেন, অসম্ভব! তুমি শিল্পী, তোমার দেহের ছন্দকে তুমি কি ধ্বংস করে দেবে ইসাডোরা। আবার মাতৃত্বের বন্ধনে ধরা দেবে? মানবতার কাছে এ যে তোমার এক মস্ত অপরাধ।

তাঁর কথা শুনলাম। আবার আসছে দেহের সেই বিকৃতির দিন। অথচ এই দেহই তো আমার সব। কিন্তু মন যে কামনায় অধীর। স্বপ্নে-দেখা দেব-শিশু আসছে আমার বুকে। আমার ছেলে আসছে!

বন্ধুকে বললাম, ভেবে দেখি।

বন্ধু বললেন, আচ্ছা! কিন্তু মনে রেখো, দেহ তোমার নিজের নয়।

ফিরে এসে উঠলাম এক হোটেলে। যে ঘর আমাকে দেওয়া হ'ল, সেখানে একখানি ছবি টাঙানো। অনুপমা এক নারী। নিষ্ঠুর তার দুটি চোখ। তার দিকে চোখ পড়তেই, সে যেন হেসে উঠল।

আপন মনেই শুধালাম, হাসলে কেন?

যা-ই কর, মৃত্যুকে তো এড়াতে পারবে না!

পারবো না?

না, না,—দেখ না, আমারও ছিল রূপ—আজ সে-রূপ তো শুধু স্মৃতি। ছবি তাকে ধরে রেখেছে রঙে, তুলিতে, কিন্তু রক্তমাংসের দেহ কোথায় গেল?

হেসে উঠল নিষ্ঠুরা নারী। আমি হাতে চোখ ঢাকলাম।

আবার হাসি!

এবার ছুটে গেলাম ছবির কাছে, মুখ তুলে বললাম, না, না, মৃত্যু নয়! আমি জীবনের দোসর, প্রেমের সাথী। আমি প্রকৃতির নিয়ম মেনে নেব।

চোখ দু'টো যেন আবার হেসে উঠল। তেমনি নিষ্ঠুর হাসি।

ডাক্তার বন্ধুটিকে জানালাম, প্রকৃতির নিয়ম আমি মেনে নিলাম। বোর্টে ফিরে এসে ডিয়েড্রাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, তোমার একটি ছোট্ট ভাই আসছে!

হেসে উঠল মেয়ে, হাততালি দিলে, বাঃ কি মজা!

প্রেমিক দু'দিনের জন্য প্যারীতে গিয়েছিল। তার করলাম। সে ছুটে এল। তাকিয়ে দেখি, তার মুখে দুঃখের লেশমাত্র নেই আমার সন্তান তার আগমনী গানে দুঃখ মুছে দিয়েছে, স্নায়ুর রোগ তার আরাম হয়ে গেছে।

প্রেমিক একদিন বললে চল, এবার নীলনদের দেশে যাই। এই ধূসর, মুখ-গোমড়া আকাশ আর ভাল লাগে না। জীবনে যখন আনন্দ এল, তখন প্রকৃতির এই হুতাশা আর ভাল লাগে না। যাবে—সেই থিবস্—সেই মেমফিস দেখবে?

বললাম, কিন্তু আমার কাজ?

এখন আর কাজ নয়!

নীলনদের বুকে ভেসে চলল বোট। আত্মা হাজার, দু' হাজার বছরের কুয়াশায় ডুবে গেল। সেই কুয়াশা পাড়ি দিয়ে সে বুঝি পৌঁছবে অনন্তের তোরণে।

দুধারে পিরামিড, মন্দির। পিরামিড মৃত্যু ছায়া ফেলে, আবার মন্দিরে প্রেমের

দেবী হেসে ওঠেন। তাঁর হাসি দেখি, রক্তাক্ত সূর্যোদয়ে, ম্লান স্বর্ণময় সূর্যাস্তে। সোনালি বালিতে। চাষী-মেয়েরা জলভরা ঘড়া মাথায় নিয়ে চলে যায়, ছন্দ দুলে ওঠে তাদের চলায়। ডিয়েড্রী ওদের মতো করে চলতে চায়। নাচে।

রহস্যময় স্ফিংকস-এর মূর্তি দেখে বলে, মা-মণি, পুতুলটা তো ভাল নয় দেখতে! তবে মস্ত—মস্ত বড়!

আবার মৃত্যুর ছায়া উঠে আসে যুগ-যুগের আঁধার থেকে। আমার মন টানে মৃতের উপত্যকা। সেখানে পীরামিডের সার। সেখানে আছে এক শিশু রাজকুমারের সমাধি।

রাজকুমার ফারাও হতে পারেনি—মৃত শিশু হয়েই রইল। আজ বেঁচে থাকলে তার বয়েস হোত ছ' হাজার বছর। দেখি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি; ভাঙাচোরা মূর্তিগুলি তাকিয়ে থাকে—সম্মোহিত করে দেয়। আমার গর্ভের আঁধারে শিশুও কি সম্মোহিত হয়ে যায়?

সূর্য ওঠে ভোর চারটেয়। তখন থেকেই নীলনদ মুখর হয়ে ওঠে। জল তুলতে আসে মেয়েরা, কিষাণেরা। উটের পিঠে চলে মরুভূমির উপর দিয়ে মানুষের সার। কর্মের গুঞ্জন ওঠে। সে গুঞ্জন আবার থেমে যায় সূর্যাস্তে।

রাতও বড় সুন্দর। নীল চাঁদোয়ার মতো আকাশ, সেই আকাশে তারার বুটি। তাদের আলো এসে ঠিকরে পড়ে নীল নদের জলে, পাথরের বুকে, মরুভূমির বুকে। মাঝে মাঝে আলো কেঁপে ওঠে, ছায়া এসে তাকে ঘিরে ধরে। স্বপ্নের দেশ বলে মনে হয়।

স্বপ্নের দেশ থেকে একদিন ফিরে আসতে হ'ল ফ্রান্সে। সন্তান জানাচ্ছে তার আগমনী। ফ্রান্সের এক প্রান্তে সাগরের ধারে বাসা বাঁধলাম।

মে মাসের পয়লা। সকালবেলা। সাগর এখন নীল। বহ্নিমান সূর্য। চারিদিকে ফুলের মেলা। এরই মধ্যে জন্ম নিলে আমার ছেলে।

কষ্ট এবার বেশি হ'ল না।

ডিয়েড্রী পা টিপে টিপে ঘরে এল। আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বললে,

মা-মণি, তোমার ভয় নেই—ভাইকে আমি কোলে করে রাখব সারাদিন। দেখো! মেয়ের পাকা কথা শুনে হাসি খেলে গেল ঠোঁটে।

সে তার কথা রেখেছিল। শেষ অবধি ভাইকে জড়িয়ে ধরেই সে ছিল মৃত্যু এসেও ভাইকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি।

কুড়ি

পারীতে ফিরে এলাম আমরা। লোহেনগ্রীনের ইচ্ছে, বন্ধু-বান্ধবদের একদিন ভোজ দেয়। আমাকে বললে, তুমি প্রোগ্রাম তৈরী কর।

হেসে বললাম, আমি প্রোগ্রাম তৈরী করলে অনেক খরচ।

হোক খরচ, তুমি ব্যবস্থা কর!

ভার্সাঈয়ের বাগান-বাড়িতে অতিথিদের নিমন্ত্রণ করলাম। পার্কে খোলা হাওয়ায় বসল চা আর শাম্পেনের আসর। অর্কেস্ট্রা বাজতে লাগল। সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন অর্কেস্ট্রায় বেজে উঠল ভাগ্‌নারের সীগফ্রিডের শবযাত্রা। তারপরে ভোজ। সে ভোজে সুস্বাদু ভোজ্য আর পানীয়ের অভাব রইল না। তারপরে নাচের আসর। এমনি করেই রাত কেটে গেল। কিন্তু লোহেনগ্রীন আসতে পারলে না। সে জানাল, হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি একাই অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করলাম। বার বার মনে হচ্ছিল, ধনে সুখ নেই। ধনী সুখ খুঁজতে যায়, কিন্তু সে-যেন গ্রীক উপকথার সেই সীসিফাসের ব্যর্থ চেষ্টা। একবার সিসিফাস পাথরখানা পাহাড়ের উপর তোলে, পরমুহূর্তেই সেখানা গড়িয়ে পড়ে। এই জন্যেই তো আমার মন সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সুখ ধনে নেই, সুখ মানুষের সাম্যে। মানুষের ভ্রাতৃত্বে।

গ্রীষ্ম এসে গেল। প্রেমিক হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করলে, ইসাডোরা, এস আমরা বিয়ে করি!

বললাম, তারপরে?

তারপরে আমার বোটে চড়ে দুজনে সাগর পাড়ি দেব।

তারপর?

লোহেনগ্রীন বিরক্ত হয়ে উঠল, বললে, জানি না!

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হ'ল তিনমাস আমরা পরীক্ষা করে দেখব বিবাহিত জীবনের সুখ, তারপর বুঝে-শুনে বিয়ে করা যাবে।

ইংলণ্ডের ডেভনশায়ারে প্রেমিকের একখানা বাড়ি। বিরাট বাড়ি, বিরাট গ্যারাজ, সেখানে চৌদ্দখানা নানা জাতের মোটর। বন্দরে রয়েছে তার বোট। সেখানেই পরীক্ষা শুরু হ'ল।

ইংলণ্ডের গ্রীষ্ম মুখে করে বর্ষা নিয়ে আসে। সারাদিন ধরে টিপটিপ করে ঝরে বর্ষা। ইংরেজরা কেয়ারও করে না। যারা মেহনতি করে খায়, তাদের কথা আলাদা, কিন্তু বিলাসীরা তখন অদ্ভুত জীবন কাটায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চব্য-চোষ্য দিয়ে ছোট হাজিরি সারে। তারপরে বর্ষাতি চাপিয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরে ফিরে আবার ঘটা করে আহার। তারপরে পাঁচটা অবধি ঘুমোয়। পাঁচটায় চা পান করতে নেমে আসে। তারপর ব্রীজ খেলা। আবার নৈশ ভোজের জন্য সাজগোজ শুরু হয়। ভোজের পরে রাজনীতির হাল্কা আলাপ।

এ জীবনধারা আমার অসহ্য হয়ে উঠল। আমি ক্ষেপে গেলাম। শেষে ঠিক করলাম, নেচে এই একঘেয়েমি কাটাব। কিন্তু পিয়ানো-বাজিয়ে কোথায়? এক বন্ধুকে তার করে দিলাম, পিয়ানো-বাজিয়ে পাঠাও। বন্ধু বেছে বেছে এমন একজনকে পাঠালেন, যার বিশ্রী চেহারা আমাকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলল।

রেগে উঠলাম, এমন লোক পাঠাল কেন?

লোহেনগ্রীন হেসে বললে, যাহোক, তোমার বন্ধুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তিনি আমাকে ঈর্ষার হাত থেকে বাঁচালেন।

লোহেনগ্রীনকে এখন থেকে ওর নামের আদি অক্ষর ধরে ডাকব। বলব এল্। এল্ অসুস্থ। সে বাড়ির এক প্রান্তে থাকে। সেখানে ডাক্তার, নার্স তাকে ঘিরে আছে। ডাক্তার রক্তের চাপ দেখেন, বিদ্যুৎ-চিকিৎসা করেন। আর আমি নিজের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য নাচি। কিন্তু পিয়ানো-বাজিয়েকে সইতে পারিনে।

একদিন আমি আর একজন মহিলা মোটরে বেড়াতে বেরিয়েছি। সঙ্গে আছে পিয়ানো-বাজিয়ে। কিছুদূর যেতেই বৃষ্টি নামল। একে পিয়ানো-বাজিয়ে সাথী, তার উপরে বৃষ্টি—আর সইতে পারলাম না—হুকুম দিলাম—

ফিরে চল!

রাস্তা খারাপ, এখানে-ওখানে গর্ত। চালক গাড়ি ঘোরাতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম পিয়ানো-বাজিয়ের কোলে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে নিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, খড়ের গাদায় আগুন ধরলে যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি জ্বলে উঠল আমার সত্তা। ওর মুখের দিকে তাকালাম! এতদিন দেখতে পাইনি, আজ দেখলাম—ও সুন্দর—ওর চোখে আছে প্রতিভার শিখা।

ওর দিকে সারাপথ তাকিয়ে রইলাম! ও হ'ল আমার প্রেমিক।

সেই থেকে লুকোচুরি খেলা চলল প্রেমের। বাগানে কাদাভরা পথে আমাদের দেখা হয়, প্রেম চলে। এদিকে এল্ ধনীকের রোগে জর্জর। সে জানে না। একদিন জানাজানি হয়ে গেল। সেদিন আমার পিয়ানো-বাজিয়ে প্রেমিক বিদায় নিলে। আর আমিও ঘরণী জীবনের পালা ইতি করে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দিগ্‌বিজয়ে। আমেরিকায় ঘুরে বেড়ালাম। ভালবাসলাম এখানে-সেখানে, ভালবাসা পেলাম। মনে হ'ল, ভালবাসা এক খেলা, আবার এক বিয়োগান্ত সুরও তাতে মিশে আছে। একদিন আমেরিকা ঘুরে ফিরে এলাম পারীতে। এবার নিউলীতে এক স্টুডিয়ো কিনে ফেললাম। আমার বন্ধু হেনার স্কেন এলেন—দুজনে মিলে দিনরাত সুর আর নৃত্যধারার প্লাবন বইয়ে দিলাম। এই সময়ে কবি দান্নাৎসিয়োর সঙ্গে দেখা।

এলিনোরার প্রেমিক দান্নাৎসিয়ো সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল নয়। তাই যখন এক বন্ধু এসে বললেন, কবি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। সাফ উত্তর দিলাম, না, ওঁকে এনো না! দেখলে হয়ত কড়া কথাই বলে বসব। কিন্তু তবু বন্ধু একদিন হঠাৎ তাঁকে নিয়ে এলেন।

তাঁর চোখ দুটি দেখেই আমি মুগ্ধ হলাম, কিন্তু আমি তো জানি, নামী মহিলা দেখলেই তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়া তাঁর রোগ। তাই প্রথম থেকেই সতর্ক হয়ে গেলাম। তাছাড়া এলিনোরার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি কবি তাও শুনেছিলাম। তাই ঠিক করলাম, পৃথিবীতে একমাত্র আমিই ওঁকে বাধা দেব, ওঁকে প্রত্যাখ্যান করব।

দান্নাৎসিয়ো কিন্তু প্রেম করবেনই। প্রতিদিন সকালে একটি করে কবিতা আর ফুল পাঠাতে লাগলেন। সকাল আটটায় রোজই কবিতা আর ফুল এসে হাজির। তবু শক্ত রইলাম।

দান্নাৎসিয়ো এবার যখন-তখন এসে দেখা দিতে লাগলেন। একদিন রাতে এসে বললেন,

আজ দুপুর রাতে আমি আসব ইসাডোরা। বলেই চলে গেলেন।

আমি আর এক বন্ধু মিলে স্টুডিয়োটি সাদা লিলি দিয়ে ভরে দিলাম। শবযাত্রার এ-ফুল। তারপরে জ্বেলে দিলাম সারি সারি মোমবাতি। অন্ত্যেষ্টির মৃত্যুম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। তিনি এলেন। তাঁকে হাত ধরে নিয়ে

গিয়ে বসিয়ে দিলাম আরাম-কেদারায়। তারপর ফুল দিয়ে ঢেকে দিলাম তাঁর দেহ, মোম সাজিয়ে দিলাম তাঁর চারিদিকে ঘিরে। শপ্যাঁর অন্ত্যেষ্টীযাত্রার সুরে ঘর ভরে গেল তারই তালে তালে নাচতে লাগলাম। এবার ফুঁ দিয়ে একে একে নিবিয়ে দিলাম সমস্ত বাতি। শুধু তাঁর শিয়রের আর পায়ের কাছেব বাতি দুটি জ্বলতে লাগল। কবি যেন সম্মোহিত মানুষ, তেমনি স্তব্ধ হয়ে আছেন। এবার পায়ের কাছের আলোটি নিবিয়ে দিলাম। তারপরে নাচতে নাচতে গিয়ে দাঁড়ালাম শিয়রে। তিনি আর সইতে পারলেন না, আর্তনাদ করে উঠলেন। তারপর ঘর ছেড়ে ছুটে চলে গেলেন। আমরা তখন দু'বন্ধুতে মিলে হাসছি, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছি।

দান্নাৎসিয়োর এই প্রথম আবির্ভাব। দ্বিতীয় আবির্ভাবেও তাঁকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। দু'বছর পরের কথা। ভার্সাঈ এ তখন আমি' তাঁকে এক হোটেলে ভোজে নিমন্ত্রণ করি। আমার গাড়িতেই আমরা দুজনে হোটেলে যাব এমন সময় কবি প্রস্তাব করে বসলেন,

চল না, আগে একটু ঘুরে যাই।

আমি রাজি।

মারলির বাগানে আমরা এলাম। কবি এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ রসভঙ্গ করে বলে বসলাম,

এখন চলুন ফিরে যাই!

গাড়িখানা আগেই বিদায় দিয়েছিলাম, তাই কবিকে নিয়ে সমস্ত পথটা হাঁটতে হ'ল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চললাম। কবি প্রেম করবেন কি, শুধু ছেলেমানুষের মত বলেন,

আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমার মগজ তো যে সে নয়, তাকে খাবার জোগাতে হবে। আমি তো আর চলতে পারছিনে!

শেষে দয়া হ'ল। কবিকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করলাম, তিনিও তাঁর মগজের খাবার জোগাতে লেগে গেলেন। প্রেমের সেখানে কানাকড়িও দাম নেই।

তিনবারের বার কবির সঙ্গে দেখা হয় রোমে। হোটেলে পাশাপাশি ঘরে আছি আমরা দুজনে। তখন তাঁর প্রেমিকা মার্কুইসা কাসেত্তি নামে এক ধনী সম্ভ্রান্ত মহিলা। একদিন কাসেত্তি আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে গিয়ে দেখি মহিলা এক চিড়িয়াখানা সাজিয়ে বসে আছেন। ভোজের পরে এক বুড়িকে

ডেকে আনলেন। বুড়ি ভাগ্য গণনা করে। এমন সময় এলেন কবি। তাঁর এসবে ভারি বিশ্বাস। বুড়ি তাঁকে বললে,

তুমি আকাশে উড়ে বেড়াবে, কত কি করবে। মাটিতে আছড়ে পড়বে, মৃত্যুর দোরে গিয়ে হাজির হবে। কিন্তু মৃত্যু তো তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আমার ভাগ্যও গণনা করলে বুড়ি, মৃদুস্বরে স্বপ্নময় চোখ দুটি তুলে বললে,

তুমি নতুন ধর্মে দীক্ষা দেবে মানুষকে—তার মন্দির গড়ে উঠবে দুনিয়া জুড়ে। দুর্ঘটনা তোমার জীবনে বহুবার এসে দেখা দেবে, কিন্তু তোমাকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা করবেন দেবতারা। তুমি অমর।

এবার আমি আর কবি কাসেত্তির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম হোটেলে। পথে তিনি বললেন,

ইসাডোরা, প্রতিদিন রাতে বারোটার সময় তোমার-ঘরের কাছে এসে আমি দাঁড়াব। পৃথিবীর যত মেয়ে সবাইকে আমি জয় করেছি, কিন্তু তুমি এখনো আমার কাছে অজেয় হয়ে আছ।

সত্যিই কবি রোজ রাতে এসে দাঁড়াতেন আমার ঘরের কাছে। আমি শুনতাম তাঁর পায়ের শব্দ, বলতাম মনে মনে,

আমি হব একক, আমিই একমাত্র মেয়ে কবিকে প্রত্যাখ্যান করব।

তিনি কখনো বা আমার ঘরে চলে আসতেন, তাঁর জীবনের কত কাহিনী বলতেন, তাঁর প্রতিভাদীপ্ত চোখে জ্বলে উঠত কামনার শিখা। আত্মহারা হয়ে যেতাম। হঠাৎ নিজের প্রতিজ্ঞা মনে পড়ত, হাত ধরে তাঁকে বাইরে বার করে দিয়ে দরজা মুখের উপর বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু এমনি করে তো চলে না। ভাবি, পাগল হয়ে যাব নাকি! শেষে একদিন রোম থেকে পালিয়ে এলাম। ইসাডোরা এমনি করেই কবি দান্নাৎসিয়োর কাছে অজেয় হয়ে রইল।

এল্‌-এর কথা তো আর বলা হয়নি। সে তো আমার বিশ্বস্ত প্রেমিক। সে আসে প্রতিদিন স্টুডিয়োতে, আর আসেন আঁরি বাতাইল, বার্থা বেডী আর বহু বন্ধুজন। গীর্জার বেদীর মতো আমার স্টুডিয়ো, তার চারিদিকে ঘিরে থাকে নীল পর্দা। তাছাড়া আছে এক গোপন ঘর। সে যেন গ্রীক উপকথার মায়াবিনী সার্সির রাজ্য। কালো মখমলের পর্দা ঘেরা। চারিদিকের দেয়ালে আরশী—সেই আরশীতে ঝকমকিয়ে ওঠে পর্দার ছায়া। কালো কার্পেট পাতা মেঝেয়, একখানা ডিভান—সেখানে বালিশের স্তূপ। এ ঘরে এলেই যেন মনটা কেমন

বদলে যায়। কামনা যেন দাউ দাউ করে জলে ওঠে। এখানে এলে অনুভূতি বদলে যায়, কথার সুর আলাদা হয়ে যায়। এখানে প্রবেশ নিষেধ, শুধু আসতে পারেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা।

সেদিন শ্যাম্পেন-মজলিস বসেছে স্টুডিয়োতে। সারা রাত ধরে চলছে। দুটোর সময় আমি এসে বসলাম আমার এই গোপন মহলে। আঁরি আমার পেছনে পেছনে এল। সে আমার ভাইয়ের মতো। কিন্তু শ্যাম্পেনের রঙীন নেশায় সে প্রেমিক হয়ে উঠল, আমাকে জড়িয়ে ধরল, এমন সময় ঘরে ঢুকল এল্। দুজনকে ডিভানের উপর দেখে সে যেমন এসেছিল, তেমনি ছুটে চলে গেল। তারপর স্টুডিয়োর মজলিসে এক কাণ্ড। চিৎকার উঠল, গালাগাল। বেরিয়ে এলাম আমার মহল থেকে। বললাম, কি হয়েছে?

এল্ বলে উঠল, কি হয়েছে? লজ্জা করে না জিজ্ঞেস করতে? আমার ভুল ভেঙেছে, আমি আর আসব না!

বললাম, তুমি মিছে সন্দেহ করছ।

কিন্তু এল্ চলে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি বন্ধু স্কেনকে বললাম, তুমি বাজাও, আমি নাচব। মজলিস ভাঙতে আমি দেব না।

বাজনার তালে তালে চলল নাচ, রাত ফুরিয়ে গেল।

আঁরি এল্‌কে সবকথা জানিয়ে লিখল চিঠি। কিন্তু এল্ নীরব।

পরদিন রাতে সে এল্। এসে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল মোটরে। গাড়ি ছুটছে, আর তোড়ে ছুটছে তার গাল। আমি চুপ করে শুনছি। হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে সে আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিলে। তারপর মিলিয়ে গেল।

মূর্চ্ছাহতের মতো পথ চলতে লাগলাম। কত নিশাচর প্রেমিক এসে কত ইঙ্গিত করলে, ফিসফিস করে জানালে গোপন মিলনের প্রস্তাব। মনে হ'ল, নরক গুলজার হয়ে উঠেছে।

একুশ

দুদিন পরে খবর পেলাম, এল্ চলে গেছে মিশরে।

বিষাদের ছায়া পড়ল জীবনের উপর। এক অমঙ্গল যেন ঘনিয়ে আসছে।

তবু নাচি, এখানে ওখানে যাই। এরই মধ্যে রাশিয়ায় ঘুরে এলাম। কিয়েভ-এ নামলাম ভোরবেলা। তেমনি তুষার ঝরছে। আমাদের গাড়ি চলতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়লাম গাড়ির দুলুনিতে। হঠাৎ চমকে জেগে উঠে চেয়ে দেখি, পথের দুধারে সারি সারি কফিন। সাধারণ কফিন নয়—ঐ গুলোর ভিতরে চিরনিদ্রায় বিভোর হয়ে আছে শিশুর দল। স্কেন আমার সাথী, তার হাত চেপে ধরে বললাম, দেখ, দেখ কত শিশু মারা গেছে!

স্কেন বললে, কিন্তু আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে!

সে কি? দেখতে পাচ্ছ না?

না, শুধু তো তুষার ঝরছে। দুপাশে শুধু তুষারের স্তূপ। তুমি শ্রান্ত, তাই ওসব দেখছ।

কিন্তু ভুল দেখলাম কি? হয় তো তাই। শপ্যার অন্ত্যেষ্টির সুর বাজছে আমার কানে। নাচতে গেলে ঐ সুরই বেজে ওঠে আমার দেহে। সাদা লিলি ফুল ফুটে ওঠে আমার চোখের সুমুখে। ডাক্তার দেখালাম, তিনি বললেন, এ স্নায়ুর বিকলতা। বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিলেন। ভার্সাঈ চলে এলাম।

আবার এল্ এসে হাজির। মিশর ভ্রমণ সে একা করেনি তা জানি, সঙ্গিনী একটি ছিল। কিন্তু তবু তাকে দেখে খুশি হলাম।

ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিককে নিয়েই দিন কাটে আমার। ওরা গোলমাল করে। দাসী বলে, অমন কোরো না, মা বিরক্ত হবেন।

হেসে উত্তর দিই, ওদের গোলমাল না শুনতে পেলে যে জীবনে কোন সুখই থাকবে না। বলেই চুপ করে যাই। শিউরে উঠি। অমঙ্গল তার ছায়া ফেলেছে বুঝি, সন্তর্পণে ঘিরে ধরছে ছায়া।

সেদিন সকাল বেলা এল্ ফোন করলে, শহরে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এস। ওদের দেখতে ইচ্ছে করে।

চার মাস ও দেখেনি ওদের।

ডিয়েড্রীকে ডেকে চুপি চুপি বললাম কথাটা। প্যাট্রিককে আদর করে বললাম, আজ কোথায় যাব আমরা বল তো ?

প্যাট্রিকের মুখে এখনো কথা ভাল করে ফোটেনি। সে শুধু হাসল।

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রওনা হব, নার্স এসে বললে, বৃষ্টি হতে পারে, ওদের নিয়ে বেরুবেন না।

কিন্তু শুনলাম না তার সতর্কবাণী। পারীর পথে ছুটে চলল মোটর। সুখ-স্বপ্নে বিভোর আমি।

এক রেস্তঁরায় এল্ আর আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলাম। টেবিল ঘিরে বসলাম চারজনে।

এল্ কিনেছে পারীতে একটি জায়গা, সেখানে এক নাট্যশালা গড়ে উঠবে। সে তারই পরিকল্পনায় ব্যস্ত। বললে,

থিয়েটারের নাম হবে ইসাডোরার থিয়েটার।

আমি হেসে বললাম, না, না, এর নাম হবে প্যাট্রিক থিয়েটার। প্যাট্রিক আমার হবে বিখ্যাত সুরকার, ও আগামীর সঙ্গীত রচনা করবে।

আমার মহলা আছে, তাই উঠে পড়লাম। স্টুডিয়োর কাছে এসে নার্সকে বললাম,

তুমি কি ওদের নিয়ে অপেক্ষা করবে, না, চলে যাবে ?

নার্স বললে, আমরা চলেই যাব। ওরা ক্লান্ত।

আমি ওদের চুমু খেয়ে বললাম, তোমরা যাও। আমি শীগ্গীরই ফিরছি।

ডিয়েড্রা দেখি, গাড়ির কাচের সার্সীর উপর ঠোঁট রেখেছে। বাইরে থেকে ওখানটায় চুমু খেলাম। ঠাণ্ডা কাঁচের স্পর্শে যেন এক হিমতরঙ্গ নেমে এল দেহ বেয়ে। অশুভ আশংকায় মন অধার। ওদের ডাকতে যাচ্ছিলাম, গাড়ি এরই মধ্যে মিলিয়ে গেল। ডাকা আর হ'ল না।

স্টুডিয়োতে এসে ঢুকলাম। এখনো মহলার সময় হয় নি। চলে গেলাম আমার গোপন মহলে, সেখানে খানিকক্ষণ শুয়ে রইলাম। কে যেন পাঠিয়েছে ফুল আর বনবন। শুয়ে শুয়ে চুষতে লাগলাম।

আমার মতো সুখী কে? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী আমি। আমার শিল্প-সাধনা, আমার সফলতা, আমার ভাগ্য, আমার প্রেম—সবই আমি পেয়েছি—আর পেয়েছি দুটি অনুপম শিশু।

হাসছি, বনবন চুষছি। ভাবছি। এল্ আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেও

ফিরে এল। আমার সুখ তো এখন পরিপূর্ণ। এমন সময় এক অস্ফুট আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম।

দেখি, এল্ এসে দাঁড়িয়েছে। টলছে। সে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল।

তারপরে কানে ভেসে এল দুটি কথা—

ওরা আর নেই—নেই!

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মনে হ'ল জ্বলন্ত কয়লা বুঝি গিলে ফেলেছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এল্‌কে সান্ত্বনা দিলাম,

তুমি ভুল শুনেছ এল্, আমার ছেলে আর মেয়ে এখন ভার্সাঈ-এর বাড়িতে ঘুমে বিভোর।

কত লোক এল, সবার মুখেই বিষাদের ছাপ। একজন দাড়িওয়ালা লোক এসে বললে, না, না, ওরা মরেনি। আমি ডাক্তার, আমি ওদের বাঁচাব!

সে চলে গেল। সবাই কাঁদছে। আমার চোখে জল নেই। সবাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। মৃত্যু বলে তো কিছু নেই। ঐ যে দুইটি মোমের পুতুল হিম হয়ে গেছে, ওরা তো আমার সন্তান নয়। ওরা তো তাদের ছুঁড়ে-ফেলা পোষাক। ওদের আত্মা তো এখন জ্যোতির পুলিনে চলে গেছে, সেখানে অমর হয়ে আছে। কিন্তু তবুও আমার মাতৃত্ব মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠল! জন্ম আর মৃত্যুর সময় তো এমনি করেই কাঁদেন মা। কিন্তু একই কান্না কেন পায়? জন্ম তো পরম আনন্দ, আর মৃত্যু তো চরম দুঃখ? আমি তো জানি নে, শুধু জানি জন্ম আর মৃত্যু এক। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর্তনাদ কি একটি মাত্র নয়—আনন্দ আর দুঃখ কি এক নয়—সে কি সৃষ্টির আর্তনাদ নয়?

আমি বিদ্রোহিনী। বিবাহ বন্ধন স্বীকার করিনি, সন্তানদের ধর্মে দীক্ষা দিইনি। তাই তাদের খৃষ্টান মতে কবর দিতেও রাজী হলাম না। দুর্ঘটনায় তারা মারা গেছে, সেই সর্বনাশকে দিতে চাইলাম সুন্দরের রূপ। চারিদিকে সবাই কাঁদছে, কিন্তু চোখে জল নেই আমার। শোকের কালো পোষাক পরলাম না। রেমণ্ড, আগাষ্টিন, এলিজাবেথ ওরা বুঝল কি আমার ইচ্ছা। নানা রঙের ফুল দিয়ে ওরা সাজিয়ে দিল তাদের। তারপর নিয়ে চলল। তাদের দাহ করা হবে। ঐ যে মোমের পুতুল, শুধু থাকবে ওদের কয়েক মুঠো ছাই।

দাহ শেষে ফিরে এলাম স্টুডিয়োতে। কি নিয়ে এখন থাকব আমি? স্কুলের মেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরল। ওদের নিয়েই আমি বাঁচব, ওরাই আমার ছেলে-মেয়ে।

কিন্তু তবু দুঃখের দাহন সুরু হ'ল। দেহ শুকিয়ে গেল। শুধু এখন আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে প্রেম। কিন্তু এল্ তো সাড়া দিলে না।

এবার রেমণ্ড বলল, দুঃখ কি একা তোমার ইসাডোরা? আলবানিয়া থেকে আমি এসেছি। সেখানে মানুষের দুঃখ তো চরমে উঠেছে। চল, আলবানিয়ায় চল, দেখবে।

আলবানিয়ায় এলাম ওদের সঙ্গে। এক অদ্ভুত দেশ। শীত গ্রীষ্ম এখানে সমান। শুধু ঝড় আর বৃষ্টির দেশ। আর আছে অভাব। সে অভাব তুরস্কের আক্রমণে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত, উপসী মেয়েরা ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছে গাছতলায়।

আমি আর রেমণ্ড তাদেরই সেবায় লেগে গেলাম। কিন্তু এ সেবার জীবন তো আমার নয়, আমাকে ডাকছে শিল্পীর জীবন।

একদিন সেই ডাকে আমি ফিরে চললাম।

বাইশ

ঘুরতে ঘুরতে চলেছি। কনস্তান্তিনোপল হয়ে স্বইটজারল্যাণ্ড ঘুরে পারীতে এসে পৌঁছিলাম। স্টুডিয়োতে এসে সন্তর্পণে ঢুকলাম। তেমনি নীল পর্দা ঘিরে আছে। তেমনি আছে আমার সাজানো গোছানো গোপন মহল। খবর পাঠালাম হেনার স্কেনকে, সে ছুটে এল। আবার সেই স্বরধারা ঝরে পড়ল। এবার সত্যিই কেঁদে উঠলাম। সুখ-স্মৃতি মনে পড়ল। স্টুডিয়োতেই রাতদিন কাটাই। স্বর শুনি, ডিয়েড্রী ডাকে, মা-মণি! ডাকে আমার প্যাট্রিক। একদিন সেই অভিশপ্ত বাড়িতে গেলাম। ওদের খেলাঘরে ঢুকে দেখি, ছড়িয়ে আছে খেলনাগুলি।

কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লাম। ভার্সাই অসহ্য, পারীও অসহ্য হয়ে উঠল, ফ্রান্সও বুঝি অসহ্য!

রাতে ঘুম আসে না। নদীর গর্জন শুনি। ঐ নদীর বুকে আমার সব গেছে। দুঃখের সমুদ্র দুলে ওঠে। শেষে একদিন আর সইতে না পেরে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দক্ষিণে। ফ্রান্সের সীমানা মিলিয়ে গেল, এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

য়াল্পস পর্বতমালা পিছনে ফেলে, নেমে এলাম ইতালীর বুকে। ঘুরতে ঘুরতে চললাম। স্বপ্নমানা যেন আমি, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনো খেয়াল নেই। কখনো বা দেখি, ভেনিসের মদির রাতে গণ্ডোলায় ভেসে চলেছি। মাঝিকে বলছি, যেখানে খুশি নিয়ে চল। কখনো বা রিমনির পুরানো দিনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিজেকে বসে থাকতে দেখি, কখনো বা আবার সূর্যকরোজ্জ্বল ফ্লোরেন্সের পথে পথে ঘুরি। এই পথে ঘুরেছেন কবি দান্তে বিয়াত্রিচের সন্ধানে। বঙ্কিম, সংকীর্ণ পথে ঘুরে ঘুরে মরি। একদিন সির কথা মনে পড়ল। সে তো এখানে আছে। ভাবলাম, তাকে খবর দিই। আবার মনে পড়ল সে তো এখন বিবাহিত, কাজ নেই। আবার ফ্লোরেন্স ছেড়ে চললাম।

সমুদ্রের ধারে এক শহরে ঠাঁই নিয়েছি, এমন সময় এক তার এল। তারে লেখা—ইসাডোরা, তুমি ইতালীতে ঘুরে বেড়াচ্ছ জানি। চলে এস আমার কাছে, আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেব—এলিনোরা।

কি করে এলিনোরা আমাকে খুঁজে পেলেন জানি না।

তিনি তখন ভিয়েরাগিয়োয় এক বাড়ি নিয়ে আছেন।

আমি ভিয়েরাগিয়োয় ছুটলাম।

হোটেলে রাত কাটিয়ে ভোরেই ছুটলাম তাঁর কাছে। আঙুর বাগিচার মাঝখানে একখানা ছোট গোলাপী বাড়ি। আমাকে দেখেই আঙুরলতায় ঢাকা পথ বেয়ে ছুটে এলেন এলিনোরা। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য দুটি চোখ থেকে বাৎসল্যের ধারা ঝড়ে পড়ল।

ভিয়েরাগিয়োতেই থেকে গেলাম। এলিনোরা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি তো আর সবার মতো নয়। তারা চায় আমার সন্তানদের স্মৃতি ভুলিয়ে রাখতে, কিন্তু এলিনোরা তা চান না। বলেন,

তুমি আমাকে বল তোমার ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিকের কথা।

তাঁকে বলি ওদের কথা। তুচ্ছ ঘটনা একটার পর একটা গেঁথে দিই, ফোটো এনে দেখাই। বলি, দেখুন, কেমন ছিল ওরা!

এলিনোরা দেখেন, চুমু খান, কাঁদেন। কখনো বলেন না, কেঁদো না! এতদিন তো একা কেটেছে, মনে হয়, এবার পেয়েছি যোগ্য সাথী—আমার দুঃখের সাথী।

মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বার হন। পাহাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন, দেখ, দেখ, কি রুক্ষতা গায়ে মেখে, কি ঔদ্ধত্যেই না ও উঠে গেছে! ওকে দেখে তো মনে পড়ে না, সমতলভূমির আঙুর লতা আর ফুলের কথা। কিন্তু ওরই চূড়ার দিকে তাকাও, সেখানে শ্বেত মর্মরের ঝলক দেখতে পাবে। ঐ মর্মর পাথরকে অমর রূপ দেবেন কোন ভাস্কর, তারই অপেক্ষায় পড়ে আছে। আর তোমার আঙুর বাগিচা আর ফুল তো অমরতা দিতে পারে না, শুধু দৈনন্দিন অভাব মেটায়। আর ও জোগায় তার স্বপ্ন। শিল্পীর জীবন তো ওরই মতো—কালো, রুক্ষ, কিন্তু তারও আছে মর্মর ঝলক—সে তো মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়।

শেলার কবিতা ভালবাসেন এলিনোরা। সেপ্টেম্বরের শেষে সমুদ্র যখন ঝটিকায় উত্তাল হয়ে উঠে, আমাকে টেনে নিয়ে যান সাগরের ধারে। ঢেউয়ের উপর যখন বিজলি ঝলক ঝিকমিকিয়ে ওঠে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন,

দেখ, দেখ—ঐ যে শেলীর আত্মা—ঐ তো তরঙ্গের উপর দিয়ে চলেছেন!

নামের বিপদ আছে। হোটেলে যেই আসে, তাকিয়ে থাকে, গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়। অতিষ্ঠ হয়ে হোটেল ছেড়ে দিলাম। ভাড়া নিলাম এক

বাড়ি। মস্ত বাড়ি, লাল রঙ, চারিদিকে পাইন বন দিয়ে ঘেরা—তারপরে আছে উঁচু দেয়াল। বিষণ্নতা যেন বাড়ির ভিতরে-বাইরে থম্‌থম্‌ করে। শুনলাম, এক সম্ভ্রান্ত মহিলা এটি তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে সুখে বসবাস করতে পারেন নি। তাঁর একমাত্র ছেলে পাগল হয়ে যায়। বাড়ির চিলেকোঠা লোহার জালে ঘেরা। সেইখানেই সে থাকত। একদিন চিলেকোঠায় গিয়ে দেখলাম, দেয়ালে অদ্ভুত সব ছবি আঁকা। উন্মাদ মনের অভিব্যক্তি সে-সব ছবি।

বাড়িটি আমার ভালই লাগল। এলিনোরাকে এখানে থাকবার নিমন্ত্রণ করলাম। কিন্তু ভুতুরে বাড়িতে তিনি থাকতে রাজী হলেন না। তাঁর নিজের বাড়িতেই রইলেন। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেতাম তাঁর চিঠি। দিনে অমন চার-পাঁচখানা চিঠি আসতো। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু ভারি সুন্দর। বিকেলে নিজেই এসে দেখা দিতেন, আমরা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম।

এলিনোরাকে একদিন হেসে বললাম, রোজ এমন সুন্দর-সুন্দর চিঠি লেখেন, অথচ দূরে গেলে একেবারে ভুলে যান।

এলিনোরা হেসে বললেন, দূরের বন্ধুকে চিঠি লিখতে ভাল লাগে না, তাই কখনো-সখনো তার পাঠাই ; কিন্তু কাছের বন্ধুকে নিজের রোজকার খুঁটিনাটিটুকুও জানাতে ইচ্ছে করে।

বিকেলে সাগরের ধারে ঘুরতে ঘুরতে কত কথা হয়। আবার কখনো বা একেবারে চুপ করে যান। আমার দিকে তাঁর আশ্চর্য দুটি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন। একদিন অমনি বেড়াচ্ছি। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন,

ইসাডোরা, তুমি সুখ চেয়ো না। তোমার ঐ ভ্রূতে দুঃখের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। তোমার জীবনে দুঃখের এই তো শুরু। ভাগ্যকে আর সুখের ছলনা দিয়ে ভোলাতে চেয়ো না!

আমি চমকে উঠলাম। হায় এলিনোরা, তোমার সতর্কবাণী সেদিন যদি শুনতাম! কিন্তু আশার চারা গাছকে তো ধ্বংস করা করা যায় না, যতই ডালপালা ছেঁটে দাও, যতই তাকে ধ্বংস করতে চাও, ততই তার নতুন ডালপালা গজিয়ে উঠবে।

এলিনোরাকে আমি যেন আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। সমুদ্রের ধারে গোধূলির ম্লান আলোয় লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছেন। তাঁর পদক্ষেপে বেজে উঠছে এক অপূর্ব বিষাদের সুর। তিনি তখন বর্ষিয়সী, কিন্তু তরুণীর লাবণ্য তখনো তাঁর

দেহ থেকে অস্তমিত হয়নি। আবার পরিণত ফলের মহিমা তাঁকে ঘিরে আছে। তাঁকে দেখে মনে হোত, তাঁর আত্মা বেদনায় আর্ত। তাই তো তিনি আমাকে পড়ে শোনাতেন বিয়োগান্ত নাটক থেকে। তাঁর আবৃত্তিতে নাটকের অন্তর্নিহিত সুর ধরা পড়ত। হায় এলিনোরা, য়ুরোপ শুধু তোমাকে চিনলে, কিন্তু পৃথিবীকে তুমি তো দেখাতে পারলে না তোমার প্রতিভা! শিল্পকলা ছিল তোমার কাছে একমাত্র সত্য, কিন্তু সেই সত্যকে ফুটিয়ে তোলা তো হ'ল না। কেউ বলেন, এলিনোরা বুড়ো বয়সে প্রেমে পড়ে নিজের শিল্পী-জীবনে ছেদ টেনে দিলেন। কিন্তু সে তো মিথ্যে কথা। তাঁর শিল্পী জীবনে ছেদ পড়লো তাঁর দারিদ্র্যে। ইতালীর এক অখ্যাত, অজ্ঞাত কোণে এলিনোরার শেষ জীবন অতিবাহিত হ'ল।

একদিন হেনার স্কেন এল। সুরের বন্যা বয়ে গেল। এলিনোরা যখন-তখন ছুটে-ছুটে আসেন। স্কেন বাজায়, শোনেন, মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে গেয়ে ওঠেন। একদিন স্কেন বাজাচ্ছিল, এলিনোরা গাইছিলেন সুরে সুর মিলিয়ে। বেঠোফেনের সোনাটা পাথেটিক ঘরে ব্যথার মেঘ ঘনিয়ে তুলেছে। আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না, বললাম,

আমি নাচব।

ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিক, ওদের বিদায় দেবার পর আর নাচিনি, এবার দেহে ব্যাথার সমুদ্র উত্তাল হয়ে ছন্দ জাগাল। নাচতে লাগলাম তালে তালে। স্তব্ধ হ'ল সুর, শেষ হ'ল নাচ। সুর তখনো ঘুরে ঘুরে মরছে শরাহত পাখীর মতো, আকুলি বিকুলি করছে। দেহের ব্যথার সমুদ্র স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ। এলিনোরা উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

ইসাডোরা, এখানে বসে কি করছ? ফিরে যাও, ফিরে যাও! নৃত্যেই তো তোমার মুক্তি!

তিনি জানতেন আমার সঙ্গে চুক্তি করতে চান এক ইম্প্রেসারিয়ো দক্ষিণ আমেরিকার জন্যে। বললেন, চলে যাও, এমনি করে দিন কাটিয়ো না! একঘেয়েমি তোমাকে ছেয়ে ফেলবে, তোমার মৃত্যু হবে। দেখ না, আমি মৃত্যুর পথে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছি।

বললাম, পারব না!

আমার দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ব্যথা, আমার বুক কুরে খাচ্ছে। আমার

ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিক, তাদের জন্য কান্না গলে গলে পড়ছে। রাতে নির্জন, নিঃসঙ্গ বাড়িতে যখন থাকি, মনে হয় শূন্য ঘরে কারা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেই দীর্ঘশ্বাস আমাকে ঘিরে ধরে, ঘুমতে দেয় না। ভোরের জন্য বসে থাকি। তারপর ভোর না হতেই ছুটে যাই, সমুদ্রের ধারে। ঝাঁপিয়ে পড়ি জলে! মনে হয়, ভেসে যাই ঢেউয়ের সঙ্গে, তারপর অতল সমাধি হোক আমার। ঢেউয়ের কোলে নিজেকে সঁপে দিই, ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আবার বালির উপর এনে আছড়ে ফেলে। জীবন এখনো তারুণ্যে ভরা, তারুণ্যের প্রতি সম্মান দেখায় তরঙ্গ—তাই আমার অর্ঘ্য সে বারবার ফিরিয়ে দেয়।

হেমন্তের ধূসর সন্ধ্যায় সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলাম। আজ আর সঙ্গে এলিনোরা নেই। বালির উপর দিয়ে চলেছি তো চলেছি। নিজের ভাবনায় ডুবে আছি। হঠাৎ দেখি, আমার সামনে কারা চলেছে। কারা? দুটি ছেলে আর মেয়ে। ওদের চলাব ধরণ আমার চেনা। কাছে এগিয়ে গেলাম। এযে আমার ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিক! হাত ধরা-ধরি করে বালির উপর নাচতে-নাচতে চলেছে। ওদের ডাকলাম,

ওরে ডিয়েড্রী, ওরে প্যাট্রিক, থাম্, থাম্—অমন করে ছুটিস নে!

ওরা হেসে উঠল, পেছন ফিরে তাকালে, কিন্তু থামল না।

আমি ছুটে ওদের ধরতে গেলাম। ওরা ছুটতে লাগল। আমিও ছুটলাম পিছু পিছু। সমুদ্র গর্জন করছে, তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফেনার ফণা। যখনই ফণা তুলে ধেয়ে আসছে, ভেঙে পড়ছে, জলকণা এসে লাগছে গায়ে। ওরা সেই ঢেউয়ের ভিতরে মিশে গেল। আমিও নেমে এলাম। আমার হাঁটু ঘিরে তরঙ্গ ফণা বিস্তার করে ঘিরে ধরল। হঠাৎ মনে হ'ল, আমি কি পাগল হয়ে গেছি। আর্দ্রবসনে উঠে এলাম। পাগল—পাগল আমি! চোখের সুমুখে ভেসে উঠল—পাগলা গারদ—তার দুঃসহ জীবনধারা। আমি লুটিয়ে পড়লাম বালুবেলায়, কাঁদতে লাগলাম।

কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে সেই, হঠাৎ কার স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি, এক তরুণ-দেবতা সাগর থেকে উঠে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছেন।

দেবতা বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে? আমি কি তোমার ব্যথা একটু লাঘব করে দিতে পারি না?

মুখ তুলে তাকালাম!

ওর চোখে দেখলাম অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র—নবজীবনের দ্যুতি। বললাম,

হাঁ, পার! আমাকে বাঁচাও—আমার জীবন, আমার জ্ঞান আমাকে ফিরে দাও—আমাকে সন্তান দাও দেবতা!

দেবতা আমার হাত দুটি ধরলেন, মুখে তাঁর হাসি।

আমরা দুজনে বাড়ি ফিরে গিয়ে বসলাম ছাদে। সূর্য অস্ত গেছে সমুদ্রের পরপারে, চাঁদ উঠছে। পর্বতের মর্মর পাথরে তার আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা দুজনে চেয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ ও আমাকে ওর যৌবনভরা বাহুপাশে ঘিরে ধরল, আমার ঠোঁটের উপর রাখল ওঁর ঠোঁট। ইতালীর রাত্রি কামনায় ভরা, সেই রাত্রির কামনা যেন আমার দেহে নেমে এল, আমাকে ছেয়ে ফেলল। আমার তরুণ দেবতা আমার দেহে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দুঃখ ভুলে গেলাম, মৃত্যু ভুলে গেলাম—আমার প্রেম ফিরে পেলাম, জীবনকে ফিরে পেলাম।

ভোর না হতেই ছুটে গেলাম এলিনোরার কাছে। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন দেখছেন।

তাঁকে বললাম, আমার দুঃখ ভুলে গেছি, আঁধার সাগর পার হয়ে আলোর তীরে এসে পৌচেছি। তারপরে বলে গেলাম সব কথা। তিনি অবাক হলেন না।

বললেন, জানি তো, মৃত্যু জীবনকে ধরে রাখতে পারবে না। চল, চল, তার কাছে যাই!

তাঁকে নিয়ে গেলাম আমার তরুণ দেবতার কাছে। সে ভাস্কর। তিনি তার কাজ দেখলেন ঘুরে ঘুরে, তারপর বললেন,

ওকে কি তোমার প্রতিভাধর বলে মনে হয় ইসাডোরা?

নিশ্চয়ই, উত্তর দিলাম। দেখবেন, ও কালে হবে মিকায়েল এঞ্জেলোর মত শিল্পী।

এলিনোরা চুপ করে রইলেন।

যৌবন—যৌবন! যৌবন বিশ্বাস এনে দেয় বুকে, আমারও তাই বিশ্বাস হ'ল, প্রেম এবার দুঃখকে জয় করবে। আবার আশা হ'ল। কি আশা? স্বপ্ন দেখলাম, ওরা আসছে, ধীরে ধীরে ওরা আসছে আমার গর্ভের আঁধারে। ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিক আবার ফিরে আসছে আমার কাছে। কিন্তু হায়, স্বপ্ন তো চিরস্থায়ী হয় না!

আমার প্রেমিক গোঁড়া পরিবারের সন্তান। একটি মেয়ের সঙ্গে বাগ্‌দত্ত। আমাকে একথা সে আগে জানায় নি। একদিন এক দীর্ঘ চিঠি লিখে

জানিয়ে দিলে। আমি তো জ্বলে উঠলাম না, ছুটে গিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া করলাম না। শুধু মনে মনে বললাম, বিদায়, প্রেমিক বিদায়! তোমাকে আমার মনে থাকবে। আমি পাগল হতে বসেছিলাম, তুমি আমাকে সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছ। আর—আর আমি জানি—আমি আর একা নই। আমার ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিকের আত্মা আমার কাছে আসছে—ওরা আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসছে।

হেমন্ত এসে গেল। স্তব্ধ সাগর আর মনে দোলা দেয় না, দেয় না কুয়াশাময় দিন।

তাই চলে এলাম রোমে। সঙ্গে আমার বন্ধু হেনার স্কেন। ঘুরে ঘুরে বেড়াই দুজনে। ভোরবেলা উঠে চলে যাই দূরে দূরে। জিনিষ বোঝাই ঠেলা গাড়ি চলেছে বাজারের দিকে। চালকদের সদ্য ঘুম ভাঙা মুখ। দেখতে-দেখতে চলে যাই—রোমের অতীতের মর্মর পথে। সেখানে দুই অশরিরী আত্মার মতো ঘুরে বেড়াই! কখনো বা আকাশের দিকে দুজনে তাকিয়ে থাকি। ভগ্নস্তূপ যেন মিলিয়ে যায়, সেখানে দেখা দেয় অভ্রভেদী মিনার। দেহে ছন্দ জাগে, সেই অতীতের গরিমাময় রোমের মন্দিরে মন্দিরে আমি নেচে বেড়াই।

রাতেও আমাদের পরিক্রমা চলে। ঘুরতে ঘুরতে পথের পাশে ঝরণার ধারে বসি। ঝরণার শব্দ শুনি, মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে ধারা। চোখে জল চিক চিক করে ওঠে, নিঃশব্দে কাঁদি। স্কেন আমার হাত দু'খানা নিজের হাতে তুলে নেয়।

একদিন জেগে উঠলাম। এল্-এর কাছ থেকে এল তার। পারী রওনা হলাম।

এল্ ক্রিলোঁ হোটেলে কয়েকটা কামরা ভাড়া করে রেখেছে। সেখানে এসেই উঠলাম। ফুলে ফুলে ঘর ভরে গেছে। সেই ফুলের মধ্যে বসে এল্‌কে বললাম,

জান এল্, আমি স্বপ্ন দেখেছি, ওরা আসছে।

কারা? এল্ চোখ তুলে তাকাল।

কারা আবার? আমার ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিক। জন্মে জন্মে আবার ফিরে আসে আত্মা, আবার তার আবির্ভাব হয়।

এল্ হাতে মুখ ঢাকল।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে তাকাল। দেখি চোখে তার জল। বললে,

তোমার সঙ্গে ১৯০৮ সালে আমার দেখা হয়, কিন্তু আমাদের ভালবাসা তো জীবনে মৃত্যুর অন্ধকার নিয়ে এল। পৃথিবীতে সুখ নেই, একথা আজ বুঝেছি। তুমি তোমার স্কুল গড়ে তোল ইসাডোরা, অন্তত পৃথিবীর দুঃখের ভার সৌন্দর্য দিয়ে কিছুটা লাঘব কর!

ও বললে, পারীর কাছে এক হোটেল কিনেছে, সেখানে আছে হাজার ছেলে-মেয়ের থাকার জায়গা, আছে বাগান। এখন আমার উপর সব নির্ভর করছে।

আমি চুপচাপ।

ও আবার বললে, তোমার ব্যক্তিগত অনুভূতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোমার আদর্শকে রূপ দাও ইসাডোরা!

বললাম, ওরা যে আসছে, আমার মন যে সেই অলোকেব সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেছে। ওদের আমি দেখতে পাই। ওদের কথা শুনি আমার এ স্বপ্ন তুমি ভেঙে দিয়ো না প্রেমিক!

এল্ বললে, স্বপ্ন তো বাস্তব নয়! তোমার আদর্শ কি এমনি করে তুমি পায়ের তলায় পিষে দেবে?

না, না, আমার দুঃখে, আমার জীবনের অন্ধকারে, সেই তো আমার একমাত্র আলো। আমি স্কুল গড়ে তুলব!

পরদিন সকাল থেকেই স্কুলের তোড়জোড় চলল। জার্মানীর ছাত্রীরা তো আছেই, এখানে আরো পঞ্চাশ জনকে ভর্তি করে নেওয়া হবে এই ঠিক হ'ল।

স্কুল বসে গেল। চারিদিকে জীবনের স্পন্দন, কলরোল। হোটেলের ভোজনাগার এখন নৃত্যশালা। সেখানে আমি নাচছি, শেখাচ্ছি নাচ। প্রতি শনিবারে আসেন বিখ্যাত শিল্পীরা। সেদিন বাগানে বসে আসর। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান, আবৃত্তি আর নাচ হয়। রোঁদা আসেন। এসেই মেয়েদের ছবি আঁকতে বসে যান। বলেন,

আহা, আমার যৌবনে যদি এমন মডেল পেতাম ইসাডোরা! ওদের মধ্যে আমি গতি দেখতে পাচ্ছি। আর এ-গতি তো কৃত্রিম নয়, প্রকৃতির দান। তাই তার সঙ্গে আছে সঙ্গতি। বহু সুন্দরী আমার মডেল হয়েছেন,

কিন্তু গতির বিজ্ঞান তো তাঁরা বুঝতে পারেন নি। তোমার এই ছাত্রীরা তা বোঝে।

ছাত্রীদের জন্য কিনে আনি নানা রঙের পোষাক। ওরা স্কুলের পরে সেই পোষাক পরে বাগানে ছুটে বেড়ায়। ওদের দেখে তখন মনে হয় বিচিত্র রঙের এক ঝাঁক পাখী।

আমার স্বপ্ন দুলে দুলে ওঠে। এইবার তাহলে আমার নৃত্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল, এইখানেই সাধনায় আমার জীবন কেটে যাবে। আর কোথাও ছুটব না।

তেইশ

আনন্দের কলধ্বনির ভিতরে শুরু হয় আমাদের দিন। বারান্দায় চঞ্চল পদের সাড়া জাগে, গানের কলি ভেসে আসে। আমি এবার নেমে আসি সিঁড়ি বেয়ে। নৃত্যশালায় ওরা এসে জমায়েত হয়। আমাকে দেখেই বলে,

ভোরটি আপনার শুভ হোক, সুন্দর হোক!

কে বিষাদে ডুবে থাকতে পারে তারপর? তবু আমার মন তো ব্যথায় ভরা—ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি, খুঁজি আমার ডিয়েড্রাকে। আমার প্যাট্রিককে। কখনো বা ছুটে যাই আমার ঘরে, দোর বন্ধ করে কাঁদি। তবু আদর্শ বড় হয়ে উঠে জীবনের থেকে—ওদের শেখাই আত্মায় যে ছন্দ জাগে, তারই অভিব্যক্তি দেহে ফুটিয়ে তুলতে। ওদের সুন্দর গতিভঙ্গী আমাকে বাঁচার খোরাক জোগায়।

স্বপ্ন দেখি।

কি স্বপ্ন?

হাজার হাজার বছর আগে রোম গড়েছিল তার মন্দিরের দেবদাসীদের নৃত্য প্রতিষ্ঠান। অভিজাত বংশের মেয়েরা ছিল সেখানকার ছাত্রী। উৎসবের সময় তারা নেমে আসত পাহাড়ের উপরের নৃত্য-মন্দির থেকে। তারা মানুষকে দিত আনন্দ, রুগ্ন আত্মায় জোগাত শক্তি। আমার সেই তো স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে রূপ দিতে বসলাম।

এল্ একদিন এসে বললে, এবার তাহলে থিয়েটার আবার গড়ে তুলি!

শিউরিয়ে উঠলাম। আমার প্যাট্রিকের কথা মনে পড়ল। একদিন স্বপ্ন দেখতাম, প্যাট্রিক হবে বিখ্যাত সুরকার—ওরই নামে হবে থিয়েটারের নাম। কিন্তু সে আশা তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

এল্ বললে, তুমি অনুমতি দাও!

অনুমতি দিতে হ'ল। ইঞ্জিনিয়ারেরা আসতে লাগলেন। আবার পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হ'ল। আমার স্বপ্ন আবার ফিরে এল! এখানে আমি বিশ্বের গুণীজনকে এনে প্রতিষ্ঠা করব। কে-কে আসবেন? আসবেন এলিনোরা, আসবেন

মনে স্থলী, গ্রীক নাট্যকার সোফাক্লিস্, ইউরিপিদাস আবার মূর্ত হয়ে উঠবেন। আমার ছাত্রীদের ঐক্যতান সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠবে রঙ্গালয়। তাই তো বিষণ্নমন হঠাৎ অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল।

রোজ ওদের নাচ শেখাই, শেখাতে শেখাতে ক্লান্ত হয়ে কাউচে ঢলে পড়ি। তখন শুধু ইঙ্গিতে শেখাই। ওরা আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারে। আমি তো ওদের শেখাইনে, ওদের গতির পথ দেখিয়ে দিই—ওরা নৃত্যের বন্যায় ভেসে যায়।

থিয়েটার উঠছে এদিকে, তার মিনার আকাশ ছোঁবে এবার। আমরা প্রথম ইউরিপিদাসের নাটক দিয়েই শুরু করব। কবি দান্নাৎসিয়ো এ বিষয়ে উৎসাহী। রোজ আসেন, অভিনয় নিয়ে নানা কথা হয়।

এদিকে স্কুলের মেয়েরাও আর ছোট নেই, তারা এখন তরুণী। তারুণ্যের ঢল নেমেছে দেহে, গতিভঙ্গীতে এসেছে এক অপূর্ব চঞ্চলতা! দেখে মন খুশিতে ভরে ওঠে।

এমন সময় এল এক অশুভ ছায়া ঘনিয়ে। নিজে অনুভব করলাম, ছাত্রীরা অনুভব করলে। ছাদের উপর ওদের নিয়ে যখন উঠি, চুপ করে তাকিয়ে থাকি। ওরাও নিঃশব্দে বসে থাকে। ঘন মেঘে ভরে গেছে পারীর আকাশ। এক অশুভ নিস্তব্ধতা দুলে উঠছে। কেন যেন মনে হয়, আত্মার ছন্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে, সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।

এল্ এসে একদিন ছাত্রীদের নিয়ে গেল ইংলণ্ডে, ডেভনশায়ারে। ওরা আগস্ট মাসটা ওখানে কাটাবে, ফিরবে সেপ্টেম্বরে। এখন তো একা আমি, ক্লান্তি নেমে এল। বহুক্ষণ ছাদে বসে থাকি, নিচে জনতামুখর পারীর দিকে তাকিয়ে থাকি। কেন যেন মনে হয়, ঝড় উঠবে। উঠবে।

একদিন শুনলাম আমার বন্ধু, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ক্যালমেত-এর হত্যার সংবাদ। আঘাত পেলাম।

এবার ঘটনা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। একদিন আমার এক ডাক্তার বন্ধু সকালে এসে হাজির। হাতে তার একখানা খবরের কাগজ। তারই শিরোনামায় বড় বড় হরফে সেরাজেভোর আর্কডিউকের হত্যার সংবাদ। তিনি পড়ে শোনালেন খবর, চলে গেলেন। ছাদে উঠে সেদিন মনে হ'ল, মেঘ যেন আরো ঘন। এবার বুঝি বয়ে যাবে ঝড়।

গুজব, হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে গুজব। তারপরে গুজব একদিন থিতিয়ে গেল।

এবার সুনিশ্চিত মহাসমর। মন কেন কু-ডাক ডেকেছিল, বুঝতে পারলাম। আমি যখন মানবতার মুক্তির জন্য নৃত্যের পরিকল্পনা করছি, তখন সয়তান মানবতাকে ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর সে যখন এসে হাজির হ'ল, আমার মানবতার স্বপ্ন তো মিলিয়ে গেল।

দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে পৃথিবীর উপর। যুদ্ধবাজ শক্তিগুলি উন্মত্ত হয়ে উঠেছে হিংসার তাণ্ডবে। চারিদিকে মৃত্যুর সাড়া। এমন সময় গর্ভে আমার নড়ে উঠল সন্তান! জানালায় বসে অনাগত সন্তানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাই, এমন সময় স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে যায় খবরের কাগজের হকারের হাক-ডাক। সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে দামামা বাজিয়ে চলে যায়। আমার সৃষ্টির স্বপ্ন খান্‌খান্‌ হয়ে যায়।

মেরী এক দোলনা নিয়ে এল। আমার ঘরে খাটিয়ে দিলে। দোলনার চারিদিকে সাদা মসলিন দিয়ে ঢাকা। ঐ দোলনার দিকে চেয়ে থাকি, মনে হয় ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিক ওখানে শুয়ে আছে। ছুটে মসলিনের মশারি তুলতে যাই-- অমনি বেজে ওঠে পথে দামামা।

যুদ্ধ এল।

কিন্তু সন্তান যে আসছে! ও আসছে দুঃখের দুনিয়ায়। আমার পুরানো ডাক্তার-বন্ধু চলে গেছেন যুদ্ধে, এক নতুন ডাক্তার এলেন। তিনি এসে বললেন, আপনি সাহস হারাবেন না! ও-কথা না বলে ডাক্তার কি বলতে পারতেন না, জন্ম তো মহান। ইসাডোরা, তুমি তোমার দুঃখ ভুলে যাও! ভুলে যাও সব কিছু। কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্রে ও কথা তো লেখে না। সেখানে বাঁধি গৎ আছে, স্বপ্ন নেই। তাই দিন কেটে যায়, অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করে উঠি। আবার ভাবি, আমার সন্তান হবে ছেলে—যুদ্ধের মধ্যে ওর জন্ম হবে। কিন্তু যুদ্ধে ওকে আহুতি দিতে হবে না।

...সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল, কেঁদে উঠল। আমার সব দুঃখ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলে গেলাম।

কিন্তু তবু তো দামামা নির্ঘোষ শুনি। বলে, সৈন্যদলে ভর্তি হও, যমের খাদ্য জোগাও!

আপন মনে শুধাই, সত্যিই কি যুদ্ধ হচ্ছে? কিন্তু আমার কি? আমার সন্তান তো আমার কোলে। ওরা যুদ্ধ করুক, মরুক—আমার কি?

মানুষ কি স্বার্থপর! আমার জানালার নিচে সন্তানহারা মার আর্তনাদ বয়ে

যায়, পতিহারা পত্নীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঘূর্ণি ওঠে—আর আমি? সন্তানকে বুকে চেপে ধরে চুমু খাই—হাসি।

সন্ধ্যায় আসেন বন্ধুজন। তাঁরা এসে ছেলেকে কোলে নেন, বলেন, এবার তো তুমি সুখী হ'লে ইসাডোরা।

ওঁরা একে একে চলে যান, আবার আমি একা, আমার বুকে আমার খোকা। তার কানে ফিসফিসিয়ে বলি—তোকে তো চিনতে পারিনে খোকা! তুই কি আমার ডিয়েড্রী, না, আমার প্যাট্রিক? কে এলি?

খোকা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আয়ত চোখ মেলে, তারপর কেঁদে ওঠে। ওর নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে যায়। দাই ছুটে আসে, আমার কোল থেকে ওকে ছিনিয়ে নেয়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি—মুখে উদ্বেগের ছোপ।

ডাক্তার আসে, ওষুধপত্র আসে। অক্সিজেন, গরম জল চাই—সোরগোল শুরু হয়ে যায়। স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। কি হ'ল আমার সদ্যজাত সন্তানের? কি হ'ল আমার খোকার? তবু পাশের ঘরে ছুটে যেতে মন চায় না। অগাস্টিন এসে ডাকে,

ইসাডোরা, ইসাডোরা!

চোখ মেলে তাকাই।

একটু থেমে বলে, খোকা আর নেই।

মৃত্যুর মিছিল চলেছে সীমান্তে, মৃত্যুর নিঃশ্বাস ঝরছে আশেপাশে—আমার ঘরে যেন সেই মিছিল ছুটে এল। নিঃশ্বাস ঝরছে চারিদিকে। আমার খোকা সেই হিংসার তাণ্ডবেরই এক বলি।

মেরী কাঁদতে কাঁদতে এসে দোলনাটা খুলে নিয়ে যায়। পাশের ঘরে শুনি হাতুড়ির শব্দ। শবাধার তৈরী হচ্ছে। আমার বুকে ঘা হানে সে-শব্দ। এলিয়ে পড়ে থাকি—চোখের জল ঝরে, বুকের দুধ ঝরে, আমার রক্ত ঝরে ঝরে পড়ে।

বন্ধুরা সান্ত্বনা দিতে আসেন, বলেন, এখন কি ব্যক্তিগত দুঃখের সময় ইসাডোরা। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিচ্ছে সীমান্তে—হতাহতে বোঝাই গাড়ি ফিরে আসছে। তুমি তোমার স্কুলটা ছেড়ে দাও, এখানে হাসপাতাল বসুক।

শুনে যাই, কিন্তু প্রাণ তো সাড়া দেয় না। অথচ সবার মনে যুদ্ধের উদ্দীপনা! এ উদ্দীপনা তো সৃষ্টি করবে না, মাইলের পর মাইল জুড়ে রেখে যাবে শুধু ধ্বংস, রেখে যাবে সমাধির সার। রোমাঁ র‍্যলাঁ শান্তিবাদী, তিনি বসে আছেন

সুইটজারল্যাণ্ডে। তাঁর উপরে বর্ষিত হচ্ছে যুদ্ধমান পৃথিবীর অভিশাপ। কিন্তু আমি তো তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। তিনি শান্তির দূতরূপে নেমে এসেছেন। অশান্ত পৃথিবীকে তিনি শোনাচ্ছেন শান্তির বাণী।

কিন্তু তবু যুদ্ধের স্রোতে আমিও ভেসে গেলাম, আমার প্রতিষ্ঠানের বাড়িটি ছেড়ে দিলাম। হাসপাতাল বসল। আমি রইলাম, এক প্রান্তের একখানি ঘরে।

একদিন দেখতে গেলাম হাসপাতাল। উঠে দাঁড়াতে পারি না, এতই দুর্বল। ওরা চেয়ারে করে আমাকে ঘোরাতে লাগল। হায়, আমার স্কুলের কি দশা! যেখানে ছিল গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শন, সেখানে এখন সারি সারি খাট পাতা, দেয়ালে অসীম শূন্যতা, শুধু মাঝে মাঝে দু-একখানা ক্রুশ ঝুলছে। আমার নৃত্যশালার সেই নীল যবনিকা আর নেই। সেখানে এখন শুভ্র পর্দার সমারোহ। আমার লাইব্রেরী এখন অস্ত্রচিকিৎসার ঘর। ডায়ানোসিয়াস এখন পরাজিত, এখন ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের রাজত্ব।

বার্ণার্ড শ বলেন, যতদিন মানুষ পশু-বধ করবে, তাদের মাংস খাবে, ততদিন থাকবে এই সর্বনাশা যুদ্ধ। আমারও ঐ এক মত। হাসপাতালে আহতের আর্তনাদ শুনে মনে হয়, ওরা কষাইখানার পশু কে ভালবাসে এই সর্বনাশা যুদ্ধ? কে?

কষাইখানায় কষাই রক্তপাত আর হত্যায় মানুষকে প্রলুব্ধ করে। পশু হত্যা থেকে মানুষের হত্যা তো এক ধাপ মাত্র ব্যবধান। একটা বাছুরের গলা কেটে ফেলা থেকে নিজের ভাইয়ের গলা কেটে ফেলা তো পশুত্বের একটি ধাপ এগুনো। তাই ভাবি, এ পৃথিবীতে কি শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে?

সুস্থ হয়ে উঠলাম। মেরীর সঙ্গে ছুটলাম যুদ্ধ-সীমান্তে। অব্যাহত আমার গতি। যেখানে যাই, শুধু নাম বলি। অমনি মুক্ত হয়ে যায় আমার পথ। কিন্তু হিংসার এ তাণ্ডব দেখে মন বিষিয়ে যায়। শেষে ডভিল-এর এক হোটেলে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'লাম। যুদ্ধ-সীমান্ত কাছেই। রোজ খবর আসে। জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে।

এরই মধ্যে এল হেমন্ত, এল তুষার-ঝড়। এল্ লিখলে, আমার স্কুল পারীতে না ফিরে আমেরিকায় চলে যাবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাহোক, যুদ্ধের করালগ্রাস থেকে ওরা তো বাঁচল।

কিন্তু জীবনে তো স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। কাছেই বসেছে হাসপাতাল। একদিন দেখতে গেলাম। ডাক্তারটির সঙ্গেও পরিচয় হ'ল। বেঁটে মানুষটি, মুখে কালো দাড়ি। আমাকে দেখে সে যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম,

আপনাকে ক'বার আমি ডেকে পাঠিয়েছি, এলেন না কেন?

ডাক্তার আরো অপ্রতিভ হয়ে গেল। কথা দিলে, কাল ভোরে দেখা করবে।

ভোরেই শুরু হয়ে গেল ঝড়: সমুদ্র উত্তাল, মুষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ডাক্তার এল।

ডাক্তার এসে আমার নাড়ি দেখলে, মামুলি প্রশ্ন করলে। ওকে বললাম, আমার সন্তানের কথা—সে তো বাঁচল না। ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ ও আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, ইসাডোরা, তোমার দেহে তো কোনো অসুখ নেই, অসুখ তোমার মনে—তুমি ভালবাসার জন্য উন্মাদ। তোমার এরোগ একমাত্র ভালবাসাই আরাম করতে পারে।

একা আমি, ওর কথা শুনে, যেন কৃতজ্ঞতায় গলে গেলাম। ওর চোখের দিকে তাকালাম, আমার হারানো ভালবাসা খুঁজে পেলাম। আহত দেহ আর আত্মা যেন চিৎকার করে উঠল আনন্দে।

হাসপাতালের কাজ সেরে ও এখন রোজই আসে ।মার কাছে। বলে আহতদের কথা, মৃতদের কথা।

ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে হাসপাতালে যাই। নিষ্প্রদীপ রাত। অন্ধকারে শুয়ে গোঙায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহত মানুষ। ও তাদের কাছে এগিয়ে যায়, সান্ত্বনা দেয়। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। দিবারাত্র এই ওর কর্তব্য। তাই তো ওর হৃদয় হাহাকার করে ওঠে ভালবাসার কামনায়। আবার সে কামনা উদ্বেল হয়ে ওঠে আলিঙ্গনে, আমার দেহের উন্মাদ পুলক তার সঙ্গে মিশে যায়। আমি এমনি করেই সেরে উঠলাম।

একদিন ওকে বললাম, যখন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তুমি আসনি কেন ডাক্তার?

ও চুপ করে রইল।

আমার কৌতূহল জেগেছে। তার তো নিবৃত্তি চাই। কিন্তু ও কিছুতেই উত্তর দেবে না।

শেষে একদিন বললে, সেকথা শুনলে তো আসবে বিচ্ছেদ। ওকথা শুনতে চেয়ো না ইসাডোরা!

আমি চুপ করে যাই। আকাশ-পাতাল ভাবি। কি এমন কথা?

সেদিন অনেক রাতে জেগে উঠে দেখি, ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে হতাশা। সে-হতাশা তো অসহনীয়।

ওকে বললাম, বল কি সে ভীষণ কথা—যার রহস্য তুমি বুকে ধরে আছ ডাক্তার—যা তোমার চোখে জাগিয়ে তুলেছে হতাশা? বল, বল!

ও আমাব কাছ থেকে কয়েক পা দূরে সরে গেল। মুখ নিচু করে আছে।

আবার বললাম, বল, বল ডাক্তার সে কথা!

ও বললে, আমাকে প্রথম দিন দেখে চিনতে পার নি ইসাডোরা?

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। কুয়াশা ঢেকে ছিল, যেন সরে গেল। আর্তনাদ করে উঠলাম। মনে পড়েছে! সেই সর্বনাশা দিন। যে-ডাক্তারটি এসে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল—এই তো সেই! আমার ছেলেমেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে ডাক্তার, এখন তো চিনতে পেরেছ। সেদিন থেকে আমি আমার সব আনন্দ হারিয়েছি। তোমার ডিয়েড্রীর সেই মৃত্যু-ম্লান মুখ তো আমি ভুলব না! তুমি যখন ঘুমিয়ে থাক, মনে হয় ওর সেই মুখখানি আমি দেখছি। ভয়ে শিউরে উঠি। ওকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম ইসাডোরা, সত্যি বাঁচাতে চেয়েছিলাম!—আমার নিজের জীবনীশক্তি ঢেলে দিতে চেয়েছিলাম। আমি—

কেঁদে উঠলাম। বুঝলাম, ও আমারই মতো দুঃখী।

সে-রাত থেকে ওকে আরো ভালবাসলাম। সন্তানদের স্মৃতি যেন আমাদের ভালবাসাকে আরো উন্মাদনায় ভরে দিলে। আমি ওর চোখে দেখতে পাই হতাশার ছায়া, ওর আলিঙ্গনে মৃত্যুর হিম-শীতলতা যেন অনুভব করি। আর ডাক্তার আমার মুখে দেখে ডিয়েড্রীর মৃত্যু-ম্লান মাধুরী। এ কি প্রেম—এ কি সর্বনাশা প্রেম? এ প্রেম তো মৃত্যু দিয়ে ঘেরা—এ প্রেম তো আমাদের বুঝি পাগল করে দেবে। তাইত যখন ঘুম ভেঙে যায় রাতে, পরস্পরের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি। কখনো বা ভীতি ঘনিয়ে আসে—পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে সরে যাই—আবার কখনো বা আকুল হয়ে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরি।

সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে-বেড়াতে অনেক দূরে চলে গেলাম। ফেরার ইচ্ছে নেই। কোথায় বা ফিরব? আমার বাড়ি? সে তো শূন্য। আমার

প্রেম? সে তো মৃত্যু দিয়ে ঘেরা, মৃত্যু-সমান। জোয়ার এসেছে, বালি ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঢেউ, আমার পা ভিজে গেছে। তবু চলেছি। সমুদ্র আমাকে যেন ডাকছে—বলছে, শিল্প-সাধনায় সুখ নেই, সুখ নেই প্রেমে, সুখ নেই সন্তানের আবার আবির্ভাবে। মুক্তি শুধু এইখানে।

মুক্তি আমি চাই। কিন্তু সে-মুক্তি তো জীবন নয়, বেদনা—ধ্বংস—মৃত্যু।

তবু সাগরে ঝাঁপিয়ে না পড়ে ফিরে এলাম। টুপীটা বালির উপর ফেলে নেমে গিছলাম সাগরে। তাকিয়ে দেখি, সেই টুপীটা হাতে করে পাগলের মতো খুঁজছে ডাক্তার। আমাকে দেখতে পেয়ে সে কেঁদে ফেলল। সে তো আমার মন জানে। ভেবেছিল, আমি সাগরের বুকে তলিয়ে গেছি—আমার যত ব্যথা নির্বাণ লাভ করেছে। তাই আমাকে দেখে শিশুর মতোই সে কেঁদে উঠল। দুজনে দুজনকে সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু বুঝলাম—আমাদের বিচ্ছেদ প্রয়োজন। দুজনে নিঃশব্দে ফিরে চললাম। একসময়ে ডাক্তারকে বললাম,

ডাক্তার হয় তুমি পালাও, নয় আমি! এ প্রেম তো আমাদের মৃত্যু—এতো আর কিছু নয়। আমরা যে পাগল হয়ে যাব।

ডাক্তার অস্ফুট স্বরে বললে, সত্যিই তাই। হয় আত্মহত্যা, নয় তো পাগলা গারদ—এছাড়া তো এর আর পথ নেই।

দুজনেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। ডাক্তার চলে গেল হাসপাতালে, আমি ফিরে এলাম।

বাড়ি এসে দেখি, একটি বাক্স এসে হাজির। আমার পোষাকের বাক্স পাঠিয়েছে পারী থেকে। বাক্স খুলতেই চমকে উঠলাম। সারি সারি ভাঁজ করা রয়েছে আমার ডিয়েড্রী আর প্যাট্রিকের পোষাক। বুক ফেটে আবার আর্তনাদ উঠল। ওদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এমনি আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। সেদিন নিজের স্বর বলে চিনতে পারিনি, আজও পারলাম না। এ যেন এক আহত পশুর অন্তিম চিৎকার।

ওদের সেই মৃত্যুর দিনের পোষাক। সেই কোট—সেই জুতো! হাত দিয়ে ছুঁতে গেলাম, জড়িয়ে ধরতে গেলাম। মাথা ঘুরে গেল। চোখের আলো নিবে গেল।

ডাক্তারের কাছে পরে শুনলাম, সে এসে দেখে খোলা বাক্সের সুমুখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছি। সে আমাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

ট্রাঙ্কটা কিন্তু আর খুঁজে পাইনি।
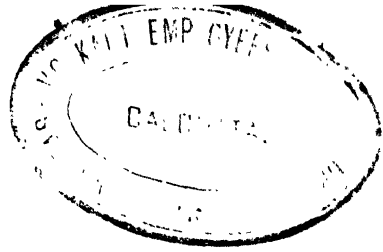
চব্বিশ

ইংলণ্ড এবার যুদ্ধে যোগ দিলেন। এল্ তার ডেভনশায়ারের বাড়িখানি হাসপাতালের জন্য দান করলে, স্কুলের ছাত্রীদের এলিজাবেথ আর অগাস্টিনের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল নিউইয়র্কে। সেখান থেকে আমার কাছে ঘন ঘন তার আসতে লাগল, চলে এস!

একদিন রওনা হলাম। ডাক্তার আমার সঙ্গে লিভারপুল অবধি এল, তারপর তুলে দিল নিউইয়র্কের জাহাজে।

অসুস্থ শরীর, অসুস্থ মন। সারাদিন কেবিনে শুয়ে কাটাই। শুধু রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ডেকের উপর ঘুরে বেড়াই। নিউইয়র্কে পৌঁছতেই এলিজাবেথ আর অগাস্টিন আমাকে নিতে এল বন্দরে। তারা আমার চেহারা দেখে শিউরে উঠল।

অগাস্টিন বলে উঠল, একি তোমার চেহারা হয়েছে ইসাডোরা?

উত্তর তো মুখে জোগাল না, চুপ করে রইলাম।

এলিজাবেথ শুধু নিঃশব্দে আমাকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখেই জল।

এসে দেখলাম, এলিজাবেথ স্কুলটিকে বেশ ভালই চালাচ্ছে। যুদ্ধমান পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়ে মেয়েদের মুখেও ফুটে উঠেছে হাসি। আমিও দুঃখকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কাজে লেগে গেলাম। স্টুডিয়ো ভাড়া নিয়ে নীল যবনিকায় আবার ঘিরে দিলাম। আবার নিত্য-নতুন নাচ।

যুদ্ধ বিস্ফূর্ত হয়ে পড়েছে ফ্রান্সে, কামান গর্জন করে উঠছে, বাস্তুহারারা পালাচ্ছে দলে দলে। ফ্রান্স কাঁদছে, রক্তাক্ত ফ্রান্স—কিন্তু আমেরিকা তো উদাসীন। তার জীবনধারা তেমনি শান্ত। সেখানে কল-কারখানার চাকা চলছে, রণসম্ভার উৎপন্ন হচ্ছে আর সেই রণসম্ভার অর্থের বিনিময়ে সে শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে বিক্রি করছে।

আমার আর সয় না!

সেদিন, মেট্রোপলিটান অপেরায় নাচ। নাচের পরে লাল রঙের শালখানা গায়ে জড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম মঞ্চের উপর। ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত লা-মার্সাঈ-এর তালে তালে নাচলাম। তরুণ আমেরিকাকে আহ্বান জানালাম,

এস, এস, তরুণদল, মহিমাময় এক সভ্যতাকে বাঁচাও! আমার যুগের সংস্কৃতিকে বাঁচাও—বাঁচাও রক্তাক্ত ফ্রান্সকে!

পরের দিন খবরের-কাগজগুলো মেতে উঠল। তারা লিখলে, ইসাডোরা যেন পারীর বিজয় তোরণের স্বাধীনতার মূর্তি। তিনি সেই স্বাধীনতার আহ্বান ছড়িয়ে দিলেন আমেরিকার তরুণ আত্মায়,আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলাম। জনতার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শেষ হ'ল তাঁর লা-মার্সেঈ নাচ।

দেখতে-দেখতে আমার স্টুডিয়ো শিল্পীদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। আমার মন সুস্থ হয়ে উঠল, দেহ নিরোগ, আবার নতুন সৃষ্টির বন্যায় ভেসে চললাম।

চারিদিকে বিয়োগান্ত সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, তাই গ্রীক বিয়োগান্ত নাটককে রূপ দেবার ইচ্ছা হ'ল। সেঞ্চুরী থিয়েটার লীজ নিয়ে মেতে উঠলাম ইডিপাসের অভিনয়ে। প্রথমেই সমস্ত রঙ্গমঞ্চকে দিলাম সেই পুরানো গ্রীসের মঞ্চের রূপ। নীল কার্পেটে মুড়ে দিলাম সারা প্রেক্ষাগৃহ। বক্সগুলো ঢেকে দিলাম নীল পর্দায়। পঁয়ত্রিশ জন অভিনেতা, আশীজন বাদক এবং একশোটি গায়িকা নিয়ে নাটকটি অভিনীত হ'ল।

অভিনয় জমলেও, দর্শক এল না। আমার পুঁজিপাটা যা ছিল উবে গেল। আমেরিকা পৃথিবীর বিয়োগান্ত নাটকের পালা এড়িয়ে ডলার-পূজায় মত্ত। তাই আমার রাজা ইডিপাসের গভীর দুঃখকে সে নিজের বলে মেনে নিতে চাইলে না। একেবারে ফতুর হয়ে ডলার-পতিদের কাছে আবেদন জানালাম। তাঁরা উত্তর দিলেন, গ্রীক নাটক দিয়ে আমরা কি করব! আমাদের দেবতাব অর্ঘ্য রচনা কর, আমরা তোমাকে রুধির জোগাব।

ডলার-দেবতার পূজার অর্ঘ্য তো উচ্ছৃঙ্খল, চটুল নৃত্য! সমাজের সেরা নরনারী সেই নাচে উন্মত্ত। নিগ্রোরা বাজায়, আর তাঁরা নাচেন সেই বর্বর সঙ্গীতের তালে তালে। উচ্ছৃঙ্খলতাই সেখানে শেষ কথা, সার কথা। এক নাচের আসর থেকে আমার নিমন্ত্রণ এল। আমি গেলাম, দেখলাম। আবার অবাকও হলাম। ফ্রান্স কাঁদছে, আর্তধ্বনি তুলছে। আর আমেরিকা এখনো নীরব? এখনো সে বর্বর আনন্দে মাতোয়ারা! সে নৃত্যের স্রোতে আর যে-কেউ ভেসে

যেতে পারে, ইসাডোরা নয়। তাই ১৯১৫ সালের আমেরিকা ছেড়ে চলে আসব ঠিক করলাম।

কিন্তু টাকা নেই। জাহাজ রওনা হবে তিন ঘণ্টা পরে। বার্থ ফোনে রিজার্ভ করে রেখেছি, কিন্তু টিকিট কেনার মতো টাকা নেই। এমন সময় মুশকিল আসান করতে এলেন এক তরুণী। তিনি নিঃশব্দে আমার স্টুডিয়োতে ঢুকে এগিয়ে এসে বললেন,

আপনি নাকি আজই য়ুরোপে চলে যাচ্ছেন?

ছাত্রীরা সবাই যাত্রার পোষাক পরে তৈরী, তাদের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, দেখছেন তো আমরা সবাই তৈরী, কিন্তু টিকিট কেনার পয়সা নেই। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে কি না কে জানে। জাহাজ ছাড়ারও আর দেরী নেই।

তিনি মৃদুস্বরে বললেন, আপনাদের কত টাকার দরকার?

প্রায় দু'হাজার ডলার। এমন বন্ধু নেই যে ঐ টাকাটা দেন।

তরুণী একখানা পকেট বই বার করে তার ভিতর থেকে হাজার ডলারের দুখানি নোট বার করে বললেন,

কিছু যদি মনে না করেন, এই দুখানি আমি আপনাদের পথখরচা হিসেবে দিতে চাই। প্রতিভার কাছে এর মূল্য কিছুই নয়।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তরুণীর দিকে। তাঁকে কখনো দেখিনি, অথচ তিনি আমাকে দু'হাজার ডলার দান করে বসলেন! হয়তো ডলার-পতিদের কারো পত্নীই হবেন। তাই বললাম,

আপনি ধনবতী, আপনার ধন আমি নিলাম। জনগণের কাজে লাগবে।

তিনি হেসে বললেন, ধনবতী আমি নই -আমি সামান্য মানুষ। তবু আপনার অভাব জেনে না এসে তো পারলাম না। ভাবলাম, আমার সর্বস্ব দিয়েও যদি আপনার অভাব মেটে, আমি তাও মেটাব। আজ আমার মতো সুখী কে!

তিনি চলে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে বললাম, আপনাকে তো আমি চিনি না!

ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, চেনার মত কেউ নই—সামান্যা আমি। আমাকে রুথ বলেই ডাকবেন।

জাহাজে ওঠার সময়ে রুথ বিদায় দিতে এলেন। আমার হাত ধরে বললেন, আপনার পথই আমার পথ—আপনার আদর্শ আমারই আদর্শ—এই কথা মনে রাখবেন।

রুথকে জড়িয়ে ধরলাম, এমন সময় প্রথম হুইশল পড়ল।

আমেরিকা যুদ্ধমান দেশ নয়, সে বণিক। তাই সেখানে নিষিদ্ধ হয়েছে আমার লা-মার্সেঈ নাচ। আজ আমেরিকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আমেরিকাকে দেখিয়ে যাব শেষবারের মতো এই নাচ। ঐ যে স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন, দেখি তাঁর চোখে রক্তাক্ত ফ্রান্সের জন্য সমবেদনার অশ্রু ঝড়ে পড়ে কিনা। তাইত—এইবার জাহাজের ডেকের উপর আমরা তুলব ফরাসী নিশান, ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত গান করতে করতে আমেরিকার কাছে বিদায় নেব।

হুইশল দিলে আবার। সিঁড়ি তোলা হচ্ছে। আমার ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে ডেকের উপর। তাদের জামার আস্তিনের ভিতরে লুকিয়ে আছে ফ্রান্সের ঝাণ্ডা।

জাহাজ এবার তীর থেকে সরে আসবে। এমন সময় আমরা নিশান উড়িয়ে গান গেয়ে উঠলাম। জাহাজের অফিসারেরা ছুটে এল। কিন্তু বিপ্লবী ইসাডোরা তখন রক্তবর্ণ শাল উড়িয়ে দিয়ে গান গাইছে—সাধ্য কি ওরা তাকে থামায়!

তীরে দাঁড়িয়ে আছে রুথ আর মেরী। হঠাৎ মেরী লাফিয়ে এসে উঠল ডেকের ওপর। আমাদের সঙ্গে সেও গান জুড়ে দিলে। এবার জাহাজ চলতে শুরু করেছে। সরে যাচ্ছে তীর। আমাদের গান উঠছে, ঝাণ্ডা দুলছে।

আমার স্কুল নিয়ে চললাম ইতালীর দিকে। দেখি, সেখানে ঠাঁই মেলে কিনা!

এসেই দেখি, ইতালীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। যুদ্ধে নামছে ইতালী। আমি উৎসাহে জনগণের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাদের কাছে বললাম,

আমি এসেছি আমেরিকা থেকে। সেখানে ডলার পূজা চলছে। তারা চায় না পৃথিবীর সংস্কৃতি, সভ্যতা বাঁচাতে। তোমরা চাইছ, তাইত আমি তোমাদের মধ্যে চলে এলাম। তোমাদের দেশের নীল আকাশ, আঙুর বাগিচা, জলপাই বন তো আমেরিকার কোটি কোটি টাকার চেয়ে ঢের-ঢের দামি।

কিন্তু আমার ছাত্রীরা বেশির ভাগই জার্মান, তাই যুদ্ধমান ইতালীতে ঠাঁই পেলাম না। ভাবলাম—যাব গ্রীসে। কিন্তু সেখানেও ঐ একই বিপদ। শেষে নিরপেক্ষ দেশ সুইটজারল্যাণ্ডে যাওয়াই ঠিক করলাম।

জুরিচে এসে হাজির হলাম। এক হোটেলেই উঠলাম মেয়েদের নিয়ে। সেখানে এক বিখ্যাত ডলার-পতির মেয়ের সঙ্গে দেখা। আমার স্কুল সম্বন্ধে তাঁকে

সচেতন করে তুলতে চাইলাম। তাঁরই জন্যে হোটেলের লনে একদিন মেয়েদের নিয়ে বসালাম নাচের আসর। ভদ্র মহিলা নাচ দেখলেন। তাঁকে বললাম,

কেমন দেখলেন ?

সুন্দর! মামুলি জবাব দিলেন মহিলা।

বলে ফেললাম, আমার এই স্কুলটিকে আপনি বাঁচান।

ভদ্রমহিলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন,

নাচ দিয়ে কি হবে? শুধু মনের বিশ্লেষণ ছাড়া আমার অন্য কোনো কৌতূহল নেই। আমি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ডক্টর য়ুঙের ছাত্রী।

বলে উঠলাম, কি আছে আপনার মনোবিজ্ঞানে—যার সেবায় আপনি মেতে উঠেছেন ?

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, আপনি বুঝবেন না! স্বপ্নই তো জীবনের আসল জিনিস। আমাদের মনের জটিলতা স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। তারই বিশ্লেষণ করে আমরা আনন্দ পাই।

কিন্তু তাতে কি ফল হবে পৃথিবীর ?

আমরা বসাব ক্লিনিক তুনিয়া জুড়ে, মানুষকে জটিলতা থেকে মুক্তি দেব।

না, তা সম্ভব হবে না, বলে উঠলাম। জটিলতা আছে সমাজ-ব্যবস্থায়, তাকে পাল্‌টে না দিলে মানুষের অসুখ তো আরাম হবে না।

ভদ্রমহিলা চুপ করে রইলেন, আমি চলে এলাম।

জুরিচ থেকে আউচিতে এসে বাসা বাঁধলাম। লেমান হ্রদের পাশে ভাড়া নিলাম এক বাড়ি। সেখানে আবার বসে গেল স্কুল। আবার সেই নীল পর্দার সমারোহ সেখানে ওরা নাচে, আমি নাচি। মাঝে মাঝে আসেন বন্ধুজন। নাচ-গানে কেটে যায় দিন। একদিন একদল বন্ধু জুটে গেল। ওরা সমর-উদ্বাস্তু। নানা দেশের মানুষ আছে দলে। সবাই বিলাসী, সবাই ধনী।

ওরা রোজ মোটর বোটে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে যায় লেমান হ্রদের বুকে। দূরে দূরে চলে যাই। বোটে শ্যাম্পেনের বোতল বোঝাই থাকে।

তুপুর রাতে আমাদের যাত্রা শুরু হয়—শেষ হয় ভোর চারটেয় কোন দ্বীপে। সেখানে পানোৎসব চলে। একদিন এক ইতালীর কাউন্টের সঙ্গে ওরা আলাপ করিয়ে দিল। রহস্যময় মানুষ। সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়, রাত হলে জেগে ওঠে। মাঝে মাঝে ছোট একটা রূপোর সিরিঞ্জ বার করে হাতে নিজেই ইঞ্জেকশন

দেয়। তখন আর ঝিমন্ত ভাব থাকে না, চাঙা হয়ে ওঠে। আনন্দের বান ডেকে যায়।

ওরা সবাই সুন্দর, তারুণ্য ওদের দেহে; কিন্তু নারী সম্পর্কে ওরা উদাসীন। আমাকে ওদের দলে টেনে নিয়েছে, কিন্তু আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ওদের নেই। আমার সঙ্গে ব্যবহারে কোনো তারতম্য নেই। ওরা যেন নিজেদের নিয়েই মশগুল। আমার গর্বে আঘাত লাগল। বিজয়িনী ইসাডোরা ওদের জয় করতে পারবে না? নারীর সমস্ত ছলাকলা দিয়ে ওদের দলের প্রধানকে জয় করব ঠিক করলাম। ফাঁদ পাতা হ'ল, সর্দার ধরাও দিলে। আমরা একরাতে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম মোটর-বিহারে। সেদিন রাতটা ছিল চমৎকার। লেমান হ্রদের তীর বেয়ে ছুটে চলল আমাদের গাড়ি। মন্ত্রো ছাড়িয়ে ছুটে চলল। আমি পেছন থেকে শুধু বলছি—চালাও, আরো জোরে চালাও!

ওরা ভোরে উঠে দেখল, ওদেরই দলের সর্দার এক নারীর সঙ্গে উধাও হয়েছে। আমরা তখন বহু দূরে এক গিরিপথের চির তুষারের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছি।

ইতালীর কত জায়গা ঘুরে আমরা এলাম রোমে। তারপর নেপলস-এ।

নেপলস্-এর সমুদ্র দেখে মনে পড়ল গ্রীসের কথা। একখানা স্টিমারে চেপে বসলাম।

একদিন ভোরে দেখি, আথেনার মন্দিরের সোপান বেয়ে উঠছি। আগের বারের কথা মনে পড়ল। মনটা বিষিয়ে উঠল! তখন এসেছিলাম কলালক্ষ্মীর সন্ধানে, আজ সে সাধনা তো আমার নেই। কামনা আমাকে ঘিরে ধরেছে, আমি দুঃখে জর্জর।

আথেন্স তখন তোলপাড়। ভেনেজেলোস-মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। হয়তো কাইসারের পক্ষেই যোগ দেবে গ্রীস। এসেই আমি এক ভোজের আহ্বান করলাম আমার হোটেলে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন গ্রীসের রাজার সেক্রেটারী। টেবিলে রক্ত গোলাপের স্তূপ, তারই আড়ালে একটি খুদে গ্রামোফন লুকিয়ে রাখলাম।

হঠাৎ শুনি আমাদের পাশের টেবিলে ক'জন জার্মান অফিসার কাইসারের স্বাস্থ্য পান করছেন। অমনি টেবিলের রক্ত গোলাপের স্তূপ সরিয়ে দিয়ে

গ্রামোফোন চালিয়ে দিলাম! ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতের সুর বেজে উঠল। বিপ্লবী ইসাডোরা পানপাত্র হাতে নিয়ে বলে উঠল,

ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হোক!

রাজার সেক্রেটারী ভয় পেলেন, কিন্তু মনে মনে খুশি হলেন। তিনি মিত্রপক্ষের বন্ধু।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, হোটেলের পাশের ময়দানে সমবেত হয়েছে জনতা, তাদের হাতে নিশান। আমার তরুণ বন্ধুকে বললাম,

গ্রামোফোনটা তুলে নাও, তাঁরপর চল ঐ জনতার ভিড়ে মিশে যাই!

তরুণ বন্ধুটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তাকে ধমক দিয়ে বললাম, দেখছ কি—জনতার মাঝখানে না হলে কি জাতীয় সঙ্গীত প্রাণ পায়!

তরুণ গ্রামোফোন নিয়ে চলল, আমি এসে দাঁড়ালাম ময়দানে। জনতা স্তব্ধ। এবার বলে উঠলাম, গাও, তোমরা জাতীয় সঙ্গীত রক্তাক্ত ফ্রান্সের—আমি নাচি!

গান শুরু হ'ল আর নাচ। আমার রক্তবর্ণ শাল রক্ত নিশান হয়ে উড়তে লাগল বাতাসে। জনতার তুমুল জয়ধ্বনি। এবার নাচ থামল, বক্তা রূপে আবির্ভূত হলেন ইসাডোরা।

বললাম,

ভেনেজেলোস তোমাদের গ্রীসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তিনি বর্তমান যুগের পেরিক্লিস। আজ তাঁর মন্ত্রিসভা গদিচ্যুত। রাজা তাঁকে চাননা, অথচ তিনি তো গ্রীসকে মহিমার পথে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু আজ যদি জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী হয়, তোমাদের গ্রীসের সে-মহিমা কি ধূলায় লুটিয়ে পড়বে না? আমরা সাম্রাজ্যবাদী কাইসারের মিত্র হতে চাই না—আমরা চাই রক্তাক্ত ফ্রান্সকে বাঁচাতে—আমরা চাই পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বাঁচাতে। চল, আমরা ভেনেজেলোসের কাছে ছুটে যাই—তিনি আমাদের মধ্যে নেমে আসুন—আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলুন!

জনতার ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল, তাদের মিছিল নিয়ে চললাম আথেন্সের পথে। ভেনেজেলোসের বাড়ির সুমুখে গিয়ে ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত গাইলাম। এবার পুলিশ এসে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে।

এর পরে আথেন্স থেকে বিদায় নিতে হল, তবু খুশি মনে চলে এলাম। আবার ইতালী। কিন্তু ইতালীতেও বেশি দিন থাকা হ'ল না, সুইটজারল্যাণ্ডে এসেই রইলাম। স্কুল রাখা দায়। টাকা নেই। শতকরা পঞ্চাশ টাকা সুদে টাকা

ধার নিয়ে চালাতে লাগলাম। এমনি করে উনিশ শো ষোলো সাল এসে গেল এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ডাক পড়ল।

স্মৃতিকথার তো অনেকখানি এগিয়ে এলাম। কিন্তু তবু তো অসম্ভব মনে হচ্ছে লেখা। নিজের জীবনের কথা তো এ নয়, বহু মানুষের জীবনের এই কথা। যে-সব ঘটনা আমার সারা জীবন জুড়ে আছে, তার জন্যে মাত্র দু-একপাতা ব্যয় করেছি। আবার আমার ব্যথা, আমার কামনা তো তেমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। এ যেন কঙ্কাল এনে উপহার দিলাম, এখন পাঠক তাকে রক্তমাংসে সাজিয়ে নিন!

সত্য কথাই লিখতে আমি চেয়েছি, কিন্তু সত্য আমাকে এড়িয়ে গেছে। সত্যকে কি করে খুঁজে পাব? যদি আমি আমার জীবন নিয়ে বিশখানা উপন্যাস লিখতাম, তাহলে হয়তো সত্যকে আবিষ্কার করতে পারতাম। উপন্যাস লেখার পরে শিল্পীর জীবনী ভালই জমতো। আমার শিল্পী-জীবন থেকে আমার ব্যক্তিগত জীবন তো বিচ্ছিন্ন—সে তো স্বাধীন—তাই দুয়ে বুঝি মেশাতে পারিনি।

তবু জীবনে যা কিছু ঘটেছে, তাই লিখছি। আমার ভয়, সব বুঝি এলোমেলো হয়ে যাবে! তবু লিখব, শেষ করব। সতী মেয়েরা বলবেন, ছিঃ ছিঃ! নারীত্বের একি চরম অপমান! ওর দুর্ভাগ্য তো ওর পাপেরই ফল। কিন্তু আমি তো কোনো পাপ করিনি। নারী হচ্ছে আরশী, সেই আরশীতে ছায়া ফেলেছে কত পুরুষ আর নরনারী, কত স্মৃতি! আমি তাদের সংস্পর্শে এসে বদলে গেছি, নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আমার জীবন শুধু তারই পরিচয়। আর কিছু তো নয়।

পঁচিশ
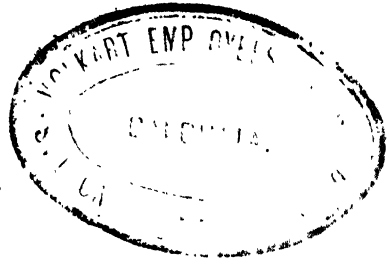
রওনা হলাম দক্ষিণ আমেরিকার পথে।

নিউইয়র্কের বন্দরে অগাস্টিন আমার সাথী হ'ল। আবার ভেসে চললাম।

প্রথমে বাহিয়া। বড় সুন্দর শহর। সবুজের মেলা। গ্রীষ্মঋতুর সম্ভারে সাজানো।

সারাদিন বৃষ্টি ঝরছে। মেয়েরা চলেছে পথে, তাদের পোষাক ভিজে, অঙ্গের প্রতিটি রেখা ফুটে উঠছে আর্দ্রতায়। বৃষ্টিতে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

এখানেই প্রথম দেখলাম কালা-ধলার মিলন রেস্তর াঁয় একই টেবিলে বসেছে তারা। কৃষ্ণাঙ্গী মেয়ে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে প্রেম করছে, আবার শ্বেতাঙ্গিনী জুটিয়ে নিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ প্রেমিককে। বড় ভাল লাগল।

বাগানে বাগানে ফুটে আছে লাল হিবিসকাস ফুল, আর আছে এখানে-ওখানে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের মিলন মেলা। কিন্তু সভ্যতার পাপ এখানেও আছে। পতিতা পল্লীতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে জানালায়, পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। আদি যুগের ব্যাবিলন নারীমেধের যে ব্যবসা খুলে বসেছিল, যাকে সামন্ত যুগ সস্নেহে লালন-পালন করেছে, ধনবাদী যুগ যাকে শুধুই অর্থের পণ্য করে তুলেছে—এখানেও তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। কিন্তু এই দেহ-পসারিণী মেয়েদের দেখে ভাল লাগল। ওদের দীনতা নেই মুখে। নেই ভীত-চকিত দৃষ্টি। নারীমেধের বিপনী সাজিয়ে বসেছে বটে, কিন্তু ওদের নারীত্ব বুঝি লুপ্ত হয়ে যায় নি।

বাহিয়া থেকে বুয়োনোস আয়ার্সে এসে গেলাম। একদিন এক ছাত্রদের মজলিসে গেলাম। ছাত্রেরা আমাকে ঘিরে ধরল। দীর্ঘ হল, নিচু ছাদ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। কালো ধলা তরুণ তরুণী। সবাই ট্যাঙ্গো নাচ নাচছে। আমি কখনো ট্যাঙ্গো নাচ নাচিনি। ওরা আমাকে শিখিয়ে দিলে। প্রথম পদক্ষেপেই আমি যেন কেমন উন্মাদ হয়ে গেলাম। ট্যাঙ্গোর উন্মাদনায় নিজেকে সঁপে

দিলাম। এ-উন্মাদনা কি দিয়ে বোঝাব? এ যেন এক দীর্ঘ সোহাগের মতো। দক্ষিণ অঞ্চলের আকাশের নিচে এ যেন প্রেমের মতোই মধুর—আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অরণ্যের মতো নিষ্ঠুর—বিপজ্জনক।

তাদের জন্য আর্জেন্টিনার স্বাধীনতা উৎসবে নাচলাম। আর্জেন্টিনার ঝাণ্ডা জড়িয়ে নিলাম সারা দেহে, তাদের কাছে মূর্ত করে তুললাম উপনিবেশের মানুষের দাসত্ব ব্যথা। ছাত্রেরা চমকে উঠল। শিহরণ বয়ে গেল সারা দেহে। তাদের অনুরোধে আবার নাচতে হ'ল।

কিন্তু এ আনন্দ তো ক্ষণস্থায়ী। ভোরবেলা খবরের কাগজ হাতে করে এলেন আমার ম্যানেজার মশাই। ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন,

এ আপনি কি করেছেন!

হেসে বললাম, আমার মন যা চায় তাই করেছি!

তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বললেন, এর মানে কি জানেন, আপনার নাচ দেখতে সম্ভ্রান্তরা আর কেউ আসবেন না। আপনার সঙ্গে আমার যে চুক্তি ছিল, এই-খানেই শেষ হ[illegible]

আমার ম্যানেজার এক অপেরাদল নিয়ে চলে গেলেন, আমি পড়ে রইলাম বুয়েনোস আয়ার্সে।

আর এক বিপর্যয়ের খবর এল। আমার স্কুল সুইটজারল্যাণ্ডে। সেখানে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছিলাম। কিন্তু যুদ্ধের দৌলতে টাকা পৌছয় নি। যে বোর্ডিং-এ ছাত্রীদের রেখে এসেছি, সেখানকার মালিকানী খবর পাঠিয়েছেন, টাকা চুকিয়ে না দিলে তিনি তাদের বার করে দেবেন। যা কিছু ছিল সব দিয়ে অগাস্টিনকে পাঠিয়ে দিলাম সেখানে। হোটেলের ভাড়া চুকিয়ে দেবারও উপায় রইল না। তাই ট্রাঙ্ক ক'টা হোটেলের হেফাজতে রেখেই বিদায় নিতে হ'ল।

তবু বুয়েনোস আয়ার্স আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। আমি তার স্বাধীনতার কামনাকে মূর্ত করে তুললাম।

বুয়েনোস আয়ার্স যতই নিষ্ঠুর হোক, দক্ষিণ আমেরিকার আর-আর শহর আমাকে সাদরে আহ্বান জানালে। আমি নাম পেলাম, আর পেলাম আমার বন্ধু কবি জাঁ দ্য রিয়োকে। তারপরে একদিন ফিরে এলাম নিউইয়র্কে।

নিউইয়র্কে জাহাজ ভিড়ল। নেমে দেখি, কেউ নিতে আসেনি। অথচ তার করেছিলাম, হয়তো তার ঠিক সময়ে পৌঁছয় নি। কি করব ভাবতে বসলাম। শেষে অনেক ভেবে আমার ফোটোগ্রাফার বন্ধু আর্ণল্ডকে ফোন করলাম।

আর্ণল্ড আমার ঘণিষ্ঠ বন্ধু। তিনি শুধু প্রতিভাধর নন, জাদুকর। ছবি আঁকতেন, ছেড়ে দিয়ে ধরলেন ফোটোগ্রাফী। কিন্তু এ ফোটোগ্রাফী তো এক অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি। আমার ছবিও তিনি তুলেছেন। সে-ছবিতে আমার আত্মার চেহারা ফুটে উঠেছে।

আর্ণল্ডকে ডাকলাম।

ফোন ধরে আছি, এমন সময় স্বর বেজে উঠল। এ তো আর্ণল্ডের স্বর নয়। এ যে চেনা, বড় চেনা—আমার লোহেনগ্রীনের স্বর!

এল্ জানালে, আর্ণল্ড বাড়ি নেই, তবে অনুমতি পেলে আমি আসতে পারি ইসাডোরা!

হাসির সঙ্গে তীব্রতার খাদ মিশিয়ে বললাম, এখন পরিহাসের সময় নয়। আমার কাছে কানাকড়িও নেই। আমার জিনিষপত্র সব কাস্টমস্-এর হাতে। যদি সব জেনে আসতে ইচ্ছে হয় তো এসো!

কয়েক মিনিট পরেই সে এল। সে এসে দাঁড়াতেই আমার সমস্ত ভাবনা চলে গেল। পেলাম নিরাপত্তার আস্বাদ।

আমার জীবনে তোমরা দেখেছ, প্রেমিকদের প্রতি আমার বিশ্বস্ততা চিরদিনই অটুট আছে। ওরা যদি ছেড়ে না যেত, আমি হয়তো একজনকে নিয়েই খুশি হতাম! কিন্তু ছেড়ে গেছে বলে, ভালবাসা তো আমার মরেনি। পুরুষ ছেড়ে গেছে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার প্রজাপতিপনার পরিচয় দিয়েছে। হয়তো নিয়তির নিষ্ঠুরতা মূর্ত হয়ে উঠেছে আমার জীবনে; কিন্তু আমার ভালবাসা তো মরে যায়নি, তেমনি আছে। আগে যেমন ভালবাসতাম, এখনো তাদের তেমনি ভালবাসি।

এল্ আমার দিকে তাকাল, আমি ওর দিকে তাকালাম।

ও কাছে এসে আমার হাত ধরল, শুধালে, ভাল তো বন্ধু?

শুধু হাসলাম, কথা যোগাল না মুখে।

এল্ এবার শুল্ক বিভাগের হেফাজত থেকে মালপত্র খালাস করে আমাকে আর্ণল্ড-এর স্টুডিয়োতে নিয়ে এল। আর্ণল্ডও এরই মধ্যে এসে হাজির। তিনজনে বসলাম গিয়ে এক হোটেলে। মনে হ'ল, আবার সুখের দিন আসছে।

এবার ভেল্‌কির মতো কাজ চলল। মেট্রোপলিটান অপেরা ভাড়া নিয়ে বসানো হ'ল নাচের আসর। সেখানে শিল্পীদের নিমন্ত্রণ করা হ'ল। আমি নাচলাম তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে। নাচ শেষ হ'ল লা-মার্সাঈ-এ। সেদিন আর আমেরিকা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল না। আমেরিকা তখন বেনিয়া-বৃত্তি ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

এরই মধ্যে অগাস্টিন ফিরে এল স্বইটজারল্যাণ্ড থেকে। সঙ্গে তার মাত্র ছটি বড় বড় ছাত্রী। বাকি সবাই তাদের বাপ-মার কাছে চলে গেছে।

এই ছ'জনকে নিয়েই শুরু হ'ল কাজ। কিন্তু শরীর ভেঙে পড়ছিল। তাই নিউইয়র্কে ওদের রেখে কিউবায় চলে গেলাম হাওয়া বদলাতে। সঙ্গে এল্‌-এর সেক্রেটারী।

হাভানা শহরটি বড় ভাল লাগল। ছবির মতো সাজানো শহর। এখানকার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে। শুধু মনে আছে দু-একটি ঘটনা।

শহর থেকে দূরে এক কুষ্ঠাশ্রম। উঁচু প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। মাঝে মাঝে ফটকের দরজা খুলে যেত, তখন দেখতাম, ভীতির মুখোস-আঁটা মানুষের মুখ।

একদিন হুকুম জারী হ'ল পৌরকর্তাদের—কুষ্ঠাশ্রম সরিয়ে নেওয়া হবে।

সেদিন রোগীদের সে কি আর্তনাদ! তারা কেউ দরজা আঁকড়ে ধরে আছে, কেউবা ছাদে উঠে পালিয়ে আছে, কেউবা শহরে এসেই লুকোল। এ-ঘটনা মনে পড়ল কেন? বুঝি অসহায় মানুষের ভীতি মনে এঁকে দিয়েছিল এক নাটকীয় রূপ। সে-রূপ বুঝি মেতারলিঙ্কের নাটকের মতোই। বাস্তবের তো নয়। তাই মনে আছে।

বনেদী এক পরিবারে একদিন বেড়াতে গিছলাম। এক ভদ্রমহিলা সে-পরিবারের মালিকানী। তাঁর এক উদ্ভট শখ। তিনি বাগানে সারি সারি খাঁচায় পুরে রেখেছেন একপাল বানর আর গরিলা। যেতেই তিনি একটি বানর কাঁধে বসিয়ে, এক গরিলার হাত ধরে আমাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। দেখে আঁতকে উঠলাম।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, ভয় নেই! ওরা আমার পোষা।

তাঁর সঙ্গে ভয়ে ভয়েই বাগানের চিড়িয়াখানা দেখতে চললাম। সেখানে বানর আর গরিলার মেলা।

বললাম, এরা কোন রকমে ছাড়া পেলে তো এক কাণ্ডই করবে।

উত্তর দিলেন, মাঝে মাঝে একটু-আধটু দুষ্টুমি যে না করে, এমন তো নয়। এই তো সেদিন একটা গরিলা গরাদ ভেঙে আমার মালীকে মেরে ফেললে। কিন্তু এসব কালে-ভদ্রে ঘটে। এমনি ওরা খুব শান্ত।

আমি তো শুনে বিদায় নিতে পারলে বাঁচি।

ভদ্রমহিলা সুন্দরী, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। তাঁর বাড়িতে পৃথিবীর নামী সাহিত্যিকরা এসে অতিথি হন। অথচ বানর আর গরিলার প্রতি তাঁর এত ভালবাসা! আমাকে বিদায় দিতে এসে বললেন,

- উইল করেছি, এদের আমি পাস্তর ইনিস্টিটিউটে দান করে যাব, বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এরা জীবন উৎসর্গ করবে।

শুনে অবাক হ'লাম। এ আবার কেমন ভালবাসা! ময়না-তদন্তেই বুঝি এ ভালবাসার পরিণতি।

আর একটি স্মৃতিও মনে আছে।

সারারাত সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে রাত তিনটের সময় সেদিন হাভানার এক কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। বিচিত্র ভিড়। মরফিয়াসেবী, কোকেনবিলাসী, আফিমখোর, মদ্যপের এখানে ভিড়। যত ভাঙাচোরা লবেজান মানুষ এসে এখানে ঠাঁই নিয়েছে। এ এক ভাঙা বন্দর।

ঘরে নিবু নিবু জ্বলছে আলো। ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন। আমরাও একটা টেবিলে বসে পড়লাম। তাকিয়ে দেখি পিয়ানোর কাছে এক মূর্তি বসে আছে। শীর্ণ তার চেহারা, চোখ দুটি কিন্তু ভীষণ। সে হঠাৎ শীর্ণ হাত দিয়ে পিয়ানোর ঘাট টিপল। শপ্যাঁর সুর ঝড়ে পড়ল। অবাক হয়ে গেলাম—ঐ সুর আমি চিনি! ঐ সুর যে যন্ত্রে তুলতে পারে—সে কোকেনখোর হতে পারে, কিন্তু সে তো এক প্রতিভা। আমি এবার তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আলাপ করতে চেষ্টা করলাম। শুধু কয়েকটা অসংলগ্ন কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

কেমন যেন ইচ্ছে হ'ল, ঐ সুরের তালে তালে নাচি। আপনা থেকেই স্পন্দন জাগল দেহে, পা আপনা থেকেই ছন্দময়ী হয়ে উঠল।

স্তব্ধ ঘর, সবাই চুপচাপ। আমি নাচতে লাগলাম। ওরা কাঁদছে নিঃশব্দে। পিয়ানোবাদক তার মরফিয়ার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল, সুরের স্রোত বয়ে গেল।

ভোরের আলো দেখা দিল, এবার আমি থামলাম। ওরা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। মনে আনন্দ, এতদিনে আমার প্রতিভা স্বীকৃতি পেল। কিন্তু আনন্দ কি করে জাগল হৃদয়ে? বুক তো আমার শোকে দীর্ণ!

তবে কি, ইসাডোরা তার শোক ভুলে গেছে? না, তা তো নয়। ক'জন জানে যে, যখন মানুষ স্বাভাবিক হয়ে উঠে, তখন তো দুঃখ আরো গভীর হয়ে দেখা দেয়? সেই দুঃখই তো বুক থেকে নিঙরে বার করে আনন্দের নির্যাস।

আমার তো সেই দশা। বন্ধুরা বলেন ইসাডোরা, সব ভুলে গেছে। কিন্তু একটি ছোট ছেলে যখন হঠাৎ ঘরে ঢুকে 'মা' বলে কাউকে ডাকে, আমি তো চমকে উঠি। আমার বুকে ছুরির ঘা হানে। তখন মগজ চায় বিস্মৃতি—শুধু বিস্মৃতি। কিন্তু এই তীব্র ব্যথা থেকেই আমি সৃষ্টি করতে চাই শিল্প। আর সেই শিল্পে আনন্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ঐ যে সন্ন্যাসিনী ব্রত যারা নিয়েছে, তারা অজানা মানুষের কফিনের পাশে বসে প্রার্থনা করে, ওদের মতো হতে চাই আমি—সেই তো আমার কামনা। দুঃখের ভিতর দিয়ে পেতে চাই আনন্দকে—সুন্দরকে। তাই তো আমার আত্মার আর্তনাদ ওঠে;

আমি ভালবাসব, ভালবাসব—আমি সৃষ্টি করব আনন্দকে—সুন্দরকে!

এল্ এবার স্কুলের পরিকল্পনা নিয়ে বসে গেল।

কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তো কলালক্ষ্মীর বেদী তৈরি করতে আমার মন সায় দেয় না।

বললাম, এখন থাক না এল্।

এল্ রেগে উঠল, বললে, তাহলে রইল সব পড়ে আমি জানি না!

সে জায়গার বায়না দিয়েছিল। সেই বায়না বাতিল করে দিলে।

কিন্তু স্কুল চলল—আর নাচ।

আমেরিকার তরুণ কবি, ম্যাকে সেই নাচ দেখে লিখলেন কবিতা।

> বোমা পড়ছে—ন্যোতরদামের উপর।
> জার্মানরা পোড়াল বেলজিয়ামের আর-এক শহর,
>
> আমি চোখ বুজলাম, কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।
> ম্লান আলো—ম্লান আলো—উত্তাল সাগর—
> নাচছে শিশুর দল তারই বালুবেলায়।
> একি স্বপ্ন!...এ স্বপ্ন দেখেছিলেন একদিন খৃষ্ট আর প্লেটো—!
> এই কি স্বপ্ন!

ছাব্বিশ

উনিশ শো সতেরো সাল এসে গেল। এখনো সীমান্তে সীমান্তে কামানের গর্জন শোনা যায়, এখনো মাইন সাগরে সাগরে বিস্ফোরণ তোলে। মৃত্যুর আর্তনাদ এখনো থামেনি, বরং তীক্ষ্ণ, তীব্র হয়ে উঠেছে। কবে যুদ্ধ দানবের এ তাণ্ডব শেষ হবে কে জানে

নিউইয়র্কে আমার দিন কাটছে। মেট্রোপলিটান অপেরায় নাচি। রোজই লা-মার্সাঈ দিয়ে আমার নাচ শেষ হয়। আর সকলের মতোই আমার বিশ্বাস—মিত্র-পক্ষের বিজয়ের উপর নির্ভর করছে পৃথিবীর মুক্তি, নবজন্ম আর সভ্যতা। কিন্তু তাই বলে অন্যসব শিল্পীর মতো জার্মান সংস্কৃতিকে আমি ঘৃণা করিনে। বেঠোফেন, ভাগ্‌নারের সুরের তালে তালে নাচি।

এরই মধ্যে, একদিন রুশ বিপ্লব ঘটে গেল। বিপ্লবের খবর যেদিন এসে পৌঁছল, সেদিন রাতে আমার কি আনন্দ! সেই কৃষ্ণ ঊষার কথা মনে পড়ল। কাতারে কাতারে চলেছে নিঃশব্দ মানুষের মিছিল—তাদের দেহ নুয়ে পড়েছে কফিনের ভারে, চোখ নিচু—কিন্তু সেই অবনমিত চোখে জ্বলছে আলো। সেই আলো আজ দীপ্ত ঊষার উদয় দেখালে। তাকে আমি সম্বর্ধনা না জানিয়ে তো পারলাম না। সেদিন লা-মার্সাঈ যেন আর এক মহান ভাষা নিয়ে দেখা দিলে, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল অত্যাচারিত, নির্জিত জনগণের স্বাধীনতার কামনা। আমার বুক তখন ফেটে যাচ্ছে—এসেছে মানুষের মুক্তির সংবাদ—এতদিনের নির্যাতন, নিপীড়ণ, মৃত্যু আজ মহান হয়ে উঠেছে। আমার দেহ যেন আর ধরে রাখতে পারছে না আনন্দ, তাই উত্তাল হয়ে উঠেছে ছন্দে—আমার লাল শালখানা বিপ্লবের বিজয় কেতন হয়ে উড়ছে। আমি যেন মূর্তিমতী বিপ্লব হয়ে উঠেছি।

সেদিন স্বাধীনতাকামী নরনারী আমাকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু যবনিকার অন্তরালে বয়ে গেল ঝড়। এল্‌-এর মুখে ভ্রূকুটি। সে বললে,

আজ এ কি নাচ নাচলে ইসাডোরা!

হেসে বললাম, নাচবো না?—আজ যে নির্যাতিত মানুষের স্বপ্ন সফল হ'ল। আজ যে কৃষ্ণ প্রদোষ চলে গেল, নিবিড় তিমির পার হয়ে এল দীপ্ত ঊষা।

এল্ আমাকে বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু সুন্দরের তুমি পূজারী—সেই সুন্দরের তো বিপ্লবের রক্তসাগরে স্থান নেই।

কে বললে স্থান নেই?—সুন্দর তো মানবতার সফল স্বপ্নে আসন পেতেছেন।

না, না, এল্ চিৎকার করে উঠল। বিপ্লব তো শুধু মৃত্যুর বিভিষিকা আনে, সেখানে সবই কুৎসিত—সুন্দর তো নেই। তুমি নাচতে পারবে না ইসাডোরা এ নাচ!

তোমার হুকুম না কি?

হ্যাঁ।

হেসে উঠলাম। বললাম, আমি বিপ্লবী—আমি সুন্দরকে দেখেছি বিপ্লবের ভেতরে। আমার তো ভয় নেই—আমি জানি বিপ্লব আমার শেকল ঘোচাবে, মুক্তি আনবে। তুমি ধনী—তাই ভাবছ বিপ্লবে আজ যে পথরেখা পড়লো—সে-পথরেখা শুধু রাশিয়ায় থেমে থাকবে না—একদিন সে পথ এসে পৌছবে পর্বত ডিঙিয়ে, তুষার-মরুভূমি পার হয়ে। সেদিন তোমার কোটি কোটি টাকা উড়ে যাবে, মানুষের সঙ্গে সমভূমিতে নেমে আসবে তুমি। তাই তো তোমার ভয়।

এল্ কি বলতে গেল, তাকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, তোমাকে আমি ভালবাসি এল্, কিন্তু আমার আদর্শ তোমার ভালবাসার চেয়েও বড়। ঢের ঢের বড়।

এল্ চুপ করে রইল। কিন্তু বুঝলাম, এ নীরবতা বড় অশুভ। ঝড় আসন্ন।

শেরীর হোটেলে আমারই সম্বর্ধনায় পার্টি। এল্ তার হোতা। পার্টি শুরু হবে ভোজ দিয়ে, শেষ হবে নাচে। নিমন্ত্রিতরা নিউইয়র্কের কাঞ্চন-কুলীন সমাজ, আর রসিকজন।

পার্টি বসবে সন্ধ্যেয়, এল্ বিকেলে এল। এসে বললে,

আজ তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই ইসাডোরা।

বললাম, তুমি তো তোমাকেই উপহার দিয়েছে এল্—আবার অন্য উপহার কেন?

এল্ বললে, তুমি নেবে কিনা জানিনা, কিন্তু দোকানে দেখে ভাল লাগল, কিনে নিয়ে এলাম।

সে বাক্স খুলে বার করল একছড়া হীরের কণ্ঠী!

বললাম, আমি তো গহনা পরিনে বন্ধু।

এল্-এর মুখ ম্লান হয়ে গেল, বললে, তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই!

হেসে বললাম, তুমি কি বোকা এল্! তাই বলে এটা যে পরব না, এমন তো কথা নেই। দাও, আমার গলায় পরিয়ে দাও!

এল্ ছুটে এসে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। সেই কণ্ঠী পরেই চললাম পার্টিতে।

ভোজের পর্ব শেষ হবার পর চলল পানোৎসব। শ্যাম্পেনের স্রোত বয়ে গেল।

রাত কখন শেষ হয়ে এল জানি না। তখনো আমরা নাচছি জোড়ায়, জোড়ায়। বিরাম নেই। নেশায় আমরা মশগুল, ক্ষণিকের আনন্দে আমরা

একটি তরুণ অতিথি চুপ করে বসেছিল একপাশে। তাঁকে গিয়ে বললাম,

নাচবে আমার সঙ্গে?

সে অমনি উঠে দাঁড়াল।

তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে বুক রেখে নাচতে শুরু করে দিলাম।

ট্যাঙ্গোর উদ্দাম সুর বেজে উঠল। এ নাচ সেই বুয়েনোস আয়ার্সের ট্যাঙ্গো। উদ্দাম হয়ে উঠলাম আমরা। এতে আছে উদ্দামতা। মদির আবেশ। গ্রীষ্ম অঞ্চলের অরণ্যানীর ভয়াল পরিবেশ এরই মধ্যে দুলে-দুলে ওঠে।

হঠাৎ তাল ভঙ্গ হ'ল। ট্যাঙ্গোর সুর থেমে গেল।

এল্ ছুটে এসে তরুণ অতিথির বাহু বন্ধন থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিলে, বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরল। আমাকে টেনে নিয়ে গেল হোটেলের এক নিভৃত কামরায়।

ঈর্ষায় সবুজ পুরুষ, চোখে তার ভ্রূকুটি, চিৎকার করে উঠল,

এসব চলবে না ইসাডোরা!

কি চলবে না?

চলবে না তোমার এই নাগরী-বৃত্তি।

কেন—আমি কি তোমার হারেমের কেনা বাঁদী? চিৎকার করে উঠলাম।

আমার টাকা নেবে, আর—

থাক, থাক্! চিৎকার করে উঠলাম। টাকায় আর যাকে হয় কিনতে পার, ইসাডোরাকে কিনতে পারবে না!

এল্ নীরব। তারপরে ধীরে ধীরে চলে গেল।

তারপরে যা হয় তাই। আবার এল্ চলে গেল। হোটেলের বিরাট বিল এসে চাপল কাঁধে, স্কুল অচল। কত সাধ্য-সাধনা করে এল্‌কে চিঠি লিখলাম। সে আর এল না। এবার তার দেওয়া কণ্ঠী বাঁধা দিলাম। সেটি আর ফিরিয়ে আনা হ'ল না।

নিউইয়র্কে নিঃসম্বল হয়ে পড়লাম। নৃত্যের ঋতু শেষ। আর নৃত্য-অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও জমবে না। কণ্ঠী বাঁধা দেওয়ার টাকাও ফুরিয়ে গেল। সম্বল তখনো একখানা চুনি আর একটি কোট। এক ভারতীয় মহারাজা মণ্টিকার্লোয় জুয়োয় সর্বস্বান্ত হয়ে সেখানা বিক্রি করেন এল্-এর কাছে। চুনিখানা নাকি এক মন্দিরের দেবীমূর্তির মুকুটে ছিল। আমি দুটোই বিক্রি করে দিলাম। আমার আর স্কুলের খরচ এই ভাবেই চলতে লাগল। গ্রীষ্মে আমার নৃত্য-ঋতু আসবে। তারই অপেক্ষায় বসে রইলাম।

গ্রীষ্ম এসে গেল। আমি দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যালিফর্ণিয়ায় চললাম প্রথমে। পথে এক স্টেশনে খবরের কাগজে পড়লাম রোদাঁর মৃত্যু-সংবাদ। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। থামে না কান্না। কাগজের রিপোর্টারেরা আমাকে ঘিরে ধরলেন। তাঁরা আমার কান্না না দেখতে পান, তাই কালো ওড়নায় ঢেকে নিলাম মুখ। পরদিন কাগজে বেরুল, ইসাডোরা রহস্যময়ী, তাঁর কালো ওড়নায় ঢাকা মুখ সে-রহস্য আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

ক্যালিফর্ণিয়া থেকে এলাম সানফ্রান্সিস্কোয়। এই আমার আদি বাসস্থান। পঁচিশ বছর আগে এখান থেকে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর শহরের উপর দিয়ে চলে গেছে ভয়াল ভূমিকম্পের বিপর্যয়, আবার বিরাট অগ্নিকাণ্ডে ছারখার হয়ে গেছে শহর। আগের শহর আর নেই।

এখানে মার সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বুড়িয়ে গেছেন। মার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একদিন তাঁকে নিয়েই শুরু হয়েছিল যশের পথে আমার অভিযাত্রা। যশ এল, অর্থ এল—কিন্তু তবু আজ এমন অসুখী কেন আমরা? এই তো প্রকৃতির নিয়ম। আমাদের আনন্দের মুখোসের আড়ালে তো আছে দুঃখ—সে-দুঃখের রূপ তো বদলায় না। হয়তো সুখ বলে কিছু নেই। শুধু জীবনে আসে সুখের কয়েকটি মুহূর্ত।

আমার নিজের শহর আমাকে বরণ করে নিলে, কিন্তু আমার স্থলকে ঠাই দেবার মতো উৎসাহ তো তাদের দেখলাম না। সে তখন উচ্ছৃঙ্খল জ্যাজ্ নিয়ে মত্ত। হুইটম্যানের আত্মার গান, গণতন্ত্রের গান সে তো শুনতে পেল না। তাই একদিন মার কাছে, আমার শহর সানফ্রান্সিস্কোর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

এই সেই সানফ্রান্সিস্কো। এখানে একদিন দূর আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন আমার ঠাকুর্দা—এইখানে নগর পত্তনে সাহায্য করেছিলেন। প্রথম যে কাঠের বাড়ির সার উঠেছিল, তারই একটা ছিল তাঁর। এমনি করেই পত্তন হয়েছিল এই বিরাট শহরের। আজ তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

চোখে জল এল।

সানফ্রান্সিস্কো, তুমি আমেরিকার পত্তন করেছিলে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, কিন্তু তবু আমেরিকার আত্মাকে তুমি চিনলে না। এখনো তুমি বর্বর জ্যাজ্-নৃত্যে উন্মত্ত—এখনো তুমি ওয়ালৎস, মাজুরকার যান্ত্রিক ঘূর্ণায় ঘুরছ। আমেরিকার আত্মা কবে আবিষ্কৃত হবে তার নৃত্যে—কবে তুমি দেখবে সেখানে তোমার উদার আকাশ, বিস্তৃত মৃত্তিকার ছন্দ। আমি তো দেখতে পাচ্ছি—সেই মহান ছন্দে দুলছে আমেরিকা--তার বাহু সে বাড়িয়ে দিয়েছে—সে সবাইকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

আমেরিকা নাচছে—নাচছে আমেরিকা! গণতন্ত্রের মহা মহিম ছন্দে নাচছে।

সাতাশ

আমার জীবনের দিনগুলি—তারা তো দ্বিধাবিভক্ত। কখনো সেখানে ছড়িয়ে পড়ে উপকথার স্বর্ণমায়া, এক পুষ্পিত প্রান্তর তার অযুত ফুলে ফুলে ভরে দেয়। দীপ্ত উষা আসে ভালবাসা আর সুখ নিয়ে, মুহূর্তগুলিকে সুন্দর করে তোলে। জীবনের আনন্দ প্রকাশের তখন তো ভাষা খুঁজে পাই নে। মনে হয় আমি প্রতিভা—আমার নৃত্য-প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিভার মূর্ত প্রকাশ। আমার নৃত্য আনে পুনরাবির্ভাব। আবার মলিন দিন ঘনিয়ে আসে। তখন শুধু বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে মন, শূন্যতায়, রিক্ততায় ভরে যায়। অতীত বিপর্যয়ের পাঁচালী শোনায়, ভবিষ্যৎ নিয়ে আসে আরো বিপর্যয়ের আভাস। আমার নৃত্য প্রতিষ্ঠানকে মনে হয় উন্মাদের এক স্বপ্ন।

মানুষের জীবনের সত্য কি কে তা খুঁজে পাবে?

ঈশ্বরও বুঝি বিমূঢ় হয়ে যাবেন তার সন্ধান নিতে গিয়ে।

সত্যই, সত্য কোথায়?

এই যে উদ্বেগ—এই যে আনন্দ—এই যে কলঙ্ক—এই যে বিশুদ্ধতা—এই যে দেহের নরক-যন্ত্রণা—আবার দেহের সৌন্দর্য আর পবিত্রতা—এরই মধ্যে কি আছে সত্য?

জানিনা। হয়তো ঈশ্বর জানেন, নয় তো সয়তান। কিন্তু আমার তো মনে হয়—তাঁরাও বিমূঢ়।

তাই তো দোমনা আমার মন। কখনো বা আমার মন যেন রঙীন সার্সি হয়ে ওঠে। তারই ভিতর দিয়ে দেখি সুন্দরকে—বর্ণে গন্ধে অতুলনীয় সে সুন্দর; আবার সার্সির রঙ্ মুছে যায়—দেখি—শুধু জঞ্জালের স্তূপ—কুশ্রীতার লীলা। সেই তো জীবন।

যদি ডুবুরীর মতো আত্মার গভীরে ডুবে যেতে পারতাম, যদি তারই মতো পারতাম ভাবধারার মুক্তা তুলে আনতে! সে মুক্তা তো নীরবতার শুক্তিতে লীন হয়ে আছে, আছে আমাদের আত্মার অবচেতনার অতলে।

থাক ওকথা, এবার স্মৃতিকথার খেইটুকু তুলে নিই।

আমেরিকা আর ভাল লাগে না। স্কুল চালাতে পারছি না—ক্ষত-বিক্ষত-বিধ্বস্ত সংগ্রামে। পারীর জন্য মন কেঁদে ওঠে। কিন্তু টাকা তো নেই। মেরী এরই মধ্যে য়ুরোপ থেকে ফিরে এল। সে এসে বললে, আমার এক বন্ধু পারী যাচ্ছেন, তুমিও তাঁরই সঙ্গে চলে যাও।

রাজী হয়ে গেলাম।

আমেরিকা থেকে একদিন চলে এলাম। এলাম পারীতে। তখনো পারীর আকাশে বম্বোদর বিমানের হানা চলছে। রাতে চুপ করে বসে থাকি জানালায়, বিমানের ধ্বংস তাণ্ডব দেখি। মনে হয়, আহা, আমার উপর যদি একটা পড়ে—তাহলে তো সব চুকে যায়! আত্মহত্যার কামনা তো প্রলুব্ধ করে। কত সময়ে ভেবেছি আত্মহত্যা করব, কিন্তু কোথায় যেন বাধা! যদি ডাক্তারখানায় আত্মহত্যার বড়ি বিক্রি হোত প্রতিষেধক হিসেবে—তাহলে তো আমার মনে হয়, পৃথিবীর যত বুদ্ধিজীবী একদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

একঘেয়ে মন্থর দিন কাটে। মাঝে মাঝে ভাবি, এর চেয়ে হাসপাতালে নার্সের কাজে ভর্তি হয়ে যাই—আহতদের সেবা করি। আবার ভাবি, নার্সের তো অভাব নেই। কাতারে কাতারে রোজই তারা কর্মপ্রার্থিনী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি হবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে?

ভাগ্‌নার এক সুর সৃষ্টি করেছিলেন। তার নাম দেবদূত। আত্মা যখন বিষাদে লুটিয়ে পড়েছে, এমন সময় এলেন আলো নিয়ে দেবদূত। আমার জীবনেও তখন এমনি দেবদূতের কামনা। একদিন সত্যই সে-কামনা পূর্ণ হ'ল।

দেবদূত এলেন পিয়ানোবাদক ওয়ালটার রুমেল-এর রূপ ধরে।

সে এসে আমার স্টুডিয়োতে ঢুকতেই মনে হ'ল—এ যেন সেই উনিশ শতকের প্রতিভাবান ফরাসী সুরকার লিজ। তাঁর ছবি তো দেখেছি, হুবহু সেই ছবিখানি যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসেছে। একগোছা চুল এসে পড়েছে তার কপালের উপর, চোখে যেন দীপ্ত আলোর ঝরণা। সে এসেই বাজাতে বসল। সুরধারায় আমি যেন আবার জীবন পেলাম। মন্থর দিন আবার হাল্‌কা ডানা মেলে উড়ে চলল।

ওকে বললাম, তুমি আমার দেবদূত হবে?

ও হাসল, কথা বললে না।

সেদিন থেকে ও হ'ল আমার দেবদূত।

আমার দেবদূত বড় সুন্দর, বড় নম্র, কিন্তু কামনায় সে উত্তাল। যখনি বাজাতে বসে, সে-কামনা দেখা দেয়। মনে হয় স্নায়ুতে-স্নায়ুতে লেগেছে টংকার। আত্মা বিদ্রোহে ফুঁসে উঠছে। এমন মানুষকে ভালবাসতে গেলেই বিপদ। কখন কি ঘটবে, ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হবে।

রক্তমাংসের আবরণের ভিতর দিয়ে কারো আত্মা আবিষ্কার করতে যাওয়া তো অদ্ভুত—ঐ আবরণের ভিতর দিয়ে আবিষ্কার করতে হবে আনন্দ, ইন্দ্রিয়ের সুখ-মায়া, মোহ। এই মোহই তো মানুষের কাছে সুখ বলে পরিচিত—একেই তো বলে ভালবাসা।

তোমরা তো আমার কথা পড়েছ, আমাকে তো চেনো। তাই বলি—যখনি ভালবাসা এসেছে নতুন রূপ নিয়ে—আমি ভেবেছি—এই বুঝি সে এল—যার জন্যে দীর্ঘদিন আমি প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি—এই তো আমার নবজন্ম। কিন্তু সব ভালবাসাই তো বিপর্যয়ে শেষ হয়ে গেছে। আমি কিন্তু তা চাইনে—চেয়েছি সেই রূপকথার শেষ কথাটি—

তারা সুখে রইল—অনন্ত সুখ, অপার সুখে মজে রইল।

কিন্তু ভালবাসা তো একই উপসংহারে নিয়ে যায় না। জীবন তো কামনা-নিবৃত্তির স্বপ্ন নিয়ে মশগুল নয়। বিভিন্ন জনের ভালবাসা বিভিন্ন রূপ নিয়ে আসে। একজনের ভালবাসা যদি হয় বেঠোফেনের চন্দ্রালোকগীতি—আর একজনের ভালবাসা তো সেখানে শূর্পার নিশীথ স্বপ্ন। কিন্তু একই যন্ত্রে সে-সুর বাজে। সেই যন্ত্রটি নারী। যে-নারী একজনের ভালবাসা মাত্র জীবনে পেল, তার যন্ত্রে তো মাত্র একটি সুরই বেজে উঠল, দ্বিতীয় সুরের হদিস তো সে পেলে না!

গ্রীষ্ম এসে গেল। আমার দেবদূতকে নিয়ে চলে এলাম দক্ষিণ ফ্রান্সে। এক নির্জন হোটেলে দু'জনে নীড় বাঁধলাম। ও সুর সৃষ্টি করে, আমি নাচি, এমনি করে দিন কেটে যায়। কখনো বা ওর হাত ধরে বেড়াতে যাই সাগরের ধারে।

এই তো আমার স্বর্গ। জীবনের পেণ্ডুলাম দোলে, দোলে—যত ব্যথা, ততো আনন্দ উদ্বেল হয়ে ওঠে, যত দুঃখ তলিয়ে দিতে চায়, ততো আনন্দ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার ঢেউয়ের ফণায়।

এরই মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, আমরা চলে এলাম পারীতে

বিজয় তোরণের নিচ দিয়ে চলে শোভাযাত্রা। মানুষের হর্ষধ্বনি। চীৎকার করে উঠছে মানুষ, পৃথিবী বাঁচল! আবার শান্তি এল!

সবাই এখন কবি। আগামীর আশায় উন্মুখ। কিন্তু কবিকেও তো ধ্যান ভেঙে ছুটতে হয় রুটির খোঁজে। তাই দুনিয়াকে আবার ছুটতে হ'ল। শান্তির কামনায় নয়, লোভের তাড়নায় শুধু শান্তির ধ্রুবতারা জ্বল জ্বল করতে লাগল ককেশাসের শিয়রে।

আমি আর আমার দেবদূত এরই মধ্যে বাসা বাঁধলাম। ও বাজায়, আমি নাচি। নিদ্রাহীন রাত আসে, ছটফট করি। ও আমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। দু'জনে যেন মিশে গেছি। গর্ডনের সঙ্গে তো এমন করে মিশে যাইনি, এমন করে মিশে যাইনি তো লোহেনগ্রীনের সঙ্গে!

একথা বেশি করে অনুভব করি, যখন দেখি দর্শকরাও দুই আত্মার মিলনে মুগ্ধ হয়। হর্ষধ্বনি করে ওঠে।

মন আশায় দুলে ওঠে। ভাবি, মানুষকে দেব এমনি করে দু'জনে মুক্তির সন্ধান। সুন্দরের পূজারী, শান্তির পূজারী করে তুলব মানুষকে। যুদ্ধ আর পৃথিবীতে হানা দেবে না—যুদ্ধবাজের দল শানাতে পারবে না তাদের হিংস্র থাবা। কিন্তু সেই যে উপকথায় আছে না—দরজা খোলা রাখলে, আর দুষ্টু পরী এসে দেখা দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সুখশান্তি মিলিয়ে গেল, এল বিপর্যয়।

একদিন আমেরিকা থেকে স্কুলের মেয়েদের চলে আসতে তার করলাম।

ওরা এসে হাজির হ'ল। আমি বন্ধুদের ডেকে বললাম, আর এখানে নয়! চল, গ্রীসে যাই—সেখানে আমার স্বপ্নকে রূপ দিই।

আমরা রওনা হ'লাম। কে জানত আমার প্রেমের সমাধিক্ষেত্রে চলেছি আমি।

লিদোয় এসে যাত্রাপথে থামলাম। কদিন এখানে থাকব, তারপর যাব গ্রীসে। হোটেলেই ক'দিন কাটলো। তারপরে আথেন্সের পথে রওনা হলাম।

আথেন্সে এসে দেখা গেল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন। গ্রীক সরকার সাহায্য করতে রাজী হলেন। স্টুডিয়ো পেলাম। নাচ চলল। রোজ আমরা চলে যাই ধ্বংসাবশেষ মন্দিরে। সেখানে আমার ছাত্রীরা নাচে। আমার মনে কামনা, এখানে আবার আমি কলালক্ষ্মীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করব। তাই

কোপানসের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে কাজ শুরু হয়ে গেল। ছাদ উঠল, দরজা-জানালা বসানো হ'ল। মেঝেয় কার্পেট পেতে আমরা রোজ বিকেলে বসাতে লাগলাম নাচের আসর।

আমার দেবদূতের দিকে তাকিয়ে দেখার এতদিন অবকাশ হয়নি। কাজেই ডুবে ছিলাম। এবার তাকাবার ফুরসৎ হ'ল। তাকিয়ে দেখি, চোখ দু'টি তার এক নতুন আলোয় দীপ্ত। কিন্তু এ তো আত্মার দীপ্তি নয়, এ-দীপ্তি তো কামনার উর্ধে ডানা মেলে উড়িয়ে নিয়ে যায় না। এ-দীপ্তি যে মর্ত্যের। দেবদূতের ডানা দু'খানি যেন খসে পড়ছে, সেখানে দেখা দিয়েছে দুই ব্যগ্র বাহু, ঐ বাহু দিয়ে সে জড়িয়ে ধরতে চাইছে কোন বনদেবীকে। সন্দেহ হ'ল, মন বিষিয়ে উঠল।

সেদিন সূর্য অস্ত যাচ্ছে দূরে আক্রোপলিসের আড়ালে। আমার দেবদূত বাজাচ্ছে, আমরা নাচছি। সুর স্তব্ধ হ'ল এক সময়ে, তার রেশ সূর্যাস্তের সোনায় মিলিয়ে গেল। হাইমেথাসের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি তুলে তুলে কোন গিরিগুহায় লীন হয়ে গেল। এখন সেই সুর রেণু রেণু হয়ে ঝরে পড়ছে সাগরে। এমন সময় দেখলাম, দু'জনের চোখে চোখ মিলল। সূর্যাস্তের আলোর ঝলক তো হাইমেথাসের গিরিগুহায় মিলিয়ে যায়নি, সাগরের জলে রেণু রেণু হয়ে ঝরে পড়েনি—সূর্যাস্তের স্বর্ণমায়া ঝলসে উঠছে দু'টি প্রেমিক প্রেমিকার চোখে।

কারা দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা?

কারা?

একজন আমার দেবদূত—অপরা আমার এক শিষ্যা!

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। নিজেই ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এলাম। হাইমেথাসের কাছে এক পাহাড়ের উপর সারারাত পায়চারী করে কেটে গেল।

ঈর্ষা জীবনে বহুবার এসেছে, কিন্তু এমন করে তো দেখা দেয়নি। দুজনকেই আমি ভালবাসি—একজন আমার দেবদূত—আমার প্রেমিক; অপরা আমার ছাত্রী—আমার শিষ্যা। কিন্তু আবার ঘৃণাও তো এল। কি করি—ভাবলাম—আত্মহত্যা করব আমি। কিন্তু বিপ্লবী ইসাডোরা হেসে উঠল।

তাই পরদিনই কয়েকজন ছাত্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যে-পথ অতীত থিবস্-এর দিকে চলে গেছে, যে-পথে ছড়িয়ে আছে সোনালি বালি—সেই পথে

ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু গ্রীসের মহিমা তো আমার বুকে সান্ত্বনার প্রলেপ জোগাতে পারলে না। আমার চোখের সুমুখে ভাসতে লাগল—দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মুখ। ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে গেলাম।

প্রেম গেছে, কিন্তু প্রেমের সমাধি তো টানে মানুষকে। রোজ চোখের সামনে ভাসে, ওরা এখন চাঁদের আলোয় হাত ধরাধরি করে ঘুরছে, প্রেম করছে। আমার দুঃখ আরো বেড়ে যায়।

আথেন্সে আবার ফিরে এলাম। ঈর্ষা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এক যেন ফাঁদে পড়েছি আমি। এ যেন বসন্তের চেয়েও কুৎসিত ব্যাধি আমাকে পেয়ে বসেছে। আমার বুক কুরে খাচ্ছে—আমার মগজের কোষে-কোষে যেন তীব্র আরকের জ্বালা। তবু তো স্কুলের পরিকল্পনায় মেতে উঠি। ভেনেজেলোস সরকার আমার উপর প্রসন্ন। আথেন্সের জনগণ আমাকে ভালবাসেন।

সেদিন নেতা ভেনেজেলোসের সম্বর্ধনা উৎসব। সেই উৎসবে নাচবার জন্য আমি আহূত। বিরাট স্টেডিয়ামে এসে ঢুকলাম ছাত্রীদের নিয়ে। রাজার সেক্রেটারী মেলাস এসে আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন লরেল পাতার মুকুট, বললেন,

ইসাডোরা, তুমি আমাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ ভাস্কর ফিদিয়াসের অমর সৌন্দর্য—গ্রীসের মহিমায় আবার তুমি আমাদের উজ্জীবিত করে তোল!

আমি উত্তরে বললাম,

আমাকে গ্রীস যে সম্মানে সম্মানিত করলেন, তার উত্তর তো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিনে। আমার শুধু গ্রীসের কাছে অনুরোধ—হাজার হাজার নৃত্য-শিল্পীদের উদ্ভবে গ্রীস আমাকে সাহায্য করুন!

হর্ষধ্বনি উঠল। তাকিয়ে দেখি, দেবদূত আমার শিষ্যার হাত ধরে আছে। আমি তাদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালাম। কিন্তু রাতে আবার জানালায় দেখলাম ওদের। তখনতো আর স্নেহ রইল না। ঈর্ষায় জ্বলে গেল বুক।

চাঁদের আলোয় ওরা বসে আছে পাশাপাশি। ফিসফিস করে কি যেন বলছে।

আবার রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম, সেই বহ্নিমানা সাফোর মতই আত্মহত্যা করব।

আবার বিপ্লবী ইসাডোরা হেসে উঠল।

কিন্তু কামনার এ দুঃখদাহন তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাকে আরো বাড়িয়ে তুলল আমার সুন্দর পরিবেশ। এ পরিস্থিতি থেকে বুঝি মুক্তি নেই। আমার প্রেমিক বিদায় নিলে বাঁচি—কিন্তু সে তো যাবে না। এক হয়; আমার শিষ্যাকে যদি পাঠিয়ে দিই, তাহলেও নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু তা তো হয় না। সেখানে আমার গর্বে আঘাত লাগে। তাই ওদের প্রেমের খেলা দেখি—আর ঈর্ষায় জ্বলে মরি। আবার কখনো বা ভুলতে গিয়ে আরো তীব্র হয়ে ওঠে আমার অন্তর্দাহ।

ছাত্রীদের নাচ শেখাই, শেখাই প্রশান্তির দর্শন, সুখের দর্শন, কিন্তু মন বেসুরো হয়ে ওঠে। কি হবে জানি না।

এমন সময় এল এক বিপর্যয়। বিষে বিষ ধ্বংস হ'ল।

গ্রীসের তরুণ রাজা বানরের কামড়ে মারা গেলেন। গ্রীসে আবার ওলট-পালট শুরু হয়ে গেল। ভেনেজেলোস বিদায় নিলেন। আমাদেরও বিদায় আসন্ন। কোপানসের মেরামতের জন্য জলের মতো অর্থব্যয় হয়েছিল, কিন্তু তা তো বৃথা হ'ল। আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। কোপানসের কাছে একদিন বিদায় নিলাম। আমার নৃত্যমন্দির তার পাষাণ স্তূপ নিয়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল গোধূলির অন্ধকারে।

রোম হয়ে পারীর পথে চললাম।

পারীতে এসে বিদায় নিলে আবার দেবদূত আর শিষ্যা। তাদের চোখে তখন ঘর বাঁধার স্বপ্ন। আমি হাসিমুখেই বিদায় দিলাম। কিন্তু মন তো তখন দুঃখের মেঘে ঢাকা। মনে হ'ল, নেই আশা, নেই ভালবাসা—আছে শুধু নিবিড় তিমির। কিন্তু এমন তিমির তো মানুষের জীবনে ঘিরে ঘিরে আসে। আবার তিমিরের পরপারে দিগন্তে দেখা দেয় সূর্যোদয়ের আভাস। মনে হয়—আছে আমার জন্য পুষ্পিত প্রান্তর; আছে আনন্দ। যাঁরা বলেন, চল্লিশের পরে প্রেমকে বাতিল করে দেওয়া উচিত—আমি তো সে-মেয়েদের দলে নই। আমার মনে হয় এ তাঁদের ভুল।

জীবনের দেহের স্পন্দন তো এক রহস্য, জীবনের পথে-বিপথে সে স্পন্দন তো রহস্য আরো ঘনীভূত করে তোলে। প্রথমে তো কিশোরী মেয়ের ক্ষীণ তনুদেহ নিয়ে এসেছিলাম জগতে, তারপরে পূর্ণতা পেয়ে হলাম বীরাঙ্গনা। বহু পুরুষের

কামনার স্রোত আমার উপর দিয়ে চলে গেল। তার পরে এল পরিণত ফলের পরিণাম। এই তো সেই পরিণতি। চল্লিশোত্তর জীবনেই তো তা সম্ভব। এখন তো দেহের অগ্নিময়ী মেঘে আমার বাস।

বসন্ত আর ভালবাসার কথা আমাকে বোলো না! হেমন্তের রং তো অনেক উজ্জ্বল, নানা রঙে ভরা—তার আনন্দ তো বসন্তের চেয়ে অনেক পরিণত। যে-নারী হেমন্তের এই ভালবাসাকে সংস্কার দিয়ে ঝেঁটিয়ে দূরে সরিয়ে রাখলে, তার প্রতি তো আমার করুণা উথলে ওঠে। আমার মা তো তাদেরই একজন। কিন্তু আমি তো যার মেয়ে হয়েও তাদের দলে ভিড়তে চাই না। আমি বিদ্রোহী, বিপ্লবী। বসন্ত গেছে যাক, হেমন্তের পরিণতি আমি চাই!

আটাশ

উনিশ শো একুশ সাল। একখানা তার একদিন এসে হাজির। পড়ে দেখি তার পাঠিয়েছেন সোবিয়েৎ সরকার, লিখেছেন :—

রুশ সরকারই একমাত্র আপনার নাচের মর্ম বুঝতে পারে, আমাদের এখানে চলে আসুন—আমরা আপনার স্কুল গড়ে দেব।

কোথা থেকে এল এ বাণী? নরক থেকে? না, তারই কাছাকাছি থেকে। য়ুরোপে তো তখন সোবিয়েৎ রাশিয়া এক নরক। আমি আমার শূন্য বাড়ির দিকে তাকালাম। কেউ নেই। কিছু নেই। আশা নেই, ভালবাসা নেই।

উত্তর দিলাম,

হাঁ, রাশিয়ায় আমি আসব—আপনাদের ছেলেমেয়েদের শেখাব, কিন্তু এক সর্তে—আমাকে স্টুডিয়ো দিতে হবে, আর সরঞ্জাম জোগাতে হবে।

উত্তর এল,

আপনি যা চান, সব পাবেন।

পারী থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম লণ্ডনে। এইখান থেকেই যাত্রা শুরু হবে নয়া দুনিয়ার পথে। লণ্ডন ছাড়বার আগে এক জিপসী বুড়ির কাছে গেলাম। ভাগ্য গণনা তার পেশা। সে আমাকে বললে,

দীর্ঘ যাত্রা পথে আপনি চলেছেন। কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, নানা বিঘ্ন দেখা দেবে। আপনি বিয়ে করবেন।

আমি হেসে উঠে বললাম, তোমার গণনা ফলবে না! বিয়ে আমি করব না। বিয়ের আমি বিরুদ্ধে।

বুড়ি আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে কি দেখলে, তারপর বললে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি। সবুর করুন, আপনিও দেখবেন।

রওনা হলাম। মনে হ'ল, আমার পিছনে ফেলে যাচ্ছি জীর্ণ-দীর্ণ জগতকে। এক নয়া দুনিয়ায় গিয়ে পৌঁছিব। এ দুনিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন প্লেটো, কার্লমার্কস, স্বপ্ন দেখেছেন লেনিন, আর আজ সেই স্বপ্ন তিনিই সার্থক করলেন। বর্তমানে ভবিষ্যতের পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

উত্তর দিকে ভেসে চলল জাহাজ, বুর্জোয়া য়ুরোপের দিকে তাকিয়ে ঘৃণা হ'ল। আর তো তোমাকে আমি চাইনে, আমি এখন তাওয়ারিস, কমরেড, সাথী— মানবতার জন্য আমার আত্মা এখন নিবেদিত। বিদায়, অসাম্য, অন্যায়, বর্বরতা। বিদায় ধনবাদী রোগ-জর্জর পৃথিবী!

জাহাজ এসে একদিন ভিড়লো আগামীর বন্দরে।

এবার আমার যাত্রা শুরু হবে আগামীর পথে, সবাই সেখানে আমার সাথী। বুদ্ধ ন্যগ্রোধের তলায় বসে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে স্বপ্ন খৃষ্টের বাণীতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল—নির্যাতিত মানবতার সেই স্বপ্নই তো ছিল একমাত্র আশা। আজ সেই স্বপ্ন যুগ-যুগ পরে লেলিন সার্থক করে তুললেন। আমি সেই স্বপ্নের জগতে চলেছি, আমার আদর্শ, আমার জীবনও তো এখন সেই মহান স্বপ্নেরই এক অঙ্গ।

বিদায়, পুরানো পৃথিবী! এবার নয়া দুনিয়াকে আমার সম্ভাষণ জানাবো।

বহুদিন থেকেই ইসাডোরার মনে আশা ছিল, তিনি নিজের জীবনের কথা লিখবেন। কিন্তু লেখা সুরু হয় মৃত্যুর কিছুদিন আগে। তিনি পুরানো পৃথিবীর কথায় তাঁর জীবনের এক পর্ব শেষ করেন। দ্বিতীয় পর্বের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। তিনি তাঁর প্রকাশককে জানিয়েছিলেন—'বলশেভিক রাশিয়ায় আমার দুটি বছর' নামে আর একখানি বইও লিখবেন। কিন্তু তা আর হ'ল না। প্রথম খানির প্রুফও তিনি দেখে যেতে পারেননি। বই প্রেসে যাবার আগেই তিনি এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তাঁর নয়া দুনিয়ার অভিজ্ঞতার কথা অজানাই রয়ে গেল। আমরা তাঁর কাছ থেকে পেলাম না বিপ্লবী রাশিয়ার সেই প্রথম দিনের ছবি—সেই আমাদের দুঃখ। বিপ্লবী রাশিয়ার সে-ছবি না পেলেও তিনি যখন ফিরে এলেন আবার পুরানো দুনিয়ায়—সেদিনের ছবি দিয়েছেন তাঁরই এক ইম্প্রেসারিয়ো বন্ধু তাঁর আত্মকথায়। ইনি এস. হুরোক। তাঁরই জবানিতে ইসাডোরার শেষ জীবনের কাহিনী এখানে তুলে দেওয়া হ'ল।

ইসাডোরা বহুদিন পরে তার করলেন রাশিয়া থেকে :

ঝড়-বাদল, বরফ যা-ই হোক না কেন, আমার আমেরিকায় পৌছনো কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি আসছি, সঙ্গে আছে এক পরম সম্পদ।

তারখানা হাতে করে ভাবছিলাম, ইসাডোরা তাহলে ফিরে আসছেন আমেরিকায়, কিন্তু তাঁর পরম সম্পদটি কি ?

ইসাডোরাকে আমি চিনি। আমার জীবনে হাউয়ের মতো বহুবার হঠাৎ এসে দেখা দিয়েছেন, আবার বিস্ফোরণের জ্বালা ছড়িয়ে দিয়ে মিলিয়েও গেছেন। তিনি বিপ্লবী নায়িকা। তাঁর চলার পথে ছড়িয়ে আছে কত ভাঙাবুকের দীর্ঘশ্বাস, কত ছলনা, নাগরিক বৃত্তি। যোদ্ধা কবি দান্নাৎসিও তাঁকে তাঁর নিজের মতো করে ভালবেসেছিলেন। প্রেমের কত ছলনা! কবি বহু নামী মহিলাকে প্রেমিকা রূপে পেয়েছিলেন, কিন্তু এই ছলনাময়ী নারীকে জয় করিতে পারেন নি। সহস্র শয্যার নায়ক এইখানেই হার মেনে ছিলেন। এমনি আমাদের ইসাডোরা! একদিন তাঁর জীবনে এলেন গর্ডন ক্রেইগ। বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরীর ছেলে বিখ্যাত মঞ্চসজ্জা পরিকল্পনাকারী গর্ডন। তিনি তাঁকে দিলেন মাতৃত্বের স্বাদ। ইসাডোরা মা হলেন, কিন্তু গর্ডন তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। চাইলেনও না। তারপর ক্রোড়পতি লোহেনগ্রীনও তাকে সন্তান উপহার দিলেন, কিন্তু ইসাডোরা তাঁর সঙ্গেও ঘর বাঁধতে পারলেন না। নিউইয়র্কে লোহেনগ্রীনের ভালবাসার শেষ অঙ্কের যবনিকা পড়লো। লোহেনগ্রীন চাইছিলেন ইসাডোরাকে বাঁধতে, কিন্তু ইসাডোরা তা চান নি। তার নাগরী-বৃত্তি শুরু হলো। একে নাগরী-বৃত্তি বললে বোধ হয় ভুল হবে। এ হ'ল জীবনের ধর্ম, ইসাডোরার তারুণ্যের ধর্ম। ঘরণী-জীবন তো তাঁর জন্যে নয়—তিনি যে বিদ্রোহিনী।

সেদিন শেরীর হোটেলে বসেছে পার্টি। লোহেনগ্রীন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, টেবিলের উপরে সাজানো থালা বাসন গ্লাস তিনি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললেন, ইসাডোরা সেই ঝনঝনানির সঙ্গে তরল হাসি মিশিয়ে বলে উঠলেন : তাহলে পর্দা নেমে এল! বন্ধু বিদায়!

আর কোনো কথা নয়। লোহেনগ্রীন পড়লেন জীবন থেকে খসে। এবার সোবিয়েৎ সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়া চলে গেলেন ইসাডোরা। নতুন দেশে নতুন

করে তিনি গড়বেন তাঁর নৃত্য নিকেতন। তারপরে আর তাঁর কাছ থেকে খবর পাইনি। মাঝে মাঝে শুনেছি, ১৯২১ সালের রাশিয়ায় দেশের সেই বিশৃঙ্খলার ভিতরে গড়ছেন ছেলেমেয়েদের, তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন লেনিন আর তাঁর দেশের মানুষ। কিন্তু পরম সম্পদটির কথা শুনিনি। যা হোক, প্রতীক্ষায় রইলাম।

দিন এসে গেল।

এস্ এস্ পারী এসে ভিড়লো বন্দরে। জাহাজে উঠে দেখলাম ইসাডোরা দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে তাঁর লম্বা কোট, তারই আড়ালে হলদে আর কমলা রঙের ডোরাকাটা নীল পোষাক। সুন্দরী তিনি। আটত্রিশ বছর তাঁর বয়েস, কিন্তু এখনো সাপের মতো লীলায়িত তাঁর দেহ, মুখে পড়েনি বয়সের বলি-রেখা। তিনি আমাকে দেখেই হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন,

এসেছ হুরোক! নবীন রাশিয়ার প্রসব বেদনা থেকে চলে এলাম আবার তোমাদের কাছে, আবার সেখানে ফিরে যাব। আমার পরম সম্পদটিকে দেখাতেই তো এলাম। এই আমার স্বামী কবি এসেনিন!

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার তাকিয়ে দেখলাম। এক তরুণ আপোলো যেন। পরনে তার এক রাশিয়ান জোব্বা, চুল এলোমেলো। দেখে তাকে সাতাশ-আটাশের বেশি মনে হয় না। নীল চোখে তার দ্যুতি ঠিক্‌রে পড়ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ইসাডোরা হেসে উঠলেন, অবাক হয়ে দেখছ কি! হ্যাঁ, এই আমার স্বামী এসেনিন। আমার স্বামী! রাশিয়ায় ওরা তো বলে, ও নাকি কালে পুশকিনের মত কবি হবে। ও চাষীর ছেলে, কিন্তু এক মহান স্বপ্নে ও উদ্বুদ্ধ। ওর সেই কবিতা তো তুমি শোননি হুরোক—সেই যে আমার বিশ্বাস।

ইসাডোরা আপন মনে আবৃত্তি করে চললেন,

আমার বিশ্বাস, আমার বিশ্বাস, সুখ আছে।
সূর্য তো অস্ত যায়নি এখনো
আকাশ তো লাল স্তবগানের পুথি,
সে তো আনে আনন্দের আগমনী ভবিষ্যবাণী
আমার বিশ্বাস—আমার বিশ্বাস—সুখ আছে

আমার সোনার রাশিয়া বেজে ওঠ, ঝঙ্কার
বাঁশী বাজাও

* * * *

আমি তো ভালবাসি—ঝঞ্ঝাময়ী সাগরের
গর্জন !
তরঙ্গের ফণায় ফণায় তারার ঝলক
আনন্দময় দুঃখ
আর আনন্দমুখর জনতা।
আমি তো ভালবাসি......
...সুখ আছে, হ্যাঁ সুখ আছে......

ইসাডোরা আবৃত্তি শেষে বললেন, শুনলে তো হুরোক—কবির কি বিশ্বাস। তুমি রুশ, তুমি স্বাপ্নিক, তাই তোমাকে শোনালাম। অবাক হওনি তো !

বললাম, অবাক হইনি, শুধু ভাবছিলাম, ইসাডোরাও ধরা পড়লো তাহলে ! সে তো বন্ধন চায়নি, কিন্তু তরুণ কবি কি দিয়ে তাকে বাঁধলেন ?

কি দিয়ে আবার ! প্রেম দিয়ে। দুর্বার প্রেম দিয়ে। ছলছলিয়ে উঠলেন ইসাডোরা।

কিন্তু সে দুর্বার প্রেম কি ইসাডোরা পায় নি আগে ?

ইসাডোরা হাসলেন, এমন করে বুঝি পায় নি হুরোক !

এবার রিপোর্টারের দল এসে তাদের ঘিরে ফেললো, ক্যামেরার উল্লাস আর প্রশ্নের বন্যা।

একজন রিপোর্টার জিজ্ঞেস করলেন, কি জাতের কবি এসেনিন ?

আর একজন লিখলেন, ছায়াবাদী কবি।

ইসাডোরা তাদের জানালেন, আমরা আমেরিকায় পা দিলাম। কৃতজ্ঞতাই আমাদের প্রথম কথা। তরুণ রাশিয়ার আমরা প্রতিনিধি। রাশিয়া আর আমেরিকা যাতে পরস্পরকে চিনতে পারে, আমরা তারই চেষ্টা করবো।

কিন্তু রিপোর্টাররা সে কথা আমল না দিয়ে আবার প্রশ্ন করতে লাগলেন,

আপনি তো রুশ ভাষা জানেন না, আর আপনার স্বামী একমাত্র রুশ ভাষাই জানেন—আপনারা কথা বলেন কি করে ?

ইসাডোরা হাসলেন। এ হাসি তাঁর মৌলিক। ঠোঁটের কোণে কোণে স্রোতের মতো ছলছলিয়ে ওঠে, মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বললেন,

এমন এক ভাষা আছে যা সবাই বোঝে। আর আপনারা জানেন সে তো প্রেমের ভাষা।

রিপোর্টারের দল চলে গেল। আমেরিকায় দিগ্বিজয়ে নামলেন ইসাডোরা।

এবার এল হাউয়ের বিস্ফোরণের পালা।

প্রথম বিস্ফোরণ এল বোস্টনে, তারপর ছড়িয়ে পড়লো সারা আমেরিকায়।

বোস্টনের সিম্ফনি হলে বসেছে ইসাডোরার নাচের আসর, হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হলো কবি এসেনিন। সেই জোব্বা তার পরনে, হাতে তার লাল ঝাণ্ডা। সে চেঁচিয়ে উঠলো :

বলশেভিকবাদ দীর্ঘজীবি হোক !

বোস্টনের মেয়র উঠে গেলেন প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে, উঠে গেলেন সম্ভ্রান্তরা। এসেনিন নির্বিকার। সে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো বিপ্লবের কথা। দর্শকরা রুশ ভাষা বুঝতে পারল না, তারা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। এবার ইসাডোরা মঞ্চে এসে তাকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

খবর পেয়ে ছুটে এলাম। ইসাডোরা হেসে বললেন, ও একটু মাতাল হয়ে পড়েছিল, তাই অমনি করেছে। আর হবে না হুরোক, তুমি ওদের বলে দাও !

তারপর তিনি এসেনিনের গলা জড়িয়ে ধরলেন।

আমি মেয়রকে বুঝিয়ে শান্ত করলাম।

এবার বিস্ফোরণ শুরু হলো ইসাডোরের কাছ থেকে।

পরদিন হলে লাল পোষাক পরে ইসাডোরা লাল ওড়না দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন,

এই তো লাল রং, আমিও তো এমনি লাল। জীবন আর শক্তির রং তো তো এই লাল। তোমরা একদিন তো শক্তির প্রতীক ছিলে, আমেরিকাবাসী, আজ পোষ মেনে রয়েছ কেন ? ওঠ, জাগো !

হলে সোরগোল পড়ে গেল, কিন্তু ইসাডোরা তখনো বলে চলেছেন, ঐ যে গ্রীক দেবতার মূর্তি দেখছ, ওরা তো মিথ্যে। আর তোমরাও তো অমনি ফাঁকা, শূন্যগর্ভ। তোমরা ধনবাদের ঠুলি পরে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরেছ। সৌন্দর্য

কি তা জান না। আমি এসেছি নবীন রাশিয়া থেকে সেই সৌন্দর্যের ভাণ্ডার নিয়ে। দেখ, দেখ, প্লাসটার দেওয়া ঐ নগ্নমূর্তির বুকে কি সন্ধান পাবে এই সুঠাম রেখার।......দেখ, দেখ!

ইসাডোরা তাঁর লাল পোষাক টেনে ছিঁড়ে ফেললেন, তাঁর যুগ্ম স্তন দেখা দিল বন্ধনী মুক্ত হয়ে। বোস্টন তার নীতিবাদের ভণ্ডামি নিয়ে আঁৎকে উঠলো, শিউরে উঠলো আমেরিকা! তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। তবু নাচের আসরে আসরে ভিড়। বিপ্লবী নায়িকার জন্য ছুটে এল মানুষ। একদিকে চললো তরুণের অভিযান, আর একদিকে? ইসাডোরা আর এসেনিনের অসম বয়েসী প্রেম।

নিউইয়র্কের ওয়াল্ডর্ফ হোটেলে তাঁরা তখন। হঠাৎ রাত তিনটেয় ফোন এল। হাঁ ইসাডোরাই ফোন করছেন।

চলে এসো! ও আমাকে খুন করে ফেলবে! চলে এসো। হুরোক, হুরোক! শব্দধর যন্ত্র নীরব হয়ে গেল।

ডাকলাম—হ্যালো, হ্যালো!

সাড়া নেই।

তাড়াতাড়ি পোষাক পরে ছুটলাম। ওয়াল্ডর্ফ হোটেলে এসে কেরানীদের সঙ্গে উপরে এলাম ওদের ঘরের সুমুখে।

নীরব সব, দরজা বন্ধ।

তবে কি সব শেষ হয়ে গেছে?

ক'বার টোকা দিলাম দরজায়। সাড়া নেই। এবার কেরানীটি হাতল ঘোরালো। দরজা খুলে গেল।

ঘরে জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড! চেয়ার উলটে পড়ে আছে, পর্দাগুলো খুলে লুটিয়ে পড়েছে। পোষাক লোটাচ্ছে মেঝেয়। আর কত যে ভাঙাচোরা জিনিস! দুই ঘূর্ণিবায়ুর যেন এখানে সংঘর্ষ হয়ে গেছে, কিন্তু কার্পেটের উপর নেই মৃতদেহ, নেই রক্তের দাগ। কোথায় গেলেন ইসাডোরা আর তাঁর প্রেমিক?

কেরানীটির হঠাৎ আমার হাতে চাপ দিলে। তাকিয়ে দেখি, বিছানায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছেন ইসাডোরা আর তাঁর স্বামী কবি এসেনিন

দুজনে নিঃশব্দে ফিরে গেলাম।

পরদিন দেখা হতে ইসাডোরাকে বললাম, কি হয়েছিল কাল

তিনি হাসলেন, প্রেমের কলহ।

কিন্তু আবহাওয়া দেখে তো ভয়ই পেয়েছিলাম।

তাতো পাবেই। প্রেম যত বেশি গাঢ় হয়, ততোই তো উগ্র হয়ে ওঠে কলহ। এমন প্রেমিক না হলে ইসাডোরাকে কি বাঁধতে পারে! ওর ভালবাসা আছে, আর আছে ঘৃণা, আর সেই ঘৃণার স্বাদ তো আমি পেতে চাই। তাই ঝড় বয়ে যায় মাঝে মাঝে, আবার তীব্র মাধুর্য নিয়ে আসে মিলন।

চুপ করে রইলাম। হয়তো ইসাডোরার কথাই ঠিক।

এসেনিন জাতে ইহুদী। তাই তাকে নিউইয়র্কের ইহুদী কবিরা নিমন্ত্রণ করেছেন। একা এসেনিন, ইসাডোরাকে নয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে হাজির হলেন ইসাডোরা। এ এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। সাদা গাউন, তার উপরে মখমলের লাল ওড়না, প্রবালের মালা গলায়।

এসেনিন এসেছিল ভক্ত পূজারীর অর্ঘ্য গ্রহণ করতে। জ্যোতিষ্মান দেবতা যেন সে। হঠাৎ তার পূজাব অর্ঘ্য কেড়ে নিতে এলেন এক দেবী। দেবতার পৈঠে থেকে কে যেন নামিয়ে দিলে দেবতাকে।

এসেনিন চুপ করে দেখছিল ঘরের আর এক কোণ থেকে। সে এখন অবহেলিত। ইসাডোরা কেড়ে নিয়েছেন তার আসন। রাশিয়া থেকে আসবার পরে এমনই তো সে দেখছ। সেখানে সে ছিল সোবিয়েতের আদরের দুলাল, এক তরুণ প্রতিভা। তাই নতুন রাশিয়ার জন্য যখন প্রাণপাত করছে অগণিত মানুষ, সে আলস্যে বিলাসে কাটিয়েছে দিন। সোবিয়েৎ সরকার হয়তো বা একটু বেশীই ঔদার্য দেখিয়েছেন, কিন্তু রাশিয়ারই সীমান্তের ওপারে কে তাকে চেনে? এখানে শুধু ইসাডোরা, ইসাডোরা, আর ইসাডোরা!

এবার এল নাচের পালা, ইসাডোরা উঠে দাঁড়ালেন। স্তব্ধ তরঙ্গের মতো তাঁর সাদা গাউন। এখুনি সে ফেনপুঞ্জে ফেটে পড়বে আর সমস্ত দেহ উঠবে দুলে দুলে। সারা হলে সৃষ্টি হবে উত্তেজনা। এসেনিন আর সহ্য করতে পারল না। সে ছুটে গেল ইসাডোরার কাছে, তার পোষাক সে ছিঁড়ে ফেললে একটানে, প্রবালের মালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো!

এসেনিন ছুটে চলে গেল ঘর ছেড়ে। শুনলাম, অনেক কষ্টে তাকে সেদিন হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরদিন ইসাডোরা আমাকে ফোনে বললেন কাগজে দেখেছো তো কবির কাণ্ড! ওযে কবি, এক তরুণ প্রতিভা, ওর এমনি উদ্দামতা না থাকলে চলবে কেন? ও কি হবে আর পাঁচজনের মত?

তারপরে বহুদিন ইসাডোরার খোঁজ পাইনি। তিনি রাশিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে কেমন দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে, তাঁর কোন হদিশই জানতাম না। ১৯২৭ সালে পারীতে এসেছি। হঠাৎ একদিন হোটেল কন্টিনেন্টালে আমার কাছে এল একখানা চিঠি। চিঠিখানা খুলে পড়লাম। ইসাডোরারই লেখা। লিখেছেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। অনেক কথা আছে। ঠিকানা—পারীর লেফ্‌ট ব্যাঙ্কের নগণ্য গলি।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

লেফট্‌ ব্যাঙ্ক। গরীব শিল্পীদের পাড়া। সেখানে এক স্টুডিয়ো ভাড়া নিয়েছেন ইসাডোরা। এলোমেলো অগোছানো ঘর। বিজয়িনী ইসাডোরা বসেছিলেন। তাঁর আশেপাশে শূন্য বোতল আর আ-ধোয়া গ্লাসের ছড়াছড়ি। ঘরের ভিতরে আবছা আঁধার। আঁধারে ঠাহর করলাম, সে ইসাডোরা ডানকান মরে গেছে, নেই সে লীলায়িত দেহ, চর্বির আস্তরণ পড়েছে তার উপর, মুখে দেখা দিয়েছে বলিরেখা। অবাক হলাম, এই কি সেই বিপ্লবী-নায়িকা, বিজয়িনী—না, আমি ভুল করেছি!

আমাকে দেখেই ইসাডোরা হাসলেন, বললেন, এসেছ হুরোক! বোস। কিন্তু কোথায় বসতে দেব তোমাকে—নেই তো সেই দামী আসবাব। এখন আমি সর্বরিক্ত।

বললাম, বিপ্লবী রাশিয়া থেকে ফিরে এলে, এখনো তোমার দীনতা আছে?

কে বললে আছে! গর্জন করে উঠলেন ইসাডোরা।

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দীনতা আমার নেই হুরোক!

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, তবে চলে এলেন কেন? কোথায় তোমার সেই কবি স্বামী!

কোথায়? স্বপ্ন দেখছিলেন যেন ইসাডোরা, স্বপ্নোত্থিতের মতো চমকে উঠলেন। কোথায়?

সে চলে গেছে। সে না গেয়েছিল সুখের গান—

আমার বিশ্বাস—সুখ আছে!

কিন্তু সুখ তো আমি পেলাম না।

ইসাডোরা এবার বললেন তাঁর কাহিনী।

জীবনে তাঁর শেষবার ভালবাসা এসেছিল। সে বসন্তের উদ্দাম ভালবাসা নয়, হেমন্তের পরিণতি। এসেনিনকে সেই পরিণত ফলের ভালবাসা তিনি সঁপে দিয়েছিলেন। গর্ডন ক্রেইগ আর লোহেনগ্রীন এসেছিল বসন্ত দিনে। তখন দেহে উদ্দামতা আছে, কিন্তু পরিণতি নেই। তবু তারা দিয়ে গেল সন্তান। বিয়ের বাঁধনে সেদিন জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়নি। ঘর বাঁধার ইচ্ছে হয়নি। তারা তো জীবনের অধ্যায় মাত্র। কিন্তু এসেনিন দিলে ঘর বাঁধার প্রেরণা। হেমন্তের প্রেম বুঝি এমনি হয়। তার উদ্দামতা নেই, আছে প্রশান্তি।

এসেনিনকে নিয়ে প্রেমের নীড় গড়ে উঠ্‌লো। তাকে তিনি দেখাতে নিয়ে এলেন বাইরের পৃথিবী। ধনবাদের উত্তুঙ্গ চূড়ায় আমেরিকা, সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিলাসিনী ফ্রান্স, মার্জিত বার্লিন। অফুরন্ত অর্থ তার হাতে সঁপে দিলেন, সে মাতাল হলো, বিলাসিনীদের নিয়ে সে ছিনিমিনি খেললো। তবু অপমানিত বোধ করেননি ইসাডোরা। এসেনিন যে কবি, খেয়ালি, এমনি তো ও করবেই। ছি ছির' ধিক্কার উঠলো এসেনিনকে নিয়ে, তাই তিনি আবার ফিরে গেলেন সোবিয়েৎ রাশিয়ায়। কতবার এসেনিন তাঁকে ছেড়ে যাবে বলে ভয় দেখিয়েছে। একবার তো ইসাডোরা তাকে বিদায় দিয়েছিলেন, কিন্তু সেদিন এসেনিনের কি কান্না। সে এসে বললে, ইসাডোরা, আমি কি তোমাকে টাকার জন্য ভালবাসি! তারপর পকেট থেকে নোটের তাড়া বার করে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে দিলে। সে শুধু বলেছিল, ইসাডোরাকে জড়িয়ে ধরে: আমি ভালবাসি—অশান্ত উন্মাদের এ ভালবাসা।

ইসাডোরা সেদিনও বিশ্বাস করেছিলেন! সুখ আছে।

কিন্তু ইসাডোরার ভয় হোত, ভাবতেন। ওর পরিণামে আছে আত্মহত্যা। ও মাঝে মাঝে এসে তাঁকে বলত, নিউইয়র্কের লম্বা বাড়িগুলোর চূড়া দেখে ওখান থেকে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। ঐ উলওআর্থ বিল্ডিংটা, ওটার ওপর থেকে আমার শেষ কবিতার পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব ইসাডোরা, সে

কেমন মৃত্যু বলতো? কিন্তু...কিন্তু যদি কোনো শিশুর ঘাড়ে পড়ি! না, না, আমি তা পারব না...

মস্কোতে গিয়েও আত্মহত্যার এ ঝোঁক তার গেল না। একদিন রাতে রেড স্কোয়ারে সে একগাদা কাঠ নিয়ে গিয়ে হাজির হলো। সে তার নিজের চিতা সাজিয়ে তাতে পুড়ে মরবে। কিন্তু এবার আর সোবিয়েৎ সরকার কবি বলে তাকে ক্ষমা করলেন না। বিচারে তার ছ'মাসের জেল হলো। তাকে জানানো হলো, তার জীবন তার নিজের নয়, সারা দেশের সম্পত্তি।

তারপরে ছাড়াছাড়ি। এসেনিন ভালবাসলো টলষ্টয়ের নাতনী শোফিয়া টলষ্টয়কে। সেদিন ইসাডোরা কিছু বলেননি। নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিলেন তাঁর এই অপমান। তবু এসেনিন ছিল তাঁর বুকখানা জুড়ে! তারপর একদিন এল মৃত্যু খবর। বাঁ হাতের কব্জির শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছে এসেনিন। এসেনিন তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লিখে গেছে—বন্ধুর উদ্দেশ্যে কবিতা। আর একটি ফুলদানিতে সেই রক্তবিন্দু সে পাঠিয়েছে তার প্রেমিকা ইসাডোরাকে। এই তার প্রেমের উপহার।

ইসাডোরা কাঁদেননি, উপহার গ্রহণ করেছিলেন।

তারপর?

ইসাডোরা গল্প শেষ করে গ্লাসে মদ ঢেলে নিলেন।

নীরবতা চারিদিকে। ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। শেষ জীবনের ভালবাসার স্মৃতি ওঁর মুখে, ওঁর স্ফীত দেহে। নিষ্ঠুর, অবিশ্বাসী প্রেমিক তাঁর কাছে বিপ্লবী প্রেমের প্রতীক হয়ে এসেছিল, বিপ্লবী নায়িকা গ্রহণ করেছিলেন তাকে। প্রেমিক চলে গেছে, আজ বিপ্লবী নায়িকারও জীবনে পড়েছে পূর্ণচ্ছেদ। এখন আছে শুধু মদের পেয়ালায় দুঃখ মিশিয়ে পান—আর স্মৃতির রোমন্থন। আর কিছু নেই।

এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে নামিয়ে রেখে বললেন,

ও চলে গেল, তাই তো আর থাকা সম্ভব হ'ল না। রাশিয়ার নবজন্মের মধ্যে বসে মৃত আমি কি করব। তাই চলে এসেছি। আমার কলালক্ষ্মীর মন্দির সেখানে গড়ে উঠেছে, তার মিনার ব্যালের গৌরব ছাড়িয়ে যাবে এই তো আমার সাধনা—কিন্তু সাধনায় ছেদ পড়ল। চলে আসতে হ'ল।—মৃত আমি, জীবনের নাচ কি করে নাচব? তবু যেদিন বিদায় নিয়ে এলাম, রাশিয়ার মানুষের সে কি কান্না! সরকার আমাকে উপহার দিলেন এক রক্ত গোলাপের তোড়া। তার সঙ্গে একখানি ছোট কার্ড—তাতে লেখাছিল—

বিপ্লবী রাশিয়া, লাল রাশিয়া আজ ইসাডোরার জন্য কাঁদছেন।

কিন্তু মৃত ইসাডোরা তো সে-কান্নায় ভ্রূক্ষেপ করেনি।

সে চলে এল। এখন জীবন চলবে এইখানে—এই জঞ্জালের স্তূপে। হয়ত ক্যাবারেতে নাচব, সমালোচকেরা ছিঃ ছিঃ করে উঠবে। বলবে, দেখ, দেখ, ইসাডোরার দশা দেখ !

কিন্তু ওরা তো বুঝবে না, ইসাডোরার আত্মা পড়ে আছে সোনার দেশে, সেখানে সে গড়ছে তাঁর অনুপ্রেরণা দিয়ে কলালক্ষ্মীর মিনার। ওরা তা বুঝবে না—ওরা দেখবে তার ভূতটাকে। হুরোক, হুরোক, মনে পড়ে বন্দরে সেই এসেনিনের লেখা কবিতার আবৃত্তি :—

…সূর্য তো অস্ত যায়নি এখনো
আকাশ তো লাল স্তবগানের পুঁথি।
সে তো আনে আনন্দের আগমনী বাণী।
আমার বিশ্বাস—আমার বিশ্বাস !
সুখ আছে !

ইসাডোরা শূন্য পানপাত্র দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হেসে উঠলেন।

আমি নীরবে বসে রইলাম।

ক'দিন পরে খবর এল, ইসাডোরা নীস্-এ মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আজও মনে হয়, এতো দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যা। আমেরিকা তো তাঁকে সম্মান দেয়নি। তাঁকে সম্মান দিয়েছিল তাঁর চিরস্বপ্নের ভূমি রাশিয়া। তাঁর শেষ বিদায়ের সময় সোবিয়েৎ থেকে তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল এক বিরাট লাল ফুলের তোড়া—তার সঙ্গে লেখা ছিল : ইসাডোরার জন্য কাঁদছে সারা রাশিয়া। কিন্তু তিনি তো রাশিয়ায় থাকতে পারেননি। তাই সে সম্মান উপেক্ষা করে চলে এসেছিলেন…উপেক্ষা করেছিলেন মহিমময় জীবন—তার কর্মশক্তি। তিনি তাঁর এসেনিনকে এমনি করেই ভুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তাতো পারেননি। হয়তো মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে একটি নাম উচ্চারিত হয়েছিল—

সে গর্ডন ক্রেইগ নয় —লোহেনগ্রীন নয়—অশান্ত উদ্দাম কবি এসেনিন।